ইতিহাস পাঠ প্রসঙ্গ কথা

ইমরান রাইহান

বই পরিচিতি

বাংলাদেশে ইসলামি ইতিহাস পাঠে মানুষের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। ইসলামি ইতিহাস বিষয়ক বইও বের হচ্ছে অনেক। মানুষের আগ্রহ মূলত গল্পে, রোমাঞ্চকর কাহিনিতে। সাধারণ মানুষ ঐতিহাসিক সত্য-মিথ্যা যাচাই করে না, সবসময় ভালো-খারাপ ব্যাখ্যাতেও পার্থক্য করতে পারে না। এই সুযোগে ইতিহাসের অনেক রকমের বই বের হচ্ছে, যার অধিকাংশকেই মানোত্তীর্ণ বলা যাচ্ছে না। এর কারণ কী?

বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চার জটিলতা

বাংলাদেশে ইতিহাসের বই আকারে বিক্রি হচ্ছে অনেক ঐতিহাসিক উপন্যাস। উপন্যাসের উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। উপন্যাস বিশেষ ভাবালোক ও কল্পনা তৈরি করতে পারে। কাহিনি নির্মাণে ঐতিহাসিক উপন্যাসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সবকিছু ঐতিহাসিক সত্য নয়, তাতে মিশ্রিত থাকে অনেক কল্পনা, আনুমানিক বিবরণ।

পাশাপাশি আরও দুটি কারণে জটিলতা বেড়েছে। এর একটি হচ্ছে, প্রাচ্যবাদী ব্যাখ্যার প্রসার। পশ্চিমা চোখে ইসলামি ইতিহাসের বয়ান। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামি ইতিহাস নামে বিশেষ বিভাগ আছে দীর্ঘদিন ধরেই, তবে সেখানে প্রধানত পশ্চিমা সংকলন ও ব্যাখ্যাকেই সূত্রগ্রন্থ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। শিক্ষক ও ছাত্ররা সাধারণত উর্দু-ফার্সি-আরবি পারেন না।

প্রসিদ্ধ প্রকাশনা সংস্থাগুলোতেও এই প্রবণতা দেখা যাবে। ইসলামি ইতিহাস সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ বই ইংরেজি থেকে অনূদিত, পশ্চিমা লেখকদের গবেষণা-ব্যাখ্যা থেকে সংকলিত। দেশের মূলধারার প্রকাশনী-পাঠাগারগুলোতে খোঁজ নিলে এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। যদিও ইসলামি প্রকাশনীগুলো এই ধারায় পরিবর্তন আনতে চাচ্ছে। তবে বইমেলাসহ মূলধারায় তাদের প্রবেশ একরকম নিষিদ্ধ। ফলে সীমাবদ্ধতা থেকেই যাচ্ছে।

অপর ফ্ল্যাপ দ্রষ্টব্য

ইতিহাস পাঠ

প্রসঙ্গ কথা

সংকলন

ইমরান রাইহান

সম্পাদনা

শায়খ আবদুল্লাহ আল মামুন

চেতনা

চেতনা

ইতিহাস পাঠ : প্রসঙ্গ কথা

সংকলন || ইমরান রাইহান
সম্পাদনা || শায়খ আবদুল্লাহ আল মামুন

প্রথম প্রকাশ || আগস্ট ২০২১

প্রকাশক || খুরশিদ আমজাদী
স্বত্ব || প্রকাশক
ব্যবস্থাপক || বোরহান আশরাফী
সার্বিক সমন্বয় || সুফিয়ান আহমেদ

প্রকাশনায় || চেতনা
১১/১, ইসলামী টাওয়ার
দোকান নং ২০ (১ম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১২-৯৪৭৬৫৩
০১৩০৩-৮৫৫২২৫

অনলাইন পরিবেশক || রকমারি, ওয়াফি লাইফ, কুইককার্ট, বইজগৎ, সমাহার.কম
মুদ্রণ || মা মনি প্রিন্টার্স, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
প্রচ্ছদ || আব্দুল্লাহ মারুফ রুসাফী
পৃষ্ঠাসজ্জা || আবু ওয়ারদাহ

মুদ্রিত মূল্য || ৪৪০ ৳

অর্পণ

কাজী আতহার মোবারকপুরী রহ.—যার বই পড়তে পড়তে ইতিহাসের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠা।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، والحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والحمد لله منشئ الأيام والشهور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والحمد لله مقدر المقدور، ومجري الأعوام والدهور،

أحمده تعالى وأشكره شكرا كما يحب ربنا ويرضى، وأتوب إليه وأستغفره، إليه تصير الأمور، وهو العفو الغفور .وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنفع صاحبها يوم يُبَعْثَر ما في القبور، ويُحَصّل ما في الصدور.

وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، النبي المجتبى، والحبيب المصطفى، والعبد الشكور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما امتدت البحور، وتعاقب العشي والبكور، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور، وسلّم تسليماً كثيراً.

أما بعد :

তারিখ ও ইতিহাস কী?

আরবি অভিধান গ্রন্থে তারিখ বলা হয় 'সময় নির্ধারণ করা'-কে।

যেমন বলা হয়, أَرّخ الكتابَ অথবা

أَرَخَ الكِتابَ، وأَرّخَه وآرَخَه :وقّتَه، والاسْمُ : الأُرْخَةُ.

অর্থাৎ, তিনি কিতাব লেখার তারিখ লিখেছেন।[১]

১. ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রহ. ও ইমাম সাখাবি রহ. ইসমাইল ইবনু হাম্মাদ আল-জাওহারির সূত্রে বলেন, তারিখ হচ্ছে সময় সম্পর্কে জানা। আর তাওরিখের অর্থও একই। যেমন বলা হয়, أرخت ও ورخت।[২]

পারিভাষিক অর্থে, তারিখ এমন একটি শাস্ত্র যেখানে অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি, সময় ও প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়।

---

১. *আল-কামুসুল মুহিত, লিসানুল আরব, তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস,* মুরতাযা যাবেদি ৭/১২৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।

২. *ফাতহুল বারি,* ৭/৩১৪; *আল-ইলান বিত তাওরিখ,* সাখাবি, ১৬; মুআসসাসাতুর রিসালাহ

এজন্য বাংলা ভাষায় একে 'ইতিহাস' বলা হয়। শব্দটির উৎপত্তি 'ইতিহ' শব্দ থেকে। 'ইতিহাস' শব্দটির প্রত্যয় বিভক্তি হচ্ছে, ইতিহ+আস=ইতিহাস। অর্থাৎ এমনটি ছিল বা এমনটিই ঘটেছিল।

'ইতিহ' শব্দের অর্থ হচ্ছে, 'ঐতিহ্য'। ঐতিহ্য হচ্ছে অতীতের অভ্যাস, শিক্ষা, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি, যা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত থাকে। এই ঐতিহ্যকে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয় ইতিহাস। প্রকৃতপক্ষে, মানবসমাজের অনন্ত ঘটনাপ্রবাহই হলো ইতিহাস।

ইতিহাস শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'History', যা গ্রিক শব্দ 'Historia' থেকে উদ্ভূত, এর অর্থ কোনো বিষয়ে অনুসন্ধান বা গবেষণা।

ঐতিহাসিক হেরোডোটাস তার গ্রিক ও পারসিকদের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষের ঘটনাসংবলিত গ্রন্থের নামকরণ করেন *Historia* (যার ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে *Histories*)।

২. ব্রেইন ড. জোসেপ এবং রিচার্ড ড. জানডা 'History'-কে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, এটি একটি এমন অনুসন্ধান যা তদন্ত ও অবেক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায়। (inquiry; knowledge acquired by investigation.)[৩]

৩. আল্লামা ইবনু খালদুন রহিমাহুল্লাহর ভাষায়—

নিশ্চয়ই তারিখ তথা ইতিহাসশাস্ত্র এমন একটি শাস্ত্র যা আবর্তিত হয় বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও প্রজন্মের মাঝে। যা জানার জন্য রাজাবাদশা ও নবাবরা উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রতিযোগিতা করে। আর এটি বুঝতে আলেম ও মূর্খ উভয় শ্রেণিই সমানভাবে সক্ষম।

কেননা তারিখ বাহ্যিকভাবে (সাধারণত) সময়ের ব্যাপ্তিকাল ও বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ঘটনা ও শত বছরের অতিবাহিত বিষয়াবলির বিবরণের বাইরে আগে বেড়ে অতিরিক্ত (ভিন্ন শাস্ত্রে পদার্পণ করে না। এতে অধিকাংশই বহু লোকের উদ্ধৃতি ও দৃষ্টান্তমূলক ঘটনারই বিবরণ উল্লেখ থাকে।

যখন বড় ধরনের কোনো গণসমাবেশ হয় তখন তারিখের মাধ্যমেই এদের পৃথকীকরণ করে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করা হয়। আর এই শাস্ত্রই আমাদের দুনিয়ার এই হালত উপস্থাপন করে যে, কোন প্রকৃতির মানুষকে কীরকম কষ্টের জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে, তারা কীরকম নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন

---

৩. *The Handbook of Historical Linguistics*, Blackwell Publishing, page. ১৬৩

হয়েছে ও রাজাবাদশাদের ক্ষমতার সীমা কতটা প্রশস্ত ছিল, আর তারা কীভাবে মেহনত করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করেছেন এমনকি এভাবেই হঠাৎ এক সময় তাদের গাট্টি ও সামানা বাঁধার (তথা মৃত্যুর) ঘণ্টা বেজে গিয়েছে, চলে যাওয়ার (দুনিয়া ত্যাগ করার) সময় ঘনিয়ে এসেছে।

কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, তারিখশাস্ত্রে অনেক সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বজগতের অনেক অজানা কারণের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয় উপাদানও রয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন ঘটনার অবস্থা ও প্রেক্ষাপটের গভীর জ্ঞান রয়েছে।[৪]

ইমাম ইবনু খালদুন রহ. নগরায়ণকেও ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মনে করতেন। তিনি আরও বলেন—

এটি হচ্ছে সমাজবদ্ধ মানুষের সংবাদ যা বিশ্ববাসীর অতীত জীবনাচার ও বৈশিষ্ট্য। যা বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থার বিবরণ দিয়ে সেই সময়ের অধিবাসীদের বিচ্ছিন্নতা ও হিংস্রতা, মানবিকতা ও দয়া, জাতীয়তাবোধ এবং মানুষের একে অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তারের আচার-প্রকৃতির ঘটনা উপস্থাপন করে থাকে। এ ছাড়াও এতে রাজাবাদশা, রাজবংশ ও তাদের সমপর্যায়ের মানুষদের থেকে কীরূপ আচরণ প্রকাশ পেয়েছে এবং কীভাবে (সমাজের) মানুষেরা (তাদের) কর্ম সম্পাদন ও পরস্পর সহযোগিতা করে উপার্জন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, জ্ঞানবিজ্ঞান এবং দক্ষতার (বিকাশ ঘটানোর) মাধ্যমে সেই সমাজকে রূপান্তর তথা তার পটপরিবর্তন করেছে তারও সংবাদ পেশ করা হয়েছে। (তারিখ) সে সময়কার অন্যান্য সকল ঘটনা প্রবাহের অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের সংবাদ প্রদান করে থাকে।[৫]

৪. ইমাম সাখাবি রহ. বলেন, পারিভাষিক অর্থে সময় সম্পর্কে জানার নামই তারিখ। যার মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ থাকে। তার মাঝে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, রাবিদের (বর্ণনাকারীদের) ও ইমামদের জন্ম-মৃত্যু, সত্যতা, জ্ঞান, দেহ তথা আকার-আকৃতি, (ইলমের জন্য তাদের) সফর ও হজ, স্মৃতিশক্তি ও সংরক্ষণক্ষমতা, নির্ভরযোগ্যতা ও সমালোচনা এবং এরকম আরও বিভিন্ন অবস্থা যার মাধ্যমে তাদের আবির্ভাব, অবস্থা, ও সমাদর সম্পর্কে অনুসন্ধান করা যায়।

উত্থান, পুনরুত্থান, খলিফা, মন্ত্রী, অন্য দেশে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আক্রমণ, সংগ্রাম ও আন্দোলন, যুদ্ধবিগ্রহ, দেশ জয় করা এবং দেশকে অন্যের

---

৪. *আল-মুকাদ্দিমা*, ১/৮১, দারু ইয়ারুব, শাইখ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আদ-দারবিশের তাহকিককৃত।

৫. *আল-মুকাদ্দিমা*, ১/১২৫, দারু ইয়ারুব, শাইখ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আদ-দারবিশের তাহকিককৃত।

আধিপত্যমুক্ত করা, দেশ ও রাজত্ব স্থানান্তর হওয়ার মতো বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও দুর্দান্ত ঘটনাবলিও এর মাধ্যমে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত হয়।

কখনো আবার এতে সৃষ্টির সূচনাসংক্রান্ত আলোচনা, নবিদের ঘটনা এবং অন্যান্য বিষয় যা পূর্ববর্তী উম্মতের ওপর অতিবাহিত হয়েছে এমন ঘটনাবলি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে পরিব্যাপ্ত ও সুবিস্তীর্ণ হয়। এ ছাড়াও কিয়ামত ও তার প্রারম্ভিকতার সার্বিক অবস্থার বর্ণনাও এর অন্তর্ভুক্ত যেমনটি অচিরেই সুবিস্তর আলোচনা হবে।

এ ছাড়াও জামে মসজিদ, মাদরাসা, সেতু-পুল ও ফুটপাতসহ অন্যান্য স্থাপত্যনির্মাণও এতে স্থান পায়।[৬]

৫. ইমাম সুয়ুতি রহ. বলেন, আল্লামা কিরমানি রহ. তার 'আখবারুদ দুয়াল ওয়া আসারুল উওয়াল ফিত-তারিখ আন মারিফাতি ইলমিত তারিখ' কিতাবের ভূমিকায় বলেন—

তারিখ হচ্ছে, অতীত বিশ্বের ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহের সংবাদ সম্পর্কে জানা। হোক সেটা বর্তমান অথবা গত হয়ে যাওয়া জামানা। এটি সেই পদ্ধতি যার মাধ্যমে অতীতের লোক ও সম্প্রদায় সম্পর্কে জানা যায়। কীভাবে জেদের বশবর্তী হয়ে পরস্পর রাগ ও রোষানলের মুখোমুখি হয়েছে অতঃপর কীভাবে তা ধ্বংস ও বিপর্যয়ে রূপান্তরিত হয়েছে তা জানা যায়।

এ ছাড়াও মিথ্যুকদের মুখোশ উন্মোচন ও সত্যবাদীদের অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম পদ্ধতি হচ্ছে তারিখ।[৭]

৬. শাইখ আবদুর রহমান ইবনু বুরহানুদ্দিন আল-জাবারতি রহ. বলেন, মনে রাখবে, তারিখ এমন এক শাস্ত্র যাতে বিভিন্ন দল ও উপদলের অবস্থা এবং তাদের দেশ, প্রথা-প্রচলন, স্বভাবপ্রকৃতি, দক্ষতা, বংশ ও মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়।[৮]

৭. আল্লামা মাকরেজি রহ. বলেন, আগের জামানায় পৃথিবীতে যা-কিছু ঘটেছে তার সংবাদকেই ইতিহাস বলা হয়।[৯]

মোটকথা, অতীত নিয়ে পাঠ-পর্যালোচনা করার নামই ইতিহাস ও তারিখ।

---

[৬]. *আল-ইলান বিত-তাওবিখ লিমান যাম্মা আহলাত তারিখ*, ১৮-১৯, মুআসসাসাতুর রিসালাহ।
[৭]. *আশ-শামারিখ ফি ইলমিত তারিখ*, ১/১১।
[৮]. *আজাইবুল আসার ফিত-তারাজিমি ওয়াল-আখবার*, জাবারতি, ১/৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।
[৯]. *ইলমুত তারিখ ইনদাল মুসলিমিন*, ফ্রাঞ্জ রোসেনথাল, ২৬।

ইতিহাস শিক্ষা ও উপদেশ লাভের অন্যতম উপাদান

ইতিহাস এমন একটি উপাদান যার মাধ্যমে সাধারণত শিক্ষা ও উপদেশ নেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ কুরআন কারিমে বহু বাস্তবঘটিত ইতিহাসের বর্ণনা দিয়েছেন। এসব ইতিহাস বর্ণনার একটাই উদ্দেশ্য ছিল আর তা হচ্ছে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করা।

১. মহান আল্লাহ বলেন—

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

তাদের (অর্থাৎ ইউসুফ আ. ও তার ভাইদের এবং কোনো কোনো তাফসিরে রয়েছে, নবিদের) কাহিনিতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোনো মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ রহমত ও হেদায়েত। [সুরা ইউসুফ : ১১১]

২. ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, আলেমদের উত্তম ঘটনাবলি জানা আমার নিকট অধিক পরিমাণে ফিকহচর্চা করা হতে অধিক পছন্দের। কেননা এতে একটি সম্প্রদায়ের বিবিধ আচরণ ও শিষ্টাচার ফুটে ওঠে। এর পক্ষে কুরআন থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই আয়াত দলিল হিসেবে বলা যায়, 'তাদের কাহিনিতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয়।'[১০] [সুরা ইউসুফ : ১১১]

৩. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেন—

﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

তোমাদের আগে অতীত হয়েছে অনেক ধরনের জীবনাচরণ ও তাদের রীতিনীতি। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কী হয়েছে। [সুরা আলে ইমরান : ১৩৭]

অনুরূপ নির্দেশ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন সুরা আনআমের ১১, সুরা নামলের ৬৯ এবং সুরা রুমের ৪২ নম্বর আয়াতে।

---

১০. *আল-ইলান বিত-তাওবিখ*, সাখাবি, ২০।

এই আয়াতসমূহ থেকে বোঝা যায় আল্লাহ তাআলা ইতিহাসকে কেবল পঠনের মাঝেই সীমাবদ্ধ করেননি বরং এর সত্যতা যাচাইয়ের ও পর্যালোচনার জন্য সরেজমিনে ঘুরে দেখার কথাও বলছেন।

আবার কখনো আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা সৃষ্টিজগতের অমোঘ ও নিগূঢ় রহস্য খোঁজার নিমিত্তে কিংবা সৃষ্টিতত্ত্বের সূচনা কীভাবে হয়েছে তা জানতেও ইতিহাসসাক্ষ্য ঐতিহাসিক স্থানসমূহে পরিভ্রমণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

৪. আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন—

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

বলুন, তোমরা জমিনে ভ্রমণ করো, অতঃপর দেখো কীভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছিলেন, তারপর আল্লাহই আরেকবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। [সুরা আনকাবুত : ২০]

৫. আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾

এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মতো অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে। [সুরা কাফ : ৩৭]

এ ছাড়াও ইতিহাসের আরেকটি ফায়দার বিষয় হচ্ছে, পূর্বের ইতিহাস আমাদের জন্য অনেক সময় উৎসাহব্যঞ্জক হয়ে থাকে আবার আমাদের প্রত্যয়কে দৃঢ় করতেও সহায়তা করে।

৬. আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা বলেন—

﴿وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

আর আমি রাসুলগণের সব বৃত্তান্তই তোমাকে বলছি, যদ্দ্বারা তোমার অন্তরকে মজবুত করছি। আর এভাবে তোমার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য উপদেশ ও স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে। [সুরা হুদ : ১২০]

৭. আল্লামা মাওয়ারদি রহ. এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, ওইসকল (পূর্ববর্তী) ঘটনাবলির মাধ্যমে আমি তোমার অন্তরকে শক্তিশালী, দৃঢ় ও প্রশান্ত

করব। কেননা তারা (নবিরা) মুসিবতগ্রস্থ হয়েছিলেন অতঃপর সবর করেছেন, এবং মুজাহাদা (কষ্ট, ক্লেশ সহ্য করেছেন অতঃপর জিহাদ করেছেন)। ফলে তারা সফলতা অর্জন করেছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেন।[১১]

৮. ইমাম বাগাবি রহ. এর তাফসিরে বলেন, অর্থাৎ নবি-রাসুল ও তাদের উম্মতের ঘটনাবলি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি (যদ্দারা আমি আপনার অন্তরকে মজবুত করছি), অর্থাৎ যেন আমি আপনার দৃঢ় বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করতে পারি এবং আপনার অন্তরকে শক্তিশালী করতে পারি। এজন্যই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই এ সকল ঘটনাবলি শুনতেন তাতে তাঁর অন্তর তাঁর (কাফের) উম্মতের দেওয়া কষ্টের ওপর ধৈর্য ধরতে সাহায্য করত।[১২]

৯. ইমাম ইবনু রজব আল-হাম্বলি রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, নিশ্চয়ই নেককার ব্যক্তিদের ইতিহাস শ্রবণ করার মাধ্যমে প্রত্যয়ের দৃঢ়তা আসে এবং ওইসকল আসার অনুসরণ করতে সহায়ক (উৎসাহব্যঞ্জক) হয়ে থাকে।

কোনো কোনো আরেফ (আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ) বলে থাকেন, পূর্ববর্তী (বুজুর্গদের) ঘটনাবলি আল্লাহর সেনাবাহিনীর মধ্যে অন্যতম সেনা, যার দ্বারা মুরিদের অন্তর (নেক কাজের ব্যাপারে) দৃঢ় হয়।[১৩]

১০. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেন—

﴿وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَ النَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ ؕ وَ كُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا﴾

আর আমি রাত ও দিনকে করেছি দুটি নিদর্শন। অতঃপর মুছে দিয়েছি রাতের নিদর্শন এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যাতে

---

১১. *আন-নুকাত ওয়াল-উয়ুন*, মাওয়ারদি, ২/৫১২।
১২. *মাআলিমুত তানজিল* (তাফসিরে বাগাবি), ৪/২০৭।
১৩. *তাফসিরে ইবনু রজব আল-হাম্বলি*, ১/৫৭২; ইমাম জুনাইদ আল-বাগদাদি থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং তাকে এর পক্ষে কোনো দলিল আছে কি না জানতে চাইলে তিনি দলিল হিসেবে সুরা হুদের উক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। *রিসালাতুল কুশাইরিয়া*, ২/৩৫৪।

তোমরা বর্ষসংখ্যা ও হিসাব জানতে পারো। আর আমি প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। [সুরা বনি ইসরাইল : ১২]

১১. ইমাম ইবনু কাসির রহ. এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির ওপর বড় বড় নিদর্শন দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন, এসব অনুগ্রহের মাঝে অন্যতম হচ্ছে, রাত ও দিনের পরিবর্তন। (রাতকে সৃষ্টি করেছেন) যেন রাতে শান্তির বিশ্রাম নেওয়া যায়। আর (দিনকে সৃষ্টি করেছেন) দিনেরবেলা জীবিকানির্বাহ, শিল্পবাণিজ্য, কাজকর্ম ও সফর করার জন্য। (এই রাত ও দিন সৃষ্টি করা হয়েছে) যেন দিনকাল, সপ্তাহ, মাস ও বছরের হিসাব রাখা যায়। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রজন্মের অতীতের দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাস জানার জন্যও। যেমন তাদের ধর্ম, ইবাদাত, লেনদেন এবং জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যেন তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো।' অর্থাৎ তোমাদের অর্থনীতিতে ও সফরে এবং অন্যান্য বিষয়ে। (আল্লাহ বলেন,) 'যেন তোমরা বছর গণনা ও হিসাবনিকাশ সম্পর্কে জানতে পারো।' [সুরা ইউনুস : ৫]

যদি গোটা জামানা তথা সময়ের ব্যাপ্তিকালের ধারা ও প্রক্রিয়া এক ও অভিন্ন সমান পদ্ধতিতে পরিচালিত হতো তাহলে সেখান থেকে কোনোকিছুই জানা যেত না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ○ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○ وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾

'বলো, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ রাতকে তোমাদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে তাঁর পরিবর্তে কোনো ইলাহ আছে কি যে তোমাদের আলো এনে দেবে? তবুও কি তোমরা শুনবে না? বলো, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ দিনকে তোমাদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে তাঁর পরিবর্তে কোনো ইলাহ আছে কি, যে তোমাদের রাত এনে দেবে যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তবুও

কি তোমরা ভেবে দেখবে না? আর তাঁর অনুগ্রহে তিনি তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন যাতে তোমরা বিশ্রাম নিতে পারো এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যেন তোমরা শোকর আদায় করতে পারো।[১৪] [সুরা কাসাস : ৭১-৭৩]

১২. আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ○ وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا﴾

কত বরকতময় (প্রাচুর্যময়) তিনি যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন বিশাল তারকাপুঞ্জ (রাশিচক্র) এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ (অর্থাৎ সূর্য। কেননা সুরা নুহে সূর্যকে প্রদীপ বলা হয়েছে) ও আলো বিকিরণকারী (দীপ্তিময়) চাঁদ। এবং যারা অনুসন্ধানপ্রিয় অথবা যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায় বা কৃতজ্ঞতাপ্রিয় তাদের জন্য তিনি রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীলরূপে। [সুরা ফুরকান : ৬১-৬২]

সুতরাং এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি, ইতিহাস হচ্ছে শিক্ষা, উপদেশ, উৎসাহপ্রাপ্তির ও প্রত্যয়দৃঢ় লাভের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ইতিহাসের বিষয়বস্তু

ইতিহাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষ, মহামানব (যেমন : নবিগণ, সাহাবায়ে কেরাম, উলামায়ে কেরাম ও আওলিয়াগণ), তার পারিপার্শ্বিকতা (প্রকৃতি ও পরিবেশ) ও জীবনচরিত এবং সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ, পরিবর্তন, উত্থান ও পতন। যেমন : শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন, স্থাপত্য, রাজনীতি, যুদ্ধ, ধর্ম, আইন সামগ্রিকভাবে যা-কিছু সমাজ-সভ্যতা বিকাশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করছে তাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

ইতিহাসের উপাদান

ইতিহাস রচনার উপাদান সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত। যেমন, ক) লিখিত উপাদান এবং খ) অলিখিত উপাদান।

ক) লিখিত উপাদানের মধ্যে সাহিত্য, নথিপত্র, জীবনী প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। যেমন বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থাবলি, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', কলহনের 'রাজতরঙ্গিণী',

---

[১৪] *তাফসিরু ইবনি কাসির*, ৫/৫০।

মিনহাজ-উস-সিরাজের 'তবাকাতে নাসিরি', আবুল ফজলের 'আইনে আকবরি' ইত্যাদি।

খ) অলিখিত উপাদানমূলক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। যেমন : মূর্তি, ভাস্কর্য, স্মৃতিস্তম্ভ, মুদ্রা, লিপি, ইমারত ইত্যাদি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। অর্থাৎ বিভিন্ন জাতির সভ্যতা ও তার নিদর্শন এর উদাহরণ।

ইতিহাসের পরিসর

মানুষ কর্তৃক সম্পাদিত সব বিষয় ইতিহাসের পরিসরের আওতাভুক্ত। মানুষের চিন্তাভাবনা, পরিকল্পনা, কার্যক্রম যত শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত, ইতিহাসের সীমাও ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

তবে এ বিস্তৃতির সীমা স্থিতিশীল নয়। মানুষের চিন্তাভাবনা, কর্মধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের পরিসরও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রথম পর্বের মানুষের কর্মকাণ্ড খাদ্য সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উৎপাদনকৌশল তখনও তাদের অজানা ছিল। ফলে সে সময় ইতিহাসের পরিসরও খাদ্য সংগ্রহমূলক কর্মকাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সময়ের বিবর্তনে, সভ্যতার অগ্রগতির কারণে মানুষের কর্মকাণ্ডের পরিধি বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসচর্চায়, গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও অনুসৃত হচ্ছে। ফলে ইতিহাস বিষয়ে শাখা-প্রশাখার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে, বিস্তৃত হচ্ছে ইতিহাসের সীমানাও। উনিশ শতকে রাজনীতি ইতিহাসের বিষয় হলেও মার্কসবাদ প্রচারের পর অর্থনীতি, সমাজ, শিল্পকলার ইতিহাসও রচিত হতে থাকে। এভাবে একের পর এক বিষয় ইতিহাসভুক্ত হচ্ছে আর সম্প্রসারিত হচ্ছে ইতিহাসের পরিসর।

ইতিহাসের প্রকারভেদ

পঠনপাঠন, আলোচনা ও গবেষণাকর্মের সুবিধার্থে ইতিহাসকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, ভৌগোলিক অবস্থানগত ইতিহাস ও বিষয়বস্তুগত ইতিহাস।

(১) ভৌগোলিক অবস্থানগত ইতিহাস : যে বিষয়টি ইতিহাসে স্থান পেয়েছে, তা কোন প্রেক্ষাপটে রচিত—স্থানীয়, জাতীয় না আন্তর্জাতিক। এভাবে ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে শুধু বোঝার সুবিধার্থে ইতিহাসকে আবারও তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইতিহাস, জাতীয় ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক ইতিহাস।

(২) কোনো বিশেষ বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে যে ইতিহাস রচিত হয়, তাকে বিষয়বস্তুগত ইতিহাস বলা হয়। ইতিহাসের বিষয়বস্তুর পরিসর ব্যাপক। তবুও সাধারণভাবে একে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, রাজনৈতিক ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, কূটনৈতিক ইতিহাস ও সাম্প্রতিক ইতিহাস।

ইসলামি তারিখ ও ইতিহাসের সূচনা

১. ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রহ. ইমাম হাকেম থেকে তার কিতাব 'আল-মাদখাল ইলা কিতাবিল ইকলিল'-এর হাওয়ালা দিয়ে শিহাব আয-যুহরির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় আগমন করলেন তিনি 'তারিখ' লেখার নির্দেশ প্রদান করলেন, অতঃপর তা রবিউল আওয়াল মাসে লেখা হলো।[১৫]

২. তবে ইমাম সাখাবি রহ. আসমায়ি থেকে বর্ণনা করেন, মূলত সাহাবিগণ হিজরতের মাস রবিউল আওয়াল থেকে (ইসলামি) তারিখ গণনা শুরু করেন।[১৬]

৩. ইমাম ইবনু হাজার রহ.-ও সুহাইলির বরাতে বলেন, সাহাবিগণ হিজরতের বছর থেকে (ইসলামি) তারিখ গণনা ও লিপিবদ্ধ করা শুরু করেন।[১৭]

৪. আর ইমাম বুখারি রহ.-ও মূলত এই দিকে ইঙ্গিত করে তার 'সহিহ বুখারি'র 'বাবুত তারিখ মিন আইনা আররাখুত তারিখ' (অর্থাৎ অধ্যায় : কবে থেকে সাহাবিরা তারিখ গণনা শুরু করেছেন?) শিরোনামে ৩৭১৯ (অন্য নুসখায় ৩৯৩৪) নম্বর হাদিস বর্ণনা করেন—

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا عَدُّوْا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلاَ مِنْ وَفَاتِهِ، مَا عَدُّوا إِلَّا مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ.

সাহল ইবনু সাদ বলেন, তারা (সাহাবিরা) নবিজির নবুয়তপ্রাপ্তির বছর থেকে কিংবা তার ওফাতের বছর থেকে তারিখ গণনা করেননি। তবে

---

[১৫]. এই বর্ণনা সহিহ নয়। স্বয়ং ইবনু হাজার এটি উল্লেখ করে একে মুদাল বলেছেন। *ফাতহুল বারি*, ৭/৩১৪।

[১৬]. *আল-ইলান বিত-তাওবিখ*, ৭৮।

[১৭]. *ফাতহুল বারি*, ৭/৩১৪।

তিনি মদিনায় আগমন করার বছর থেকে (ইসলামি) তারিখ গণনা শুরু হয়েছে।

৫. এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু হাজার রহ. বলেন, এখানে মদিনায় আগমনের মাস বোঝানো হয়নি বরং বছর বোঝানো হয়েছে। কেননা তারিখ মূলত বছরের শুরু থেকে ধরা হয়।[১৮]

৬. সাহিব ইবনু আব্বাদ বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১২ রবিউল আওয়ালের সোমবার মদিনায় প্রবেশ করেন। আর তখন থেকে (ইসলামি) তারিখ গণনা শুরু হয়। এরপর তা মুহাররম মাসে প্রত্যাবর্তন করে।[১৯]

৭. ইমাম কসতল্লানি রহ. বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারিখ গণনার নির্দেশ প্রদান করেন, এরপর তা হিজরতের মাস থেকে গণনা করা হয় (এই বর্ণনাটি সহিহ নয় যা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি)। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রথম উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুহাররম মাস থেকে (ইসলামি) তারিখ গণনার ধারা শুরু করেন।[২০]

৮. ইমাম ইবনু হাজার ফাদল ইবনু দুকাইনের 'তারিখ' গ্রন্থের সূত্রে ইমাম হাকেমের একটি বর্ণনা উল্লেখ করেন যা তিনি ইমাম শাবির সূত্রে বর্ণনা করেন, একবার আবু মুসা আল-আশআরি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে চিঠি লিখলেন যে, 'আপনার পক্ষ থেকে আমাদের নিকট একটি পত্র এসেছে যাতে কোনো তারিখ নেই।'

এরপর উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাহাবি ও তাবেয়িদের পরামর্শের জন্য একত্র করলেন। তাদের কেউ কেউ বললেন, নবিজির দুনিয়ায় আগমনের বছর থেকে গণনা করুন। কেউ বললেন, হিজরতের বছর থেকে। তখন উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, হিজরত মূলত হক ও বাতিলের মাঝে বিভেদকারী, তাই হিজরতের বছর থেকেই এটি গণনা শুরু করো। আর তা ছিল ১৭ হিজরি সন। যখন সকলেই এ ব্যাপারে একমত হলেন, তখন কতিপয় লোক বলল, তাহলে এটি রমজান মাস থেকে (প্রথম মাস হিসেবে শুরু করা হোক)। তখন উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, না, বরং এটি মুহাররম মাস থেকে (প্রথম মাস হিসেবে) গণনা করা হবে। কেননা মানুষ

---

[১৮]. *ফাতহুল বারি*, ৭/২৬৮-২৬৯, হাদিস, ৩৯৩৪ (অন্য নুসখায় ৩৭১৯), দারুল মারিফাহ, বৈরুত।

[১৯]. *উনওয়ানুল মাআরিফ*, ইবনু আব্বাদ , ১১।

[২০]. *আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া*, ১/৬৭।

তাদের হজব্রত পালন করে এই মাসেই ফিরে আসেন (পদার্পণ করেন)। এতেও সাহাবিরা একমত হলেন।

কেউ কেউ বলেন, প্রথম তারিখ লিপিবদ্ধ করেন ইয়ালা ইবনু উমাইয়া যখন তিনি ইয়ামানে ছিলেন। এটি আহমাদ ইবনু হাম্বল সহিহ সনদে তার 'মুসনাদ'-এ বর্ণনা করেন। তবে এই বর্ণনার রাবিগণ সহিহ হলেও এটি মুনকাতি। উমর ইবনু দিনার ও ইয়ালার মাঝে একজন রাবি ইনকিতা হয়েছে (বাদ পড়েছে)।

ইমাম আহমাদ তার 'মুসনাদ'-এ ও আবু আরুবাহ তার 'আল-আওয়ায়িল'-এ, ইমাম বুখারি তার 'আদাবুল মুফরাদ'-এ এবং ইমাম হাকেম তার 'মুসতাদরাক'-এ মাইমুন ইবনু মিহরান থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে একটি ঋণপত্র (অথবা আর্থিক নথিপত্র ও রশিদ) উপস্থাপন করা হলো যেখানে শাবান মাসের উল্লেখ ছিল। তিনি বললেন, এটা কোন বছরের শাবান মাস? গত বছরের, না যে বছরে আমরা বর্তমান আছি, না আগামী বছর? সবাইকে (বিশিষ্টজনদেরকে) একত্র করে এই সমস্যাটি উপস্থাপন করো যাতে করে বছর নির্দিষ্ট করা যায়। এরপর পূর্বে উল্লেখিত ঘটনাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম হাকেম সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. থেকে বর্ণনা করেন, উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মানুষদের একত্র করে তারিখ গণনার প্রথম দিন কোনটি হতে পারে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আলি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, ওই দিন থেকে যেদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করেছেন এবং মক্কার মুশরিকদের পরিত্যাগ করেছেন। অতঃপর উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাই করলেন।

ইবনু আবি খইমাহ তার 'আত-তারিখুল কাবির' গ্রন্থে ইবনু সিরিনের সূত্রে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি ইয়ামান থেকে মদিনায় এলেন এবং উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন, আমি ইয়ামানে একটি বিষয় লক্ষ করছি যে, তারা (নথিপত্রে) অমুক মাস ও অমুক সন উল্লেখ করেন আর তারা এর নাম দিয়ে থাকে 'তারিখ'। এটা শুনে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, এ তো খুব সুন্দর একটি বিষয়। এমনটাই করো। অতঃপর তিনি মানুষদের পরামর্শের জন্য একত্র করলে একদল বলেন, নবিজির জন্মসাল থেকে গণনা শুরু করুন। কেউ বললেন, তাঁর নবুয়ত লাভের বছর থেকে। কেউ বললেন, হিজরতের উদ্দেশ্যে যখন তিনি বের হয়েছেন সেই বছর থেকে বা তাঁর ওফাতের বছর

থেকে। এরপর উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, তাঁর মক্কা থেকে বের হয়ে মদিনায় আগমন করার (তথা হিজরতের) বছর থেকে গণনা শুরু করো।

তখন তিনি বললেন, তাহলে কোন মাস থেকে আমরা বছর শুরু করব? তখন একদল বললেন, রজব মাস থেকে। কেউ বললেন, রমজান মাস থেকে। অতঃপর উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, মুহাররম মাস থেকে গণনা শুরু করুন, কেননা এটি হারাম (নিষিদ্ধ ও পবিত্র) মাস। আর মানুষ হজব্রত পালন করার পর যে মাসে প্রত্যাবর্তন করে তা এটিই। (ইবনু সিরিন বলেন,) আর সেই বছরটি ১৭ হিজরি সন ছিল। কেউ কেউ বলেন, রবিউল আওয়াল মাসের ১৬ হিজরি সন ছিল।

এই সকল আসার থেকে এটাই আমরা বুঝি যে, মুহাররম মাস থেকে হিজরি সন শুরু করার দিকে উমর, উসমান ও আলি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।[২১]

৯. প্রখ্যাত শিয়া ঐতিহাসিক ও আইনজ্ঞ ইবনু শাহর আশুব বলেন, 'ইমাম তাবারি ও মুজাহিদ উভয়েই তাদের 'তারিখ' গ্রন্থে বলেন, উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মানুষদের একত্র করলেন এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস (পরামর্শ) করতে যে, আমরা কবে থেকে দিন লিখব। তখন আলি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, ওই দিন থেকে যেদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গ মক্কার মুশরিকদের পরিত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেছেন।...[২২]

১০. বিশিষ্ট তাবেয়ি সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. থেকে বর্ণিত, প্রথম উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার খিলাফতকালের আড়াই বছরের মাথায় ১৬ হিজরি সনে আলি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরামর্শে (ইসলামি) তারিখ ও সময় লেখেন।[২৩]

এ ছাড়াও এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে জানতে দেখুন—

---

২১. *ফাতহুল বারি*, ৭/২৬৮-২৬৯, হাদিস, ৩৯৩৪ (অন্য নুসখায় ৩৭১৯), দারুল মারিফাহ, বৈরুত।

২২. *মানাকিবে ইবনু শাহর আশুব*, ১/৩৩৮।

২৩. *মুসতাদরাকে হাকেম*, ৩/১৪, ইমাম হাকেম একে সহিহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবি তা সমর্থন করেছেন। *তারিখে তাবারি*, ৩/১৪৪; *তারিখুল ইসলাম* (আহদুল খুলাফা), ১৬৩; *আশ-শামারিখ ফি ইলমিত তারিখ*, সুয়ুতি, ১৪, মাকতাবাতুল আদাব, কায়রো; *কানযুল উম্মাল*, ১০/৩০৯, হাদিস ২৯৫৫২, ইবনুল জাওযি, *মানাকিবে আমিরুল মুমিনিন উমর*, ৬২। ইবনুল মিবরাদ আল-হাম্বলি, *মাহযুস সাওয়াব ফি মানাকিবি উমর ইবনুল খাত্তাব*, ১/৩১৬, মাকতাবাতু আদওয়াউস সালাফ, রিয়াদ।

আল-কামিল ফিত-তারিখ, ইবনুল আসির, ১/৯, মাকতাবাতুল মুনিরিয়াহ; *আল-ইলান বিত-তাওবিখ, সাখাবি*, পৃ. ১৪০-১৪১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ; *আশ-শামারিখ ফি ইলমিত তারিখ, সুয়ুতি*, ১৪, মাকতাবাতুল আদাব, কায়রো; *আল-কামিল ফিল-লুগাতি ওয়াল-আদাব*, ইবনুল মিবরাদ আল-হাম্বলি, ১/৬৭১-৬৭২, দারুল ফিকরিল আরাবি (আহমাদ শাকেরের তাহকিকসহ); *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ইবনু আসাকির, ১/৩৬-৪৬; *আল-মুনতাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল-উমাম*, ইবনুল জাওযি, ৪/২২৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; *তারিখে তাবারি*, ২/৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; *মাহযুস সাওয়াব ফি মানাকিবি উমর ইবনুল খাত্তাব*, ইবনুল মুবাররিদ আল-হাম্বলি, ১/৩১৬, মাকতাবাতু আদওয়াউস সালাফ, রিয়াদ; *ফাইযুল কাদির শরহু জামে আস-সগির*, মুনাবি, ১/১৩৩, *সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ফি সিরাতি খইরিল ইবাদ*, ইউসুফ সালেহানি।

ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা

ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে আমরা মানবসমাজের শুরু থেকে তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড, চিন্তা-চেতনা ও জীবনযাত্রার অগ্রগতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি। কেননা ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য বিষয় হলো মানবসমাজের অগ্রগতির ধারা বর্ণনা। সভ্যতার প্রধান প্রধান স্তর, সভ্যতার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কথা সম্পর্কে ইতিহাস থেকে জানা যায়।

ইতিহাস আমাদের অতীত সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। ইতিহাসের আলোকে আমরা বর্তমানকে বিচার করতে পারি। ইতিহাস পাঠ জাতীয় চেতনা উন্মেষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। একটি জাতির ঐতিহ্য ও অতীতের গৌরবান্বিত ইতিহাস ওই জাতিকে বর্তমানের মর্যাদাপূর্ণ কর্মতৎপরতায় উদ্দীপিত করতে পারে।

ইতিহাস রচনা ও ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই। শাস্ত্রীয় আলেম-উলামা, রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সামরিক ব্যক্তিবর্গ ও প্রশাসকসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিকট ইতিহাস খুবই মূল্যবান বিষয়।

১. ইমাম মুনাবি রহ. বলেন, তারিখের অনেক ফায়দা রয়েছে। যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। তার মাঝে অন্যতম হচ্ছে, খতিব বাগদাদির জামানায় এক ইহুদি একটি কিতাব নিয়ে এসে আবির্ভূত হয়ে এই দাবি করছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারের বাসিন্দাদের জন্য জিজিয়ার বিধান রহিত করে দিয়েছেন। আর এই কিতাবে তার সাক্ষ্য উল্লেখ রয়েছে। এই

বিষয় নিয়ে পরস্পরের মাঝে বাকবিতণ্ডা শুরু হলো। ফলে খতিব বাগদাদির নিকট তা পেশ করা হলো। তিনি তা গভীর পর্যবেক্ষণ করে বললেন, এটা তো মিথ্যা। কেননা এতে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাক্ষ্য উল্লেখ রয়েছে, অথচ তিনি তো ফতহে মক্কার বছরে (কোনো বর্ণনায় ফতহে মক্কার দিনে ইসলাম কবুল করেছেন। আর খাইবারের বিজয় তো ৭ম হিজরিতে (যা মুআবিয়ার ইসলাম গ্রহণের বহু পূর্বে। সে হিসেবে তিনি কীভাবে সাক্ষ্য দেবেন!) আর এতে সাদ ইবনু মুআজের সাক্ষ্যও রয়েছে, অথচ তিনি বনু কুরাইজার ঘটনা পর পরই (অর্থাৎ খাইবারের ঘটনার পূর্বে খন্দকের বছরে) মৃত্যুবরণ করেন। এই জবাব পেয়ে মুসলমানরা বেজায় খুশি হলেন।[২৪]

২. একই ঘটনা ইমাম ইবনু কাসিরও আবু বকর আল-খতিব আল-বাগদাদির (রহিমাহুমাল্লাহ) আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।[২৫]

৩. এজন্যই ইমাম সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন, যখন রাবিরা মিথ্যার অস্ত্র ব্যবহার করে, তখন তাদের (প্রতিরোধে) আমরা তাদের জন্য তারিখের অস্ত্র ব্যবহার করি।[২৬]

৪. ইমাম মুসলিম রহ. বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইবনু আবদির রহমান আদ-দারেমি বলেন, আমি আবু নুআইম থেকে শুনেছি তাকে মুআল্লা ইবনু ইরফান বলেন, আমাদের আবু ওয়ায়েল বর্ণনা করেন যে, সিফফিনের যুদ্ধের দিন ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমাদের নিকট বের হয়ে এলে... এটা শুনে আবু নুআইম বললেন, তুমি কি কাউকে কখনো মৃত্যুর পর পুনরায় ফিরে আসতে দেখেছ!?'[২৭]

৫. ইমাম নববি রহ. ইমাম মুসলিমের এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা এভাবে তুলে ধরেছেন, এই কথার অর্থ হচ্ছে, মুআল্লা মিথ্যা বলছে। কেননা ইবনু মাসউদ ৩২ হিজরিতে কারও মতে ৩৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেছেন। ১ম মতটিই অধিকাংশের মত। আর এটি ৩৩ হিজরিতে খলিফা উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফতের পরিসমাপ্তির পূর্বে। অথচ সিফফিন যুদ্ধ তো এর দুই বছর

---

২৪. মুনাবি, *ফাইজুল কাদির শরহে জামে আস-সগির*, ১/১৩৩।

২৫. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১২/১০৮; ইমাম ইবনুল কাইয়িমও এটি বর্ণনা করেছেন তার 'আল মানারুল মুনিফ ফিস হিহ ওয়াজ-জইফ' গ্রন্থে, পৃ. ১০২-১০৫।

২৬. *আল-কিফায়াহ ফি ইলমির রিওয়ায়াহ*, খতিব বাগদাদি, পৃ. ১৯৩; *আল কামেল*, ইবনু আদি, ১/১৬৯; *তারিখে দিমাশক*, ইবনু আসাকির, ১/৫৪; *তালখিসুল হাবির*, ১/৩৭; *মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ*, পৃ. ২১৬; *তানিবুল খতিব*, কাওসারি, ১/৩০৯।

২৭. *সহিহ মুসলিমের মুকাদ্দামা* (ইমাম নববির ব্যাখ্যাগ্রন্থসহ), ১/১১৭।

পর আলি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানায় সংঘটিত হয়। সুতরাং ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সিফফিনের দিন আসতে পারেন না। তবে যদি মৃত্যুর পর কেউ কবর থেকে উঠে আবার ফিরে আসতে সক্ষম হয় তবে আলাদা বিষয়।[২৮]

৬. অনুরূপভাবে আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনু ঈসা আত-তালিকানি ইমাম ইবনুল মুবারক রহ.-এর সামনে একটি হাদিস হাজ্জাজ ইবনু দিনারের সূত্রে পেশ করলেন। অতঃপর ইবনু মুবারক রহ. তার তথা হাজ্জাজ থেকে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উল্লেখিত বর্ণনা সত্য নয় এটি ইতিহাসের আলোকে প্রমাণ করেছেন। কেননা হাজ্জাজ একজন তাবে তাবেয়ি ছিলেন। তিনি সরাসরি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কীভাবে বর্ণনা করবেন? অথচ তার ও রাসুলের মাঝে কমপক্ষে দুইজন ব্যক্তির (তাবেয়ির ও সাহাবির) দূরত্ব রয়েছে। এজন্য হাজ্জাজ সিকাহ রাবি হওয়া সত্ত্বেও এবং হাদিসটির প্রাসঙ্গিকতা ঠিক থাকলেও এই সনদে এটি গ্রহণযোগ্য নয়।[২৯]

৭. ইসমাইল ইবনু আইয়াশ রহ. বলেন, আমি ইরাকে ছিলাম। অতঃপর আমার নিকট আহলুল হাদিসরা এলেন, জিজ্ঞেস করলেন, অমুক ব্যক্তি খালেদ ইবনু মাদান থেকে হাদিস বর্ণনা করছে। তাই আমি তার নিকট গিয়ে বললাম, কোন বছরে আপনি খালেদ ইবনু মাদানের কাছ থেকে এসব হাদিস লিখেছেন? তখন সে বলল, ১১৩ হিজরিতে। আমি তাকে বললাম, আপনি কি দাবি করছেন খালেদের মৃত্যুর সাত বছর পর তার কাছ থেকে হাদিস শুনেছেন!? ইসমাইল বলেন, খালেদ ১০৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।[৩০]

৮. এ কারণেই ইমাম হাফস ইবনু গিয়াস রহ. বলেন, যখন কোন রাবির ব্যাপারে অভিযোগ দেখবে তবে তা সময়কাল দিয়ে বিবেচনা করো।[৩১]

৯. ইমাম হাম্মাদ ইবনু যাইদ রহ. বলেন, মিথ্যুক রাবিদের ব্যাপারে জানার ক্ষেত্রে তারিখ অপেক্ষা অন্য কোনো শাস্ত্র অধিক সাহায্য করতে পারেনি।[৩২]

---

[২৮]. *আল-মিনহাজ* (সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যা), নববি, *বাবুল কাশফি আন মাআয়িবুর রুয়াত*, ১/১১৭।

[২৯]. *সহিহ মুসলিমের মুকাদ্দামা* (ইমাম নববির ব্যাখ্যাগ্রন্থসহ), ১/৮৮।

[৩০]. *আল-মাজরুহিন*, ইবনু হিব্বান, ১/৭১; *আল-মাদখাল ইলা কিতাবিল ইকলিল*, হাকেম, পৃ. ৬১-৬২; *আল-জামে*, খতিব বাগদাদি, ক্রমিক নম্বর ১৪৫ (সনদ জাইয়িদ); *মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ*, পৃ. ২১৬।

[৩১]. *আল-কিফায়াহ*, খতিব বাগদাদি, পৃ. ১৯৩; *তারিখে দিমাশক*, ইবনু আসাকির, ১/৫৪ (তার সনদে কোনো সমস্যা নেই।); *মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ*, পৃ. ২১৬; *তাদরিবুর রাবি*, সুয়ুতি, ২/৮৬৬।

১০. ইমাম ইবনুল আসির রহ. বলেন, আমি এমন অনেক বিজ্ঞ ও পাণ্ডিত্যের দাবিদারকে দেখেছি, তারা নিজেদের ইলমের ও রেওয়ায়াতের সাগর মনে করে আবার তারিখশাস্ত্রকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করে! তা থেকে বিরত থাকে এবং উহাকে পরিত্যাগ করে এই ধারণায় যে, তারিখের উপকারিতার সর্বশেষ সীমা হলো স্রেফ কিছু ঘটনা ও সংবাদ। আর কিছু হাদিসও রাতে বলার হালাকা করে বলা যায় এমন কিছু গল্প জানার মাধ্যমেই এর জ্ঞানের পরিসমাপ্তি ঘটে!! তাদের অবস্থা ওই ব্যক্তির মতো যারা শষ্যদানা কিংবা ফলের শুষ্ক খোসা যার ভেতরের নরম ও রসালো অংশ না দেখে ওপরের শুষ্ক খোসা বা ছোলা দেখেই ক্ষান্ত হয় (অর্থাৎ ওপরের শুষ্ক খোসা দেখেই সমালোচনা করে)। তাই যাকে আল্লাহ নিরাপদ মানসিকতা ও রুচি প্রদান করেছেন এবং সিরাতে মুসতাকিমের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন তিনি জানেন, তারিখের অনেক ও বিপুল পরিমাণ দুনিয়া ও আখিরাতকেন্দ্রিক ফায়দা ও উপকারিতা রয়েছে।[৩৩]

১২. ইমাম ইবনু খালদুন রহ. বলেন, নিশ্চয়ই তারিখশাস্ত্র এমন এক শিল্প যা মতবাদ হিসেবে পছন্দসই। যার অনেক ফায়দা ও উপকারিতা রয়েছে। এর পরিধি উত্তম পরিসীমায় পরিসীমিত যা আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের চরিত্র ও নবিদের জীবনচরিত এবং রাজাবাদশাদের রাজত্ব ও রাজ্যসংক্রান্ত ঘটনা বিবৃত করে। যাতে করে সেসব ঘটনা পর্যাপ্ত পর্যায়ের অনুসরণীয় হয় তাদের জন্য, যারা দ্বীন ও দুনিয়ার বিভিন্ন ঘটনা জানতে আগ্রহী।[৩৪]

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যায়, বিভিন্ন শাস্ত্র নির্ণয়ের জন্য ইতিহাস ও তারিখের গুরুত্ব অপরিসীম।

ইতিহাসের বিষয়বস্তু বারবার পুনরাবৃত্তি হয়

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইতিহাসের মহিমা ও বৈশিষ্ট্য বারংবার মানুষের জীবনে ঘুরে-ফিরে আবর্তিত হয়। যাতে করে মানুষ তার দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সচেতন হয়।

১. এ ব্যাপারে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন—

---

[৩২]. *আশ-শামারিখ ফি ইলমিত তারিখ*, সুয়ুতি, ১/১৭-১৮; ইমাম খতিব বাগদাদি ও ইমাম ইবনুল জাওযি হাসসান ইবনু যাইদ থেকে এই বক্তব্য নকল করেন। যদিও এটি হাম্মাদ ইবনু যাইদ হওয়ার কথা। *তারিখে বাগদাদ*, ৭/৩৬৯; *আল-জামে লি আখলাকির রাবি ওয়া আদাবিস সামে*, খতিব, ক্রমিক নম্বর, ১৯; *আল-মাওজুআত*, ইবনুল জাওযি, ১/৪৯। ইমাম ইরাকি ও সাখাবি হাসসান ইবনু ইয়াযিদের সূত্রে এটি বর্ণনা করেন। *শরহুত তাবসিরাহ*, ৩/২৩৪; *ফতহুল মুগিস*, ৪/৩৬৭।

[৩৩]. *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, ইবনুল আসির, ১/১৪।

[৩৪]. *আল-মুকাদ্দিমা*, ইবনু খালদুন (শাইখ ইবনু দারবিশের তাহকিক), ১/৯২।

﴿وَ تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ﴾

এবং এই দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে আবর্তিত করে থাকি (পুনরাবৃত্তি করে থাকি) যাতে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে চিনে নিতে পারেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে শহিদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। [সুরা আলে ইমরান : ১৪০]

২. ইমাম বাইহাকি রহ. বলেন, তুমি এমন কোনো ঘটনা পাবে না যার মতো পূর্বে কোনো ঘটনা ঘটেনি।

৩. ইমাম ইবনুল আসির রহ. বলেন, নিশ্চয়ই এমন কোনো ঘটনা ও বিষয় সংঘটিত হয় না যা হুবহু কিংবা তার দৃষ্টান্ত এর পূর্বে বিগত হয়নি। অতঃপর তাতে আকল ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।[৩৫]

সুতরাং ইতিহাসের এই আবর্তন থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।

ইসলামি ইতিহাস পাঠ ও চর্চার কতিপয় মূলনীতি

ইতিহাসের যেমন অনেক সুবিধাজনক বিষয়াবলি রয়েছে অনুরূপভাবে তার কতিপয় ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। বিশেষ করে ইসলামি মূল্যবোধ ও বিশ্বাস যাতে অক্ষুণ্ন থাকে আর ইতিহাসের চোরাবালিতে যেন হারিয়ে তা বিসর্জন না দিতে হয়।

নিচে কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামি বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন বক্তব্যের আলোকে ইতিহাস পাঠ ও চর্চার কতিপয় মূলনীতি আলোকপাত করা হলো :

১. খালেস নিয়ত রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তা পাঠ ও চর্চা করা।

২. ইতিহাস পাঠ ও চর্চার সময় এর সীমাবদ্ধতা ও পরিসর সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞান রাখতে হবে।

৩. ইতিহাসকে কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের আলেম-ফকিহদের স্বতঃসিদ্ধ রায়ের বিরুদ্ধে মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড় করানো যাবে না।

৪. মুশাজারাতে সাহাবা তথা সাহাবিদের পরস্পরের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধ ও বিবাদমূলক ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের সত্যতা যাচাই-বাছাই করতে হবে, সত্যতার প্রমাণ মিললেও ফকিহ ও সালাফদের তাদের ব্যাপারে অনুসৃত নীতি

---

৩৫. *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, ইবনুল আসির, ১/১০।

অবলম্বন করতে হবে। আগে বেড়ে অনর্থক ও অন্যায় সমালোচনা ও প্রলাপ বকা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৫. মনে রাখতে হবে এটি কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামের বিধিবিধানকে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করতে সহায়ক, কিন্তু চূড়ান্তও নয় আবার শরিয়তের উৎসও নয়।

৬. ইতিহাস আমাদের জীবনের বহু কার্যাদির বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ ও শিক্ষা লাভের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

৭. ইতিহাসের যেসব উপাদান রয়েছে তা স্থান-কাল-পরিস্থিতিভেদে একেক সময় একেক ফলাফল নির্দেশ করে। কখনো তা বিপরীতমুখীও হতে পারে।

৮. মনে রাখতে হবে এটি এমন অভিজ্ঞতা যার ওপর নির্ভর করে কোনো নাজুক পরিস্থিতিতে হুটহাট পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়। প্রয়োজনে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মাঝে বিভিন্ন কলাকৌশল ও নতুন পদ্ধতির সমাবেশ ঘটিয়ে বর্তমানের জন্য উপযোগী করে তুলতে হবে। সেটি হতে পারে রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে, শিল্পোন্নয়নে, নগরায়ণে, বিশ্বায়নে কিংবা জিহাদ ও যুদ্ধক্ষেত্রে।

৯. ইতিহাসের পাতায় উল্লেখিত সকল বিষয়ই সঠিক হওয়া জরুরি নয়। আর এটি সম্ভবও নয়। সকল ঐতিহাসিক এমনকি ইসলামি ঐতিহাসিকগণের ইতিহাসসংক্রান্ত বিভিন্ন কিতাবে অনেক মিথ্যা, বানোয়াট ও অসার গল্প, কিসসা ও কাহিনিও বিদ্যমান রয়েছে। রয়েছে অন্য ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকার কারণে মিথ্যা সাক্ষ্য। এসব ক্ষেত্রে ইসলামি ইতিহাসের ওপর যে-সকল কিতাব আছে তা কোনো ভালো শাস্ত্রজ্ঞানী আলেমের অধীনে পাঠ ও চর্চা করবে। যে আলেম একাধারে ইতিহাসেরও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন আবার ইসলামি মূল্যবোধ ও আকিদা সম্পর্কেও ভালো জ্ঞাত ও সচেতন।

১০. কোনো ফাসেক ও কাফেরের পক্ষ থেকে লিখিত ইতিহাসসংক্রান্ত কিতাবাদি ও তথ্য-উপাত্ত হতে উপকৃত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। একান্ত প্রয়োজন হলে সাধারণ মুসলমান নয় বরং কোনো বিজ্ঞ, নেককার ও ইতিহাস সম্পর্কে ভালো করে পরিজ্ঞাত ব্যক্তির মাধ্যমে সেই চাহিদা পূরণ করতে হবে। নতুবা অন্যদের জন্য এই শাস্ত্রের চোরাবালিতে পতিত হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

১১. উম্মাহর যে আলেমরা তাদের কর্মের কারণে মাকবুল হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে যারা জনসাধারণের সামনে তাদেরকে কলুষিত করতে চায় তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। এই ফিতনা-ফাসাদ অনেক সময়

পাঠক ও চর্চাকারীর মনের অজান্তেই হয়ে যেতে পারে, সে ক্ষেত্রেও বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

১২. ঐতিহাসিকদের তবাকাত তথা স্তর, মর্যাদা, খ্যাতি, গ্রহণযোগ্যতা, নিরপেক্ষতা কিংবা দলান্ধতা, মাজহাব এবং তাদের লেখালেখির ধরন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে তারপর তা সামনে রেখে তাদের কিতাব অধ্যয়ন করতে হবে।

এসব বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে এই জ্ঞানগর্ভ কিতাবটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। যার নামকরণ করা হয়েছে, 'ইতিহাস পাঠ : প্রসঙ্গ কথা' নামে। বইটির প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি দেখেই অনুধাবন করেছিলাম যে, এটি বর্তমান প্রেক্ষাপটের জন্য খুবই উপযোগী ও দরকারি।

তবে এর গ্রহণযোগ্যতা সর্বসাধারণের পাশাপাশি সম্মানিত আলেমদের মাঝেও যাতে ব্যাপৃত হয় সেদিকে লক্ষ রেখে আমার প্রিয় ভাই ইমরান রাইহান-এর অনুরোধ ও আমার সদিচ্ছার সমন্বয় ঘটিয়ে আমার অযোগ্যতা জেনেও আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার পক্ষ থেকে দোজাহানে অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশায় এই মহতী কাজে হাত বুলিয়েছি।

এতকিছুর পরেও মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই এই কিতাবের তালিক, তাহকিক, তাখরিজ ও শরয়ি সম্পাদনার ক্ষেত্রে যা-কিছু সঠিক ও উপকারী বিষয় বিবেচিত হবে তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং যেসব ভুল পাওয়া যাবে তার দায়ভার আমার ও শয়তানের দিকে সম্পৃক্ত হবে!

إن أحسنت فمن الله، وإن أسأت أو أخطأت فمن نفسي، والشيطان.

আহকারুল ইবাদ

আবদুল্লাহ আল মামুন (উফিয়া আনহু)

১৮ রমজান ১৪৪২ হি.

ইতিহাস অধ্যয়ন : প্রাসঙ্গিক কথা

ইতিহাস অধ্যয়নের ধারা ও পদ্ধতি আলোচনার আগে ইতিহাসের সংজ্ঞায়ন জরুরি। ঐতিহাসিকরা ইতিহাসের নানা সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাদের এই সংজ্ঞার মৌলিক কথা একই, শুধু কেউ কথাটি একটু বিস্তৃত আকারে বলেছেন, আবার কেউ এক বাক্যে সেরে দিয়েছেন। প্রথমে প্রাচীন ঐতিহাসিকদের কয়েকটি সংজ্ঞা দেখা যাক। ইবনু খালদুন একজন বিখ্যাত মুসলিম মনীষী। আধুনিক সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাসের জনকদের মধ্যে তাকে অন্যতম বিবেচনা করা হয়। 'কিতাবুল ইবার' তার লিখিত বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ। 'কিতাবুল ইবার'-এর ভূমিকা হিসেবে তিনি আল-মুকাদ্দিমা নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেখানে তিনি ইতিহাসের কিছু গতিপথ, সভ্যতা ও নগররাষ্ট্রের ধারণা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেছেন। তিনিই প্রথম রাজনৈতিক ইতিহাসের বাইরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি ইতিহাসের সংজ্ঞা দিয়েছেন খুবই সহজ ভাষায়। তিনি লিখেছেন, ইতিহাস মূলত অতীতকালের ঘটনাবলি ও রাষ্ট্রসমূহের বিবরণ।[৩৬]

ইবনু খালদুনের মতো আরেকজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা সাখাবি। তিনি একজন মুহাদ্দিস হিসেবেও ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রে উজ্জ্বল আসন দখল করে আছেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানির ছাত্র। আল্লামা সাখাবি ইতিহাসের সংজ্ঞা দিয়েছেন বেশ বিস্তৃত আকারে। তিনি ইতিহাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এর আলোচনার বিষয়গুলোও স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ইতিহাস আলোচনা করে রাজ্যসমূহ নিয়ে, খলিফা ও উজিরদের নিয়ে, যুদ্ধ ও রাজ্যবিজয় নিয়ে। এর বাইরে ইতিহাস আলোচনা করে নবিদের ঘটনাবলি নিয়ে, এবং অতীতের জাতিসমূহের ঘটনাবলি নিয়ে। ইতিহাসের আলোচনায় উঠে আসে মসজিদ, মাদরাসা, সড়ক ও পুল নির্মাণের বিবরণ, বাদ পড়ে না দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসের বিবরণও।[৩৭]

এবার সমকালীন দুয়েকজন ঐতিহাসিকের বক্তব্য শোনা যাক। ডক্টর হুসাইন মুনিস বিংশ শতাব্দীর আরব ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম। আন্দালুসের

---

[৩৬]. *আল-মুকাদ্দিমা*, ১/ ৮১, আবদুর রহমান ইবনে খালদুন, দারু ইয়ারুব।
[৩৭]. *আল-ইলান বিত-তাওবিখ*, ১৮, আল্লামা সাখাবি, মুআসসাতুর রিসালাহ।

ইতিহাস নিয়ে বিস্তৃত কাজ করে গেছেন তিনি। তিনি ইতিহাসের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, ইতিহাস হলো ঘটনাবলির পাঠ মাত্র।[৩৮]

ইতিহাসের প্রচলিত সংজ্ঞার বাইরে গিয়ে সংজ্ঞা দিয়েছেন সাইয়েদ কুতুব। তিনি লিখেছেন, ইতিহাস নিছক ঘটনাবলির বিবরণের নাম নয়। বরং ইতিহাস হলো, এসব ঘটনাবলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের নাম। বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলির মধ্যে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ যোগসূত্র আবিষ্কার করার নামই ইতিহাস।[৩৯]

সাইয়েদ কুতুবের এই সংজ্ঞার সাথে দ্বিমত প্রকাশের সুযোগ আছে। তিনি নিছক ঘটনাবলির বিবরণকে ইতিহাস বলে স্বীকার করতে চান না। যদিও ঘটনাবলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া নিছক ঘটনাবলির বিবরণ পাঠ কখনো ইতিহাসের পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে পারে না, তবু ঘটনাবলির বিবরণকে ইতিহাসের কাঠামো থেকে বের করে দেওয়ার সুযোগ নেই। ইতিহাসের নানা ঘটনাবলির মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হলে ঘটনাপ্রবাহের পরিবর্তন অনুমান করা হয়ে ওঠে কষ্টসাধ্য। ইতিহাসের ঘটনাবলি পারস্পরিক যোগসূত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে কীভাবে ঘটনাপ্রবাহের পটপরিবর্তনের ধারণা পাওয়া যায় এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

সমকালীন আরেকজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের বক্তব্য উপস্থাপন করে আমরা এই অংশের আলোচনা সমাপ্ত করব। আল্লামা আবদুর রহমান আল-জাবারতি হাবশি একজন বিখ্যাত মিশরীয় ঐতিহাসিক। তিনি লিখেছেন, ইতিহাস এমন একটি শাস্ত্র যা বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের অবস্থা, তাদের সংস্কৃতি, অভ্যাস, নির্মাণশিল্প, জন্ম-মৃত্যু ও বংশধারা সম্পর্কে আলোচনা করে।[৪০]

একটু এগিয়ে তিনি ইতিহাসশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন এভাবে, ইতিহাসশাস্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র। এতে রয়েছে সম্মান ও শিক্ষা। এটি পাঠের মাধ্যমে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের অবস্থা যাচাই করতে পারে (অর্থাৎ পূর্ববর্তী লোকদের সাথে নিজের অবস্থা মিলিয়ে নিজের অবস্থা নিরুপণ করতে পারে)। এজন্যই ইমাম শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন, যে ব্যক্তি ইতিহাস জানে, তার জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।[৪১]

---

[৩৮]. *আত-তারিখ ওয়াল মুআররিখুন*, ২৩ , ড. হুসাইন মুনিস, দারুর রাশাদ।
[৩৯]. *ফিত-তারিখি ফিকরাতুন ওয়া মিনহাজুন*, ৩৭ পৃষ্ঠা।
[৪০]. *আজাইবুল আসার ফিত-তারাজিমি ওয়াল-আখবার*, ১/৬।
[৪১]. প্রাগুক্ত, ১/১০।

এক কথায় বলতে গেলে, অতীতের ঘটনাবলির বিবরণকেই ইতিহাস বলে। আল্লামা সাখাবি যেমনটা বলেছেন, ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ ও সময়কাল।[৪২]

ইতিহাস আলোচনা করে অতীতের নানা ঘটনা ও মানুষের জীবনচরিত নিয়ে।

হিজরি সনের সূচনা

ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে হিজরি সনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম ঐতিহাসিকরা ইসলামের ইতিহাস লিখেছেন হিজরি সনের ক্রমধারা অনুযায়ী। ফলে একজন ইতিহাস পাঠক যদি হিজরি সনের সাথে পরিচিত না হন, তাহলে মুসলিম ঐতিহাসিকদের লেখা পড়ে তিনি সময়কাল মেলাতে পারবেন না। তাই হিজরি সনের সূচনা নিয়েও কয়েকটি কথা জানা দরকার। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় আরবি মাসগুলো ছিল। তবে তখন বর্ষ গণনার কোনো পদ্ধতি ছিল না। তখন সাধারণত বড় কোনো ঘটনাকে মানদণ্ড ধরে বছর গণনা করা হতো। যেমন বলা হতো, হস্তির যুদ্ধের এত বছর পর তিনি জন্মেছিলেন। নিয়মতান্ত্রিকভাবে হিজরি সনের প্রবর্তন করেন হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। কীভাবে হিজরি সনের প্রবর্তন হয় তা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বর্ণনা আছে। এমন কয়েকটি বর্ণনা দেখা যাক।

১। আবু মুসা আশআরি রা. একবার হজরত উমর রা.-এর কাছে লিখিত এক পত্রে বলেন, আপনার কাছ থেকে আমার কাছে প্রায়ই পত্র আসে। কিন্তু তাতে কোনো তারিখ ও সন থাকে না। তাই একটি সনের প্রবর্তন করুন। হজরত উমর রা. তখন উপস্থিতদের জিজ্ঞেস করেন, কোনো ঘটনাকে সামনে রেখে আমরা বর্ষ গণনার সূচনা করতে পারি। তখন কেউ বলল, নবিজির জন্মের সময় থেকে, কেউ বলল, নবিজির ইনতিকালের পর থেকে। হজরত উমর রা. বললেন, না, আমরা বরং হিজরতের সময়কাল থেকে বর্ষ গণনা শুরু করব, কারণ এটি ছিল হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। এরপর তখন থেকে হিজরি সনের সূচনা হয়।[৪৩]

২। মাইমুন বিন মেহরান থেকে আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে তিনি বলেন, একবার হজরত উমর রা.-কে একটি চিঠি দেওয়া হয়। সেই চিঠিতে

---

৪২. *আল-ইলান বিত-তাওবিখ*, ১৯

৪৩. *আশ-শামারিখ ফি ইলমিত তারিখ*, ১৪; *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, ১/৯; *ফাতহুল বারি*, ৭/২৬৮, হাদিস ৩৯৩৪; *আল-ইলান বিত-তাওবিখ*, ১৪০-১৪১।

শাবান মাসের কথা ছিল। হজরত উমর রা. জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কোন শাবান মাসের কথা বলা হচ্ছে? যে শাবান মাস এখন চলছে তার কথা, নাকি যেটা চলে গেছে সেটা, নাকি যেটা সামনে আসবে সেটার কথা?

এরপর তিনি সাহাবিদের একত্র করেন। তিনি সবাইকে বলেন, মানুষের জন্য এমন একটি সন নির্ধারণ করুন যা মানুষ মনে রাখতে পারে। কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন, রোমানদের দিনপঞ্জি অনুসারে সাল গণনা করা হোক। হজরত উমর রা. বললেন, প্রথমত, রোমানদের সাল অনেক দীর্ঘ। আর দ্বিতীয়ত, তারা নিজেদের তারিখকে জুলকারনাইনের জন্মদিনের সাথে সম্পৃক্ত করে।

কেউ পরামর্শ দিলেন, পারসিকদের দিনপঞ্জি অনুসারে বর্ষ গণনা করা হোক। হজরত উমর রা. বললেন, তাদের নতুন কোনো সম্রাট এলে আগের সব নিয়ম বাতিল করে দেয়। (অর্থাৎ, তাদের দিনপঞ্জি স্থির কিছু না। ক্ষমতার পালাবদলের সাথে সাথে এটিও বদলে যায়।)

এরপর কথা উঠল, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় কতদিন ছিলেন তা হিসেব করে দেখা হোক। হিসেব করে দেখা গেল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় ১০ বছর ছিলেন। তখন সবাই সিদ্ধান্ত নিলেন, নবিজির হিজরতকে কেন্দ্র করে সন গণনা শুরু হবে।[৪৪]

৩। সাইদ ইবনুল মুসাইয়িবের বর্ণনামতে, হিজরতের সময় থেকে বর্ষ গণনার পরামর্শটি ছিল হজরত আলি রা.-এর। হজরত উমর রা. তার পরামর্শ গ্রহণ করেন। মহররমের ১৬ তারিখ থেকে এটি সূচনা হয়।[৪৫]

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। নবিজির হিজরতের ঘটনা ঘটেছিল রবিউল আওয়াল মাসে। কিন্তু এই মাসকে হিজরি বর্ষের প্রথম মাস হিসেবে গণনা না করে মহররম মাস থেকেই হিজরি বর্ষের সূচনা করা হয়। এর কারণ কী? এর একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রহিমাহুল্লাহ। তিনি লিখেছেন, সাহাবায়ে কেরাম যখন হিজরি বর্ষের সূচনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখন তারা চারটি বিষয়কে সামনে রেখেছিলেন।

---

৪৪. *আশ-শামারিখ*, ১৪; *মাহজুস সাওয়াব*, ১/৩১৬; *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ১/৩৪; *আল-মুনতাযাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল-উমাম*, ৪/২২৭; *তারিখে তাবা*, ২/৩; তাদরিবুর রাবি, ১/২০১; *মাহজুস সাওয়াব ফি মানাকিবি উমর ইবনুল খাত্তাব*, ১/৩১৬।

৪৫. *আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন*, ৩/১৪; ইমাম হাকেম একে সহিহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবি তা সমর্থন করেছেন। *তারিখে তাবারি*, ৩/১৪৪; *তারিখুল ইসলাম* (আহদুল খুলাফা), ১৬৩; *আশ-শামারিখ ফি ইলমিত তারিখ*, ১৪; *কানযুল উম্মাল*, ১০/৩০৯, হাদিস ২৯৫৫২, *মানাকিবে আমিরুল মুমিনিন উমর*, ৬২; *মাহজুস সাওয়াব ফি মানাকিবি উমর ইবনুল খাত্তাব*, ১/৩১৬।

১. নবিজির জন্ম

২. ওহিপ্রাপ্তির দিন

৩. হিজরত

৪. নবিজির মৃত্যু

দেখা গেল নবিজির জন্মতারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। নির্দিষ্ট কোনো তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অপরদিকে মৃত্যুদিবসকে মানদণ্ড করলে তা মুসলমানদের দুঃখ, কষ্ট বাড়িয়ে দেবে। এদিক থেকে হিজরতের ঘটনাকেই মানদণ্ড ধরে নেওয়ার পক্ষে মত এলো। মহররম মাসকে হিজরি বর্ষের প্রথম মাস ধরা হলো, কারণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন মহররম মাসেই। এজন্য হজরত উমর রা. মহররম মাস দিয়েই বর্ষ গণনা শুরু করাকে ভালো মনে করলেন। তিনি বলেছিলেন, ইসলামি সন গণনার ক্ষেত্রে এই মাসকে দিয়ে শুরু করাই আমি ভালো মনে করি।[৪৬]

সবগুলো বর্ণনা সামনে রাখলে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, হিজরি সন প্রবর্তনের সময় হজরত উমর রা. একা কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। তিনি সাহাবায়ে কেরামকেও সাথে রেখেছিলেন। তাদের পরামর্শ নিয়েছিলেন। এ থেকে ইসলামে হিজরি সনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝে আসে। তখন কেই-বা ভেবেছিল একদিন উম্মাহ হিজরি সনকে ভুলে যাবে। হিজরি সন হয়ে উঠবে তাদের কাছে অপরিচিত। যতদিন খিলাফাহ ছিল মুসলিম উম্মাহর সকল কাজকর্ম পরিচালিত হয়েছিল হিজরি সন অনুসারে। রাষ্ট্রীয় যত নথিপত্র লেখা হতো সবকিছুই হিজরি সন দিয়ে লেখা হতো। আমরা যদি ভারতবর্ষের মুসলিম শাসনামলের দিকে তাকাই, এবং এখানকার ঐতিহাসিকদের লেখা পড়ি, তাহলে দেখব তারাও ঘটনাপঞ্জি লিখতেন হিজরি সন অনুসারেই।

খিলাফত পতনের পর যখন ইউরোপিয়ান শক্তি নানা অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে তখন তারা তাদের স্বার্থে খ্রিষ্টীয় সনের সূচনা করে। সকল কাজকর্ম এই সন অনুসারে পরিচালিত হতে থাকে। ধীরে ধীরে উম্মাহ হিজরি সনকে ভুলে যায়। খ্রিষ্টীয় সনে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যে হিজরি সনের ব্যাপারে সকল সাহাবি একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যে হিজরি সন মেনে সালাফে সালেহিন তাদের জীবন পরিচালনা করতেন, সে হিজরি সনকে আজ উম্মাহ ভুলে গেছে এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আর কী হতে পারে। মুসলিম সমাজের

---

৪৬. *ফাতহুল বারি*, ৮/২৬৮।

খুব কম মানুষই আজ হিজরি সন মনে রাখে। অনেকের অবস্থা তো এতই করুণ, এখন হিজরি কত শতাব্দী চলছে তাও তাদের অজানা। হিজরি সনের মাসগুলো আজ মুসলমানদের সন্তানদের কাছে অপরিচিত। শাবান, রমজান, মহররম, রবিউল আওয়াল এমন কয়েকটি মাস তাদের কিছুটা পরিচিত হলেও অন্য মাসগুলো তাদের অপরিচিত। এমনকি অনেকে এই মাসগুলোর নামও জানে না। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হিজরি সন আমাদের পরিচয়, আমাদের গর্বের বিষয়। যত দ্রুত আমরা হিজরি সনের সাথে আমাদের সম্পর্ক গভীর করতে পারব, ততই ভালো।

* * *

ইতিহাস পড়ব কেন?

প্রশ্নটা খুবই যৌক্তিক। ইতিহাস মানে অতীতের গল্প। হারিয়ে যাওয়া সময়ের বিবরণ। যে সময় চলে গেছে তা তো গেছেই, তা নিয়ে পড়াশোনা করে বা লেখালেখি করে লাভটা কী আসলে? আমাদের তো উচিত বর্তমান নিয়ে ভাবা। ভবিষ্যতের কর্মপন্থা কী হবে তা ঠিক করা। পড়ার মতো আরও কত বিষয়ই তো আছে, ইতিহাস পড়ব কেন?

ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী তা একটু খুলে বলা যাক। যেকোনো বিষয়ের দুধরনের প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। একটি দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকে, অন্যটি পার্থিব জরুরতের দৃষ্টিকোণ থেকে। ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তার দিকটি শুরুতে আমরা দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকে খতিয়ে দেখব।

প্রয়োজনীয়তা : ১

আল্লাহর স্বাভাবিক রীতি বুঝতে পারা

কুরআন কারিমে আমরা দেখি অতীতের অনেক ঘটনাই বিবৃত হয়েছে। এখানে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম ও বনি ইসরাইলের ঘটনাবলি এসেছে, হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের ঘটনা এসেছে, আসহাবে কাহাফের ঘটনা এসেছে, হুদ আলাইহিস সালাম ও সালিহ আলাইহিস সালামের ঘটনা এসেছে, অন্যান্য নবিদের ঘটনাও এসেছে। এই যে অতীতের ঘটনাগুলো এসেছে এগুলো তো ইতিহাসের অংশই। কুরআনের আয়াতগুলো নানা ধরনের। এখানে কিছু আয়াত আছে সরাসরি বিধান নিয়ে এসেছে, কিছু আয়াতে আল্লাহ বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তার তাওহিদের বিষয়টি বান্দাদের সামনে স্পষ্ট করেছেন। আবার কিছু আয়াতে অতীতের ঘটনাগুলো তুলে ধরেছেন। যে আয়াতে অতীতের ঘটনাগুলো তুলে ধরা হয়েছে, এর উদ্দেশ্য কী? বা এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের কী শিক্ষা দিতে চেয়েছেন তা একটি আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে।

সুরা ইউসুফে আল্লাহ তাআলা হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা বিবৃত করেছেন। তার জীবনের নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। এই সুরার শেষ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

তাদের কাহিনিতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোনো মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ রহমত ও হেদায়েত। [সুরা ইউসুফ : ১১১]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদেরকে জানাচ্ছেন, ইউসুফ আলাইহিস সালামের এই ঘটনায় বান্দাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। ইউসুফ আলাইহিস সালামের এই ঘটনায় আমাদের জন্য কী শিক্ষা আছে? বিখ্যাত মুফাসসির ও ঐতিহাসিক ইবনু জারির তাবারি তার লেখা ‘তাফসিরে তাবারি’-তে লিখেছেন, আল্লাহ প্রথমে ইউসুফ আলাইহিস সালামের জীবনকাহিনি বলেছেন। ভাইয়েরা তাকে কুয়োতে ফেলে দেয়, এরপর তিনি বিক্রি হন মিশরের বাজারে। তারপর দীর্ঘসময় পর তাকে রাজত্ব দান করেন। তার ভাইদের ওপর তাকে প্রাধান্য বিস্তার করতে দেন। এরপর আল্লাহ মক্কার কুরাইশদের লক্ষ করে বলছেন, হে মক্কার কুরাইশরা, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনা থেকে শিক্ষা নাও। যিনি ইউসুফের সাথে এমনটা করতে পেরেছেন তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেও এমনটা করতে পারেন। তিনি তোমাদের মাঝ থেকে তাকে সরিয়ে নেবেন, তারপর তোমাদের ওপর তিনি প্রাধান্য বিস্তার করবেন, জমিনের কর্তৃত্ব চলে যাবে তার কাছে। তাকে সাহায্য করবেন সামরিক শক্তি ও লোকবল দিয়ে।[৪৭]

ইবনু জারির তাবারি সুন্দর করে ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিয়েছেন। ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনাটি আল্লাহ শুধু গল্প বলার জন্য বর্ণনা করেননি। এখানে তিনি আমাদের জন্য শিক্ষা রেখেছেন। একজন মুমিনের জীবনেও নানা উত্থান-পতন আসবে। দুঃখ, কষ্ট-ক্লেদ তাকে স্পর্শ করবে। নিজের জীবনটাও তার কাছে কঠিন মনে হবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে আশা হারালে চলবে না। তাকে আশা রাখতে হবে আল্লাহ তাআলার ওপর। সে তখন মনে করবে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা। সে দেখবে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জীবনে নানা বাঁক এসেছে। ভাইয়েরা শত্রুতা করে তাকে কূপে ফেলে দিয়েছে। সেখান থেকে আল্লাহ তাকে মুক্তি দিয়ে মিশরের দাসবাজারে পৌঁছে

---

[৪৭]. *তাফসিরুত তাবারি*, ১৬/৩১৩।

দেন। তারপর তার জীবনে আসে আবার এক ঝড়। তার নামে অপবাদ দেওয়া হয়। তাকে পাঠানো হয় কারাগারে। এরপর আল্লাহ তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে মিশরের ক্ষমতায় বসিয়ে দেন। তার ভাইয়েরাও তার সামনে সিজদায় অবনত হয়।

একজন মুমিন এই ঘটনা মনে করবে আর আশায় বুক বাঁধবে। তার বারবার মনে হবে, তার জীবনে যে কঠিন সময় এসেছে তা শীঘ্রই হারিয়ে যাবে। যে রাব্বুল আলামিন হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সকল কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছেন তিনি চাইলে তাকেও এসব সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারেন। এভাবে সে হৃদয়ে লাভ করবে প্রশান্তি। তার দুঃখ-দুশ্চিন্তার ভার লাঘব হবে, সে আবার আশায় বুক বাঁধবে। তার মনে পড়বে সুরা ইউসুফে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা বিবৃত করার পর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾

> এমনইভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশের বুকে প্রতিষ্ঠা দান করেছি। সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত। আমি স্বীয় রহমত যাকে ইচ্ছা পৌঁছে দিই এবং আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। [সুরা ইউসুফ : ৫৬]

এই আয়াতটি তাকে আশা জোগাবে। অন্ধকার পথের শেষ সীমানায় সে দেখবে আলো এগিয়ে আসছে।

এভাবে ইউসুফ আলাইহিস সালামের জীবনের ঘটনার মাঝে মুমিনদের জন্য লুকিয়ে রয়েছে অনেক বড় শিক্ষা।

কুরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা জালেমদের বিভিন্ন ঘটনাবলি উল্লেখ করেছেন। তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার বিবরণ দিয়েছেন। এরপর বলেছেন—

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنتُمْ

فِيْ مَسَاكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ﴿

অত্যাচারীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহকে কখনো উদাসীন মনে করো না। তবে তিনি তাদের শুধু একটি নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন, যেদিন চক্ষুগুলো বিস্ফারিত হবে, তারা মাথা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠিপড়ি করে দৌড়াতে থাকবে, তাদের চোখ তাদের নিজেদের দিকে ফিরবে না, এবং তাদের হৃদয়গুলো দিশেহারা হয়ে যাবে। মানুষকে আজাব সমাগত হওয়ার দিন সম্পর্ক সাবধান করে দাও, যেদিন তাদের কাছে আজাব আসবে, সেদিন অত্যাচারীরা বলবে, হে আমাদের প্রভু! অল্প সময়ের জন্য আমাদের অবকাশ দিন, তাহলে আমরা আপনার ডাকে সাড়া দেবো (অন্যের ওপর অত্যাচার করব না) এবং রাসুলদের অনুসরণ করব। তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেয়ে বলতে না যে তোমাদের পতন নেই! যারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছে, তোমরা তো তাদের বাসস্থানেই বাস করছ এবং সেসব অত্যাচারীদের সঙ্গে আমি কেমন আচরণ করেছি, তা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। উপরন্তু আমি তোমাদের জন্য বহু উদাহরণ দিয়েছি।

[সুরা ইবরাহিম : ৪২-৪৫]

এই আয়াতের শেষ অংশে দেখুন আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের উদ্দেশে বলছেন, তিনি অত্যাচারীদের সাথে কেমন আচরণ করেন তার উদাহরণ দিয়েছেন। এ আয়াতের শিক্ষা কী? শিক্ষা হলো আল্লাহ যুগে যুগে জালেমদের কেমন শাস্তি দেন তা বান্দাদের জানা হলো। ফলে একজন বান্দা নিজে জুলুম করা থেকে বেঁচে থাকবে, অপরদিকে সে জালিমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। অপরদিকে কখনো কখনো জালিমের অত্যাচার সীমা ছাড়াবে, এই নির্যাতন ও জুলুমে সে অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। তখন এই আয়াতগুলো তাকে সান্ত্বনা জোগাবে। তার মনে পড়বে আল্লাহ তো জালেমকে কখনো ছাড় দেন না। তিনি তাকে পাকড়াও করেন। অতীতে বারবার করেছেন। এখনো করবেন। এটা আল্লাহর স্বাভাবিক নিয়ম। ফলে সেই মুমিন আশার আলো দেখবে। সে বুঝবে জালিমের এই দাপট চিরস্থায়ী কিছু নয়। শীঘ্রই তার পতন হতে চলেছে। সে নিজেই নিজের পতনের দিন টেনে আনছে।

দেখুন, সুরা ফিলে আল্লাহ তাআলা আবরাহার হস্তীবাহিনীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এই সুরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন—

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾

আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কীরূপ ব্যবহার করেছেন? [সুরা ফিল : ১]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হস্তীবাহিনীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। প্রশ্নের সুরে তাদের করুণ পরিণতি জানাচ্ছেন। এভাবে তিনি স্পষ্ট করে দিচ্ছেন অত্যাচারী ও জালেমদের শাস্তি তিনি কীভাবে দিয়ে থাকেন। আধুনিক সময়ের জালেমদের দেখে একজন মুমিনের অন্তর অনেক সময় কেঁপে উঠবে। জালেমদের বিপুল শক্তি, ঐশ্বর্য দেখে তার মনে অনেক সময় সংশয় দানা বাঁধবে। তার মনে হবে জালেমদের ক্ষয় নেই, বিনাশ নেই। তখন তাকে সান্ত্বনা জোগাবে এই আয়াত। এই আয়াত তাকে মনে করিয়ে দেবে আবরাহার হস্তীবাহিনীর সাথে আল্লাহ তাআলা কী ব্যবহার করেছেন। সে মনে মনে হিসাব মিলাবে। সে নিজের বিশ্বাসের গভীরতা অনুভব করবে। সে অন্তরের অন্তস্তল থেকে অনুভব করবে বর্তমান সময়ের এই জালেমদের ক্ষমতার দাপট স্থায়ী কিছু নয়। শীঘ্রই তারা পতনের দিকে এগিয়ে যাবে।

জুনাইদ বাগদাদি রহিমাহুল্লাহ একদিন তার মজলিসে বললেন, ঘটনাবলি হলো আল্লাহর সৈনিক। এর মাধ্যমে আল্লাহ তার বন্ধুদের অন্তরকে দৃঢ় করেন। কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, আপনার এই কথার পক্ষে দলিল কী? জুনাইদ বাগদাদি রহিমাহুল্লাহ বললেন, আমার কথার পক্ষে দলিল হলো কুরআনের এই আয়াত—

﴿وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

আর আমি রাসুলগণের সব বৃত্তান্তই তোমাকে বলছি, যদ্দ্বারা তোমার অন্তরকে মজবুত করছি। আর এভাবে তোমার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য নসিহত ও স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে।[৪৮] [সুরা হুদ : ১২০]

এই আলাপের খোলাসা করা যাক। কুরআনে আল্লাহ নানা জাতির ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। তাদের ঘটনাবলির বিবরণ দিয়েছেন। এসব থেকে আমাদের অর্জন কী?

[৪৮]. *রিসালাতুল মুসতারশিদিন*, ১২।

এসব ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করে আমরা আল্লাহর স্বাভাবিক রীতি বা সুন্নাতুল্লাহ সম্পর্কে জানতে পারব। আমরা সহজেই বুঝতে পারব আল্লাহ তার বন্ধু মুমিনদের সাথে কেমন আচরণ করেন। কীভাবে তাদের প্রতিদান দেন। অপরদিকে এটিও দেখব যুগে যুগে আল্লাহ কাফেরদের কীভাবে লাঞ্ছিত করেন, কীভাবে তাদের পাওনা তাদেরকে বুঝিয়ে দেন। একজন মুমিন যখন বিপদে পড়বেন, তিনি দেখবেন তার সমাজের লোকেরা তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে, পাগল বলছে, ব্যাকডেটেড বলছে, মধ্যযুগীয় বর্বর বলছে, তখন তিনি ভেঙে পড়বেন না। তার মনে পড়বে নবিদের ইতিহাস। তিনি ভাববেন, তাওহিদের এই পথ ফুল বিছানো পথ নয়। এ পথে হাঁটতে হলে কাঁটার আঘাত পেতেই হবে। যুগে যুগে নবি-রাসুলগণ তাদের স্বজাতির হাতে নির্যাতিত হয়েছেন, তাদেরকেও পাগল বলা হয়েছে, অত্যাচার করা হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে। একজন মুমিন বুঝতে পারবেন, তিনি একা এই পথের বাসিন্দা নন, যুগে যুগে হকপন্থিদের এমন নির্যাতন সয়েই আসতে হয়েছে। এই বিষয়টি অনুধাবনের জন্যই ইতিহাস জানা থাকা প্রয়োজন।

পুরো আলাপ থেকে আমরা স্পষ্ট করতে চেয়েছি, ইতিহাস পাঠের প্রথম প্রয়োজনীয়তা হলো, আল্লাহর স্বাভাবিক নেজাম বা রীতি বুঝতে পারা।

মামলুক সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স এই কথাকেই এভাবে বলেছেন, ইতিহাস শ্রবণ করা অভিজ্ঞতার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।[৪৯]

প্রয়োজনীয়তা : ২

দাওয়াহর ক্ষেত্রে ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা

ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগক্ষেত্র হলো, দাওয়াহর বিস্তৃত ময়দান। প্রতিটি মুসলমান একেকজন দায়ি। জীবনের বাঁকে বাঁকে তিনি যখনই সময় পাবেন ইসলামের দাওয়াত প্রচার করবেন, তাওহিদের বাণী ছড়িয়ে দেবেন। এই দাওয়াতের কাজ করতে তার যে-ক'টি জিনিসের প্রয়োজন হবে তার মধ্যে একটি হলো ইতিহাস।

ইতিহাস এক বিস্তৃত মহাসমুদ্র। এখানে আছে নানা জাতি ও সভ্যতার উত্থান-পতনের গল্প, আছে সম্রাট ও জ্ঞানীদের জীবনকাহিনি, আছে সেনাপতিদের রণসংগ্রাম। একজন অমুসলিমের কাছে কিংবা দ্বীন সম্পর্কে গাফেল একজন মুসলিমের কাছেও আমরা যখন দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যাব, তখন ইতিহাস আমাদের কাজে আসবে।

---

৪৯. *আন-নুজুমুয যাহিরা*, ৭/১৮২।

ধরুন, আমরা দাওয়াত নিয়ে গেলাম এমন একজন মুসলিমের কাছে, যিনি সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় গড়ে উঠেছেন। তিনি আধুনিক নানা মতবাদ দ্বারা আকৃষ্ট। তিনি মনে করেন মানবরচিত নানা মতবাদেই রয়েছে কল্যাণ। তিনি খিলাফতব্যবস্থাকে সেকেলে মনে করেন। তিনি মনে করেন এটি একটি বর্বর শাসনব্যবস্থা। এখন তার এই ভুল ধারণা ভাঙতে হলে আমাদেরকে দুই দিক থেকে আলোচনা করতে হবে।

প্রথমে, আমরা তার সাথে আলোচনা করব খিলাফতব্যবস্থার কাঠামো নিয়ে। তার সামনে তুলে ধরব শরিয়াহভিত্তিক শাসনব্যবস্থার অবকাঠামো ও আইনের ধারাগুলো। শরিয়াহ আইন কীভাবে মানুষের জীবনকে সুন্দর ও প্রশান্ত করে তোলে তা আলোচনা করব।

দ্বিতীয় ধাপে আমরা তাকে দেখাব, শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার এই কাঠামো কল্পিত কোনো অবাস্তব মডেল নয়। এটি বাস্তবেও রূপদান করা সম্ভব হয়েছিল। এক সহস্রাব্দের বেশি সময় ধরে এই মডেলেই মুসলিমরা তাদের রাজ্যশাসন করেছে। এবার আমরা তার সামনে খেলাফতের ইতিহাস তুলে ধরব। ইতিহাসগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা করব মুসলমানদের ইতিহাসে বিচারব্যবস্থা কেমন ছিল, মুসলিম কাজিরা কীভাবে কোনো পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বিচারকাজ পরিচালনা করতেন। খিলাফতব্যবস্থা কীভাবে মুসলমানদের শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চাকে সুগম করেছিল। এই শাসনব্যবস্থায় মুসলমানদের সামাজিক জীবন কতটা সুন্দর ছিল। দুদিক থেকে যখন এই আলোচনা করা হবে তখন একজন শ্রোতা বুঝতে পারবে, মানবমুক্তির জন্য শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কোনো বিধান বা তন্ত্রমন্ত্র কার্যকর নয়। শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার মডেলটিও কল্পিত কিছু নয়। মুসলিমরা সফলভাবে এটি বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছিল।

কখনো কোনো অমুসলিমের সাথেও হয়তো আমাদেরকে খিলাফতব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। প্রথমে আমরা তকে বলব, ইসলামি রাষ্ট্রে শরিয়াহ অমুসলিমদেরকে কী কী সুযোগ দেয়। এরপর আমরা তাকে দেখাব শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার যুগে অমুসলিম জিম্মিদের মুসলিমরা কীভাবে নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল। অমুসলিমরা তাদের শাসনাধীন এলাকায় নির্যাতিত থাকলেও মুসলমানদের শাসনামলে কীভাবে তারা জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

ইসলামি খিলাফতের কাঠামোটি কারও সামনে স্পষ্ট করতে হলে এর তাত্ত্বিক দিকগুলোর পাশাপাশি প্রায়োগিক দিকটিও ইতিহাসের মাধ্যমে স্পষ্ট করলে আমাদের বক্তব্য অন্যদের বোঝানো সহজ হবে।

আমাদেরকে কথা বলতে হবে গাফেল মুসলমানদের সাথে। উম্মাহর এই ক্রান্তিকালে যারা অসচেতন, পার্থিব বিলাসিতা নিয়ে যারা ব্যস্ত। সামান্য বিনোদন যাদের আনন্দের মাধ্যম। তাদেরকে আমরা শোনাব উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কথা। তারা কীভাবে উম্মাহর জন্য নিজের জীবন কুরবান করেছেন সে গল্প শুনিয়ে চেতনা জাগাব তাদের। তাদেরকে শোনাব মহান সেনাপতি ইমাদুদ্দিন জেংগির কথা, যিনি বলতেন, রেশমকোমল বিছানা ও সুরের মূর্ছনার চেয়ে ঘোড়ার পিঠ আর তরবারির শব্দ আমার অতিপ্রিয়।

তাদেরকে শোনাব আটলান্টিকের তীরে দাঁড়িয়ে উকবা বিন নাফের সেই আকুতিভরা কণ্ঠ, যদি সাগর বাধা না হতো, তাহলে আমি আরও সামনে এগিয়ে যেতাম এবং আল্লহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতাম।[৫০]

ইতিহাসের পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকা পূর্বসূরিদের কীর্তিগাথা শুনে তাদের গাফলতের ঘুম ভাঙবে, উম্মাহ আবার জেগে উঠবে।

এটি হলো ইতিহাসের দ্বিতীয় প্রয়োজনীয়তা, দাওয়াহর ময়দানে এর প্রয়োগ করা।

---

৫০. এক বর্ণনায় রয়েছে—

اللَّهُمَّ لو كنت أعلم أن وراء هذا البحر أرضا لخضته إليها في سبيلك.

হে আল্লাহ! যদি জানতাম এই সমুদ্রের পেছনে জমিন রয়েছে তবে আমি তোমার রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য এ পথ অতিক্রম করতাম।

অন্যত্র রয়েছে—

يا ربِّ لولا هذا البحرُ لمضيتُ في البلاد مُجاهدًا في سبيلك، أنشر دينكَ المبينَ، رافعًا راية الإسلام فوقَ كل مكانٍ حصينٍ، استعصى على جبابرة الأقدمين

হে আমার রব! যদি না এ সমুদ্র থাকত তবে আমি ওই দেশে তোমার রাস্তায় মুজাহিদের বেশে পাড়ি দিতাম, তোমার সুস্পষ্ট দ্বীনকে ছড়িয়ে দিতাম, ইসলামের পতাকা সর্বোচ্চ স্থানে সমুন্নত করতাম এবং অহংকারী রাজাবাদশাদের পরাভূত করে গোলামির জিঞ্জির পড়াতাম! *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, ৩/৪২-৪৩; *কদাতু ফাতহিল মাগরিবিল আরাবি*, ১১০-১১১; *সালাহুল উম্মাহ ফি উলুয়িল হিম্মাহ*, ৪/৩৯।

আরেকটি বর্ণনায় আছে ,

ثم قال اللَّهُمَّ اشهد إني قد بلغت المجهود ولولا هذا البحر لمضيت مجاهدا في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد دونك.

হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো যে, আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। যদি (আজ) এই সমুদ্র না থাকত তবে আমি ওই দেশে মুজাহিদ বেশে পাড়ি জমাতাম এবং যারা তোমার সাথে কুফরি করেছে তারা যতক্ষণ পর্যন্ত না একমাত্র তোমাকে ছাড়া আর কারও ইবাদাত না করবে ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকতাম। *রিয়াদুন নুফুস*, ১/২৫; *আল-আরাব ওয়াল-ইসলাম*, ১৪০।

প্রয়োজনীয়তা : ৩

সমৃদ্ধ আগামী নির্মাণের হাতিয়ার

ইতিহাস পাঠের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য হলো অতীতের ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করে তা থেকে শিক্ষা নেওয়া। অতীতের ভুল চিহ্নিত করা। কী কী কারণে একটি জাতির পতন হয়েছিল, তাদের সামগ্রিক অবনতি হয়েছিল তা যদি চিহ্নিত করা যায় তাহলে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ সহজ হবে। ইতিহাস বাহ্যত অতীতের বিবরণ, কিন্তু এটি জড়িয়ে আছে আমাদের ভবিষ্যতের সাথে। আমাদের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে হলে ইতিহাস আমাদেরকে পাঠ করতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে। তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার জায়গাগুলো চিহ্নিত করতে হবে।

একটা সহজ উদাহরণ দিই। ইতিহাস বলে, অতীতে কাফেররা যখনই সুযোগ পেয়েছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে। তারা কখনো মুসলমানদের বন্ধু ছিল না। কখনো কখনো তারা চাপে পড়ে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করলেও সুযোগ পাওয়া মাত্র তা উলটে দিয়েছে। স্বয়ং কুরআন তাদের এই চরিত্রের কথা আমাদের সামনে স্পষ্ট করেছে এভাবে—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

> হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। [সুরা মায়েদা : ৫১]

এই আয়াতে কুরআন স্পষ্ট বলেছে, কাফেররা কখনো মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না। বরং তারা নিজেদের বন্ধু। ইসলামের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা ঐক্যবদ্ধ থাকে। বহুজাতিক বাহিনী গঠন করে। তখন তারা নিজেদের পারস্পরিক বিভেদ ভুলে ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। ইতিহাস পাঠে কাফেরদের এই চরিত্র আমাদের সামনে আরও স্পষ্ট হয়। ক্রুসেডের ইতিহাস পড়লে আমরা দেখব ইউরোপের দেশগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে কীভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফিলিস্তিনের দিকে তেড়ে এসেছিল। এ সময় তারা নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান সকল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব একপাশে রেখে দিয়েছিল। আবার ক্রুসেডাররা যখন মুসলিমভূমিতে প্রবেশ করেছিল তখন

ইসলামের সীমানায় বসবাসকারী খ্রিষ্টানরা তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল। তারা যখনই পেরেছে ক্রুসেডারদের সাথে হাত মিলিয়ে স্থানীয় মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে।[৫১] ৪৯০ হিজরিতে ক্রুসেডাররা যখন এন্টিয়ক অবরোধ করে তখন শহরের ভেতরে থাকা অর্থোডক্স ও আর্মেনিয়ান সেনারা ক্রুসেডারদের কাছে মুসলমানদের যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করে।[৫২] এই খ্রিষ্টানরা যুগের পর যুগ ইসলামি ভূখণ্ডে শান্তি স্বস্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করেছিল। তারা এখানে এমনসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছিল যা ইউরোপের খ্রিষ্টান প্রজারাও ভোগ করতে পারেনি। কিন্তু যখনই তারা সুযোগ পেয়েছে ইসলামি ভূখণ্ডকে আঘাত করেছে, মুসলমানদের নির্যাতন করেছে। ভিনদেশ থেকে আসা স্বজাতির সাথে এত দ্রুত তারা নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে যা বিস্ময়কর। কুরআন এই বিষয়েই মুসলমানদের সতর্ক করেছে। কিন্তু কেন এই খ্রিষ্টানরা যুগের পর যুগ ইসলামি রাজ্যের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেও ক্রুসেডারদের সাথে হাত মেলাতে দ্বিধা করেনি, তাদের সেই মনস্তত্ত্ব কুরআন বহু আগেই আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে এভাবে—

﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾

ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা কখনোই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, তাই হলো সরল পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্ক্ষাসমূহের অনুসরণ করেন, ওই জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই। [সুরা বাকারা : ১২০]

মুসলিমবিশ্বে তাতারদের হামলার ঘটনাবলি যদি বিশ্লেষণ করে পড়া হয় তাহলেও দেখা যাবে ক্রুসেডার খ্রিষ্টানরা তাতারদের সাহায্য করেছে। মামলুক সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স যখন তাতারদের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন তখন ক্রুসেডাররা তাতারদের সাথে ঐক্য করে ফেলে। তাদের সাথে হাত মিলায়

---

[৫১]. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পড়ুন ঐতিহাসিক আবু শামাহ রচিত 'আর-রওযাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন'।

[৫২]. *কিসসাতুল হুরুবিস সলিবিয়্যা*, ১০৫-১২০।

সিরিয়ার এসাসিনরাও। ফলে মামলুক সুলতানকে একই সময় তিনটি শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছিল। অথচ তাতার, ক্রুসেডার ও এসাসিনদের ধর্মবিশ্বাসে বহু তফাত ছিল। তবু তাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল। এই বিষয়টিই কুরআন আমাদেরকে সতর্ক করেছিল এই বলে যে, তারা একে অপরের বন্ধু।

ইতিহাসের এই ঘটনাবলি আমাদেরকে কী বার্তা দেয়? বার্তা স্পষ্ট, কাফেররা কখনো ইসলাম ও মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না। তারা কখনো ইসলামের সমৃদ্ধি ও উন্নতি সহ্য করবে না। এটাই সাধারণ নিয়ম। কুরআন আমাদেরকে এই বিষয়ে জানিয়েছে, ইতিহাস এই কথার সত্যায়ন করেছে। ফলে আমাদেরকেও সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। কোনোভাবেই ভুল করা যাবে না শত্রু চিনতে। কাফেরদের কোনোভাবেই নিজেদের বন্ধু মনে করা যাবে না। যদি ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা নেওয়া যায়, তাহলে আগামী হবে মসৃণ ও নিরুপদ্রব। আর যদি শত্রু চিনতে আমরা ভুল করি তাহলে আমাদেরকে দিতে হবে চরম মাশুল।

আরেকটি উদাহরণ দেখা যাক। ইতিহাস থেকে আমরা দেখি মুসলমানরা যখন নিজেদের মধ্যে কলহ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তখন কুফফাররা তাদের ওপর চড়াও হয়, সহজে তাদের ওপর জয়ী হয়। তাতার হামলার প্রেক্ষাপটটিই চিন্তা করা যাক। ৬১৬ হিজরিতে চেংগিস খান খাওয়ারেজম সাম্রাজ্যে আক্রমণ করে।[৫৩] পরবর্তী ৫০ বছরের মধ্যে তারা মধ্য এশিয়া থেকে বাগদাদ পর্যন্ত পুরো এলাকা দখল করে ফেলে। এমনকি তাদের হাতে পতন হয় আব্বাসি খিলাফাহর। তাতার হামলার প্রেক্ষাপটটা একটু চিন্তা করা যাক। তাতারদের হামলার আগে কেমন ছিল মুসলিমবিশ্বের সার্বিক অবস্থা। ইতিহাসগ্রন্থ পাঠে আমরা দেখি মুসলিমবিশ্বের সার্বিক অবস্থা ছিল তখন খুবই নাজুক। মুসলিম শাসকরা ব্যস্ত ছিলেন নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে। এ সময়ই মিশর ও সিরিয়া শাসন করছিলেন সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির বংশধররা। নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে তারা একে অপরের রক্ত ঝরাচ্ছিলেন। এমনকি তাদের এক পক্ষ এ সময় ক্রুসেডারদের সাথে হাত মিলিয়ে বাইতুল মাকদিস ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দেয়। শর্ত ছিল অন্যপক্ষের বিরুদ্ধে চলমান লড়াইয়ে ক্রুসেডাররা তাদের সাহায্য করবে।[৫৪] মুসলিমবিশ্বের অপর শক্তিশালী দুটি পক্ষ খাওয়ারেজম সাম্রাজ্য ও আব্বাসি খিলাফাহও ব্যস্ত ছিল পারস্পরিক লড়াইয়ে। ৬১৭ হিজরিতে সুলতান আলাউদ্দিন খাওয়ারেজম শাহ বিশাল বাহিনী নিয়ে

---

৫৩. *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, ৯/৩৩২; *দাওলাতুল মুঘল ওয়াত-তাতার*, ১৯৫-১৯৭।

৫৪. *আন-নুজুমুয যাহিরা*, ৮ম ও ৯ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

রওনা হন বাগদাদের দিকে। তার উদ্দেশ্য ছিল আব্বাসি খিলাফতের পতন ঘটিয়ে নতুন খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করা। সে বছর তীব্র তুষারপাতের[৫৫] ফলে সুলতানের সেনাবাহিনীকে ভোগান্তিতে পড়তে হয়। পথিমধ্যে তার অনেক সেনা নিহত হয়, ফলে তিনি ফিরে আসেন। অপরদিকে আব্বাসি খলিফা নাসির এই অপমান ভুলতে না পেরে চেংগিস খানকে পত্র লিখে আহ্বান জানান তিনি যেন খাওয়ারেজম সাম্রাজ্যে আক্রমণ করেন।[৫৬]

দেখা যাচ্ছে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে বিভেদে ব্যস্ত ছিল এবং একে অপরের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কাফেরদের সাথে হাত মিলাচ্ছিল। তাদের এই হাত মেলানোর কারণে কাফেরদের কাজ সহজ হয়ে যায়। বিনা বাধায় বা স্বল্প বাধায় তারা একের পর এক মুসলিম এলাকা দখল করতে থাকে। এক এলাকার মুসলমানদের সাহায্যে অন্য এলাকার মুসলমানরা এগিয়ে আসেনি। ইতিহাসের এই পাঠ থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে। আমাদেরকে বুঝতে হবে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকার বিকল্প নেই। মুসলমানদের ঘরোয়া যত বিভেদ থাকুক কাফেরদের মোকাবেলায় মুসলমানরা থাকবে সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়। যদি আমরা এই শিক্ষা নিতে পারি, এই শিক্ষা অনুধাবন করতে পারি তাহলে বিজয় আমাদের পদচুম্বন করবে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমরা দেখেছি উল্টো চিত্র। ২০০১ সালে মার্কিন ক্রুসেডাররা যখন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানে হামলা করে তখন পাকিস্তান সরকার তাদেরকে আকাশপথ ব্যবহার করার সুযোগ দেয়। পাকিস্তানের গোয়েন্দাসংস্থা মুজাহিদদের গ্রেফতার করে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়। অথচ তাদের উচিত ছিল মুসলিম ভাইদের পাশে দাঁড়িয়ে মার্কিন ক্রুসেডার ও ন্যাটো বাহিনীকে প্রতিরোধ করা। একই বিষয় সৌদি আরবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একদিকে তারা কাতারের ওপর বিদ্বেষ ঝাড়ছে, অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করছে, অনেক বরেণ্য ইসলামিক স্কলারকে সন্ত্রাসী বলে দিচ্ছে, অপরদিকে একই সময় তারা আমেরিকার সাথে হাত মেলাচ্ছে, ট্রাম্পকে সৌদির মাটিতে সংবর্ধনা দিচ্ছে এমনকি কামনা করছে ট্রাম্পের মাধ্যমেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে।

পুরো বিষয়টিই এমন, ইসলামি ফিকহে যার অনুমোদন নেই, ইতিহাস যার বিপক্ষেই আমাদের শিক্ষা দেয়। তবু আমরা সচেতন হচ্ছি না। আমাদের মুগ্ধতা কাটছে না। এই উম্মাহর এক বড়সড় মানসিক বিপর্যয় এটি।

---

[৫৫]. এই তুষারপাত প্রায় ৪০ দিন অব্যাহত ছিল।

[৫৬]. *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, ১০/৩৭১।

প্রয়োজনীয়তা : ৪

বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চায় সময় ব্যয় করা

ইতিহাস জ্ঞানের একটি শাখা। ইতিহাসের বইপত্র অধ্যয়ন করার অর্থ হলো জ্ঞানের একটি শাখায় বিচরণ করা। নিজের সময়কে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজে ব্যয় করা। ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে নির্মল বিনোদন উপভোগ করা যায়। অতীতের নানা ঘটনাবলির বিবরণ আমাদের রোমাঞ্চিত করে, যা একটি আকর্ষণীয় সাহিত্য পাঠের মতোই। এজন্য ইতিহাস পাঠ অনেক সময় আমাদেরকে মানসিক চাপ কমাতেও সাহায্য করে। ইবনুল জাওযি[৫৭] লিখেছেন, ইতিহাস পাঠে দুধরনের উপকারিতা আছে। প্রথমত, যখন আপনি বিচক্ষণদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করবেন তখন আপনিও সুন্দর চিন্তা ও বিচক্ষণতার প্রয়োগ সম্পর্কে অবগত হবেন। আবার সীমালঙ্ঘনকারীদের জীবনচরিত ও তাদের শেষ পরিণতি পাঠ করে উদ্যতরাও সংযত হয়ে ওঠে। একইসাথে বুদ্ধির তরবারি হয়ে ওঠে ধারালো। দ্বিতীয়ত, ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে নানা আশ্চর্য বিষয় ও যুগের পটপরিবর্তন জানা যায়, জানা যায় ভাগ্যের উত্থান-পতন, যা পাঠ করে মন হয়ে ওঠে প্রশান্ত।

আবু আমর বিন আলা একজন বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কি মরতে চান? বৃদ্ধ বললেন, না। আবু আমর জিজ্ঞেস করলেন, আপনার জন্য দুনিয়ার কোনো স্বাদ আর অবশিষ্ট আছে? বৃদ্ধ বললেন, আমি আশ্চর্য সব বিষয়ে শুনতে পছন্দ করি।[৫৮]

ঐতিহাসিক মাসউদি[৫৯] তো সরাসরি বলেই বসেছেন, ইতিহাস এমন এক শাস্ত্র যা দ্বারা জ্ঞানী ও মূর্খ দুদলই উপকৃত হতে পারে। এর দ্বারা বুদ্ধিমান ও নির্বোধ দুদলই তৃপ্ত হয়।[৬০]

---

৫৭. জন্ম বাগদাদে, ১১১৬ খ্রিষ্টাব্দে। হাদিস, তাফসির, ফিকহ, ইতিহাস ইত্যাদি শাস্ত্রে তার দক্ষতা সর্বজনবিদিত। ওয়ায়েজ হিসেবেও তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তাকে বলা হতো সুলতানুল ওয়ায়েজিন। তিনি প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে তিনি ইনতিকাল করেন।

৫৮. *আল-মুনতাজাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল-উমাম*, ১/১১৭।

৫৯. ঐতিহাসিক মাসউদির জন্ম ৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে, বাগদাদে। একজন ভূগোলবিদ ও ঐতিহাসিক হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধ। 'মুরুজুয যাহাব' তার বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ। তবে এই গ্রন্থে তিনি প্রচুর বানোয়াট ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। ইবনে খালদুন *আল-মুকাদ্দিমায়* এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। মাসউদি ৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোতে ইনতিকাল করেন।

৬০. *মুরুজুয যাহাব*, ১/৪।

আল্লামা সাখাবি[৬১] বলেন, ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। কারণ তিনি সৎকর্মশীলদের এর বিনিময় দান করেন। নিয়তের মাধ্যমে আমলের ফলাফল নির্ধারিত হয়।[৬২]

সমকালীন একজন ঐতিহাসিক আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি বেশ চমৎকার করে লিখেছেন, মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হলো তারা ইতিহাস পাঠ করবে। বিশেষ করে তারা সিরাতে নববি ও খোলাফায়ে রাশেদিনের ইতিহাস পাঠ করবে। মুসলমানদের জিহাদসমূহের বিবরণ পাঠ করবে। পূর্বসূরি উলামায়ে কেরাম ও মুজাহিদদের জীবনী পাঠ করবে। এরপর সেই ইতিহাস আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে এ যুগের মানুষের সামনে উপস্থাপন করবে। এভাবেই উম্মাহ আবারও ফিরে পাবে সঞ্জীবনশক্তি, যুহদ ফিদ-দুনিয়া ও কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর দৃঢ়-প্রত্যয়।[৬৩]

প্রয়োজনীয়তা : ৫
প্রশ্ন ও আপত্তির জবাবে ইতিহাস

ইসলামের ওপর প্রাচ্যবাদী বুদ্ধিজীবী ও সেক্যুলার মহল থেকে যেসব প্রশ্ন ও আপত্তি তোলা হয় তার একটা বড় অংশ ইতিহাসসংশ্লিষ্ট। এসব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে ইতিহাসের আঙ্গিকেই। যেমন মূর্তি বা ভাস্কর্য ইস্যুতে আমরা ইসলামের অবস্থান তুলে ধরি হাদিস ও ফিকহের মাধ্যমে। একে হারাম ঘোষণা দিয়ে ভেঙে ফেলতে বলি ইসলামি ফিকহকে সামনে রেখেই। কিন্তু এখানে সুযোগসন্ধানীরা একটা প্রশ্ন তুলে বসে। তারা বলে, ভাস্কর্য যদি বৈধ না হতো তাহলে সাহাবায়ে কেরাম মিশর জয়ের পর সেখানকার দেব-দেবী ও ফারাওদের ভাস্কর্য ভাঙেননি কেন?

এই যে সংশয় ও আপত্তি এর জবাব কিন্তু ইসলামি ফিকহের মাধ্যমে দেওয়া যাবে না। ফিকহ জানাবে ভাস্কর্য হারাম। কিন্তু প্রশ্ন এসেছে সাহাবিদের আমল নিয়ে। তারা কেন ভাঙেননি সে সম্পর্কে। এখন এই প্রশ্নের জবাব দিতে হলে আমাদেরকে দ্বারস্থ হতে হবে ইতিহাসের। ইতিহাসের মাধ্যমেই প্রমাণ করতে

---

[৬১]. পুরো নাম শামসুদ্দিন আবুল খাইর মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বকর বিন উসমান বিন মুহাম্মাদ আস-সাখাবি। জন্ম মিশরে, ৮৩১ হিজরিতে (১৪২৭ খ্রিষ্টাব্দ)। মৃত্যু ৯০২ হিজরিতে, ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানির ছাত্র। হাদিসশাস্ত্রে তার দক্ষতা সর্বজনবিদিত। ইতিহাস বিষয়ে তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো, 'আদদাউ আল্লামি ফি আইয়ানিল করনিত তাসি'।

[৬২]. *আল-ইলান বিত-তাওবিখ*, ৮১।

[৬৩]. *সফাহাতুন মুশরিকাতুম মিনাত তারিখিল ইসলামি*, ১/২০।

হবে সাহাবায়ে কেরাম মূর্তি ভাঙার প্রতি শতভাগ আন্তরিক হওয়া সত্ত্বেও ঠিক কী কী কারণে তারা মিশরের এসব মূর্তি ভাঙতে পারেননি।[৬৪]

অনেক সময় বলা হয় হয় ইসলামের ইতিহাস মূলত খুনোখুনির ইতিহাস। রক্ত ও লাশের ইতিহাস। খোলাফায়ে রাশেদিনের চারজনের তিনজনই নিহত হয়েছিলেন আততায়ীর হাতে। যে খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয় তখনই তো খলিফারা নিজেদের নিরাপত্তা নিজেরা দিতে পারেননি, তাহলে ইসলামি শাসনব্যবস্থা কীভাবে মানুষকে সুখী করবে?

এই প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে হলে আমাদের সে সময়কার ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তৃত জানাশোনা থাকতে হবে। চিনতে হবে সে সময় সক্রিয় প্রতিটি পক্ষকে, জেনে নিতে হবে তাদের মোটিভ।

কখনো বলা হয় সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ ছিলেন ক্ষমতালোভী। ক্ষমতার জন্য নিজের নাবালক ভাইকে হত্যা করতেও পিছপা হননি তিনি। কখনো প্রশ্ন তোলা হয় হাদিসশাস্ত্রের প্রামাণিকতা নিয়ে। বলা হয় উমাইয়া শাসকদের মনস্তুষ্টির জন্য ইবনু শিহাব জুহরি প্রচুর জাল হাদিস বানিয়েছেন। বলা হয় প্রথম দুই শতাব্দীতে হাদিসশাস্ত্র সংকলিতই হয়নি, হয়েছে পরে। ফলে বেশিরভাগ হাদিসই নির্ভরযোগ্য নয়।

এমন হাজারো প্রশ্ন আছে। প্রতিদিন প্রশ্ন তোলা হচ্ছে সিরাত সম্পর্কে, ইতিহাস সম্পর্কে, ইসলামের ইতিহাসের স্মরণীয় মনীষীদের সম্পর্কে। এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায়িত্বও আমাদের। আর জবাব দিতে হলে আমাদের চাই ইতিহাসের হাতিয়ার। ইসলামের সামগ্রিক ইতিহাস থাকতে হবে আমাদের নখদর্পণে। ইতিহাসের বিপজ্জনক চোরাবালি থেকে আহরণ করতে হবে বিশুদ্ধ ইতিহাস।

বর্তমান সময়ে ইতিহাস জানলে অমুসলিম ও সেক্যুলারদের এমন অনেক প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়, যা শুধু হাদিস বা ফিকহ থেকে দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত জনমানসে ইসলামের নানা দিক নিয়ে যে-সকল সংশয় ও সন্দেহ ছড়িয়ে পড়ে, তার জবাব দিতেও ইতিহাসচর্চা করা দরকার।

* * *

---

[৬৪]. সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রশ্নটি বেশ জোরেশোরে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তাই গুরুত্ব বিবেচনা করে এই বিষয়ে একটি লেখা পরিশিষ্টে যোগ করা হয়েছে।

ইতিহাস পাঠ : ফিকহের স্তরবিন্যাস

উম্মাহর ফকিহদের আল্লাহ উত্তম জাযা দিক। তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ফিকহি বিধান বর্ণনা করেছেন। এমনকি তারা ইলমের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি বাদ রাখেননি। শুনতে অনেকের কাছে বিস্ময়কর মনে হবে, ফকিহরা ইতিহাস পাঠের ক্ষেত্রেও স্তরবিন্যাস করেছেন। কোন পর্যায়ের ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিধান কী হবে, তা বলে দিয়েছেন। ফকিহদের এই স্তরবিন্যাস জানা থাকলে ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সুবিধা হবে। তাহলে একজন পাঠক সহজেই তার করণীয় ঠিক করতে পারবেন। তিনি বুঝতে পারবেন ইতিহাসের কোন অংশ তাকে প্রথমে পড়তে হবে, কোন অংশ পরে পড়তে হবে। কোন অংশ থেকে দূরে থাকতে হবে। মূলত ইতিহাস কেন, মানুষের জীবনের প্রতিটি অংশেই ফিকহের চর্চা থাকা জরুরি। ফিকহের চর্চা ও নির্দেশনা মেনে না চললে সমাজে জন্ম নেয় একের পর এক বিভ্রান্তি। ফকিহরা ইতিহাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন, এরপর এগুলো চর্চার হুকুম বলেছেন। তাদের এই আলোচনার সারকথা হলো :

১. ইতিহাসের কিছু অংশের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ, কিছু অংশের জ্ঞান অর্জন করা ওয়াজিব, কিছু অংশ উত্তম, কিছু অংশ জায়েজ, কিছু অংশ মাকরুহ, কিছু অংশ চর্চা করা হারাম।

২. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচর্চা করা ফরজে আইন।

৩. ইতিহাসের যেসব ঘটনা জানা আকিদা, ফিকহি মাসায়েল কিংবা উম্মাহর কল্যাণের জন্য জরুরি, এগুলো জানা ওয়াজিব। সমাজের একটা অংশের মানুষকে অবশ্যই ইতিহাসের এই অংশের চর্চা করতে হবে। অর্থাৎ ইতিহাসের কিছু অংশ পাঠ করা ফরজে কেফায়া।

ইতিহাস অনেক সময় আকিদা ও ফিকহি মাসায়েলের সাথে জড়িয়ে যায়। যেমন একটি হাদিসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হলে আমাদেরকে এর বর্ণনাকারীদের জীবনী জানতে হবে। এটাই তো ইতিহাস। তাহলে দেখা যাচ্ছে বর্ণনাকারীদের ইতিহাস না জানলে আমরা হাদিসের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। ফলে তাদের ইতিহাস জানা জরুরি। একইসাথে হাদিসের ব্যাপারে যেহেতু সমাজের শুধু একটি অংশই চর্চা করেন বা করবেন, তাই

অন্যদের এসব না জানলেও সমস্যা নেই। কিন্তু যারা চর্চা করবেন তাদেরকে অবশ্যই এই বিষয়ের ইতিহাস পড়াশোনা করতে হবে।

৪. আবুল হুসাইন ফারিস বলেন, নবিজির সিরাত মনে রাখা আলেম ও সুফিদের জন্য ওয়াজিব।

৫. সাহাবায়ে কেরাম ও নেককারদের জীবনী জানা, যা জানলে নেক আমলের দিকে অন্তর উদ্বুদ্ধ হয়, তা উত্তম কাজ। যে জিনিস নেক আমলের দিকে ধাবিত করে তা নিয়ে চর্চা করাও একপ্রকার নেক আমল।

৬. বিভিন্ন সাম্রাজ্যের ইতিহাস, বিভিন্ন এলাকার ইতিহাস, যা জানলে দ্বীনের কোনো ক্ষতি নেই, তা জানা জায়েজ।

৭. এমন সব ঘটনাবলি পড়া যাতে দ্বীন ও দুনিয়ার কোনো উপকার নেই, তা মাকরুহ।

৮. ইতিহাসের বিভিন্ন চরিত্রদের প্রেমের ঘটনাবলি, কিংবা পাপাচারীদের এমন ঘটনাবলি পড়া যাতে আকিদা ও আখলাকের মধ্যে প্রভাব পড়ে, তা পাঠ করা হারাম।[৬৫]

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। ইতিহাসের যে অংশ চর্চা করা হারাম বা মাকরুহ, তা ওই সময় হারাম বা মাকরুহ হবে, যখন তা মনোরঞ্জনের জন্য চর্চা করা হবে। অনেক সময় এসব অংশ চর্চা করাও জরুরি হয়ে ওঠে। যেমন কেউ সম্রাট আকবরকে নেককার সাচ্চা মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি দিলো। এখন তার এই কথার জবাবে প্রকৃত বাস্তবতা তুলে আনার জন্য একজন গবেষককে সম্রাট আকবরের জীবন পড়তে হবে। তার হারেমের ঘটনাবলিও দেখতে হবে। এ ক্ষেত্রে এটি হারাম হবে না। এ ক্ষেত্রে তিনি কাজটি করেছেন সত্য তুলে আনার জন্য, গবেষণার জন্য। কিন্তু কেউ যদি হারেমের যৌনতার এসব কাহিনি শুধু মনোরঞ্জনের জন্য পড়ে তাহলে তা হারাম হবে, কারণ এসব ঘটনা তাকে পাপের প্রতি আকৃষ্ট করবে, তার আমলের স্বাদ নষ্ট করে দেবে।

৯. কোনো বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মুশাজারাতে সাহাবা (জংগে জামাল, জংগে সিফফিন) নিয়ে আলোচনা করা বা এগুলো চর্চা করা মাকরুহ।[৬৬] এর কারণ হলো, এই অংশের আলোচনা করা জরুরি কিছু নয়, আবার এর

---

[৬৫]. পুরো আলোচনাটি আল্লামা সাখাবি রহিমাহুল্লাহর 'আল-ইলান বিত-তাওবিখ' থেকে সংক্ষেপ করা হয়েছে। (বাতিল ফিরকার লেখকদের লেখা পড়া সম্পর্কে পরিশিষ্ট ২-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে।)

[৬৬]. *আল-ইলান বিত-তাওবিখ*, ৮৮।

আলোচনা করার মাধ্যমে শয়তানের ধোকায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অনেক সময় শয়তানের ধোকায় পড়ে মানুষ এসব অংশ নিয়ে খুব বেশি চর্চা করে এবং এক সময় সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মান হারিয়ে বসে।

যদি কেউ এসব অংশের আলোচনা পড়লে তার আকিদায় বিচ্যুতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে তার জন্য এসব অংশ পাঠ করা হারাম।[৬৭]

কিন্তু ওরিয়েন্টালিস্ট ও তাদের প্রভাবিত গবেষকরা প্রায়ই সাহাবায়ে কেরামের সম্মানে যে আঘাত হানে তার জবাব দেওয়ার জন্য এসব অংশের চর্চা করা, পাঠ করা জরুরি এমনকি অনেক সময় ওয়াজিব।[৬৮]

কথাটা আরও সহজে এভাবে বলা যায়, সাধারণ পাঠক যাদের সহজেই বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাদের জন্য এই অংশগুলো নিয়ে পড়া উচিত নয়। এগুলো নিয়ে পড়বেন ও কাজ করবেন গবেষকরা। তারা অমুসলিমদের সংশয়ের জবাব দেবেন এবং সাধারণ মানুষের সংশয় দূর করবেন। তাদের ঈমান-আকিদা রক্ষা করবেন। তাদের জন্য এসব অংশ চর্চা হারাম নয়।

* * *

---

[৬৭]. *আল-ইবানাহ আন শারিয়াতিল ফিরকাতিল নাজিয়্যা*, ২৪৫, ইবনু বাত্তাহ।

[৬৮]. *তানবিরুল ঈমান, ইবনু হাজার হাইসামি*, ৭৫।

ইতিহাসশাস্ত্রের গোড়াপত্তন : মুসলমানদের ভূমিকা

প্রাচীন রোমান, ভারতীয়, গ্রিক ও মিশরীয় সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, তাদের মধ্যে অল্প হলেও ইতিহাসচর্চার ঝোঁক ছিল। তারা তাদের মুখে মুখে বীরদের কীর্তিগাথা সংরক্ষণ করত প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম। এসব নিয়ে তৈরি হতো লোককথা ও গান-কবিতা। তবে তাদের ইতিহাস সংরক্ষণের কোনো কাঠামো ছিল না। তারা একে জ্ঞানের কোনো শাখা আকারে সুবিন্যস্তও করতে পারেনি। মুসলমানরাই এই শাস্ত্রকে নতুন করে সাজিয়েছেন। এর কাঠামো সুসজ্জিত করেছেন। এর জন্য সুনির্দিষ্ট উসুল ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। বলতে গেলে মুসলিম ঐতিহাসিকদের হাতেই ইতিহাসশাস্ত্র সমৃদ্ধ হয়েছে। জ্ঞানের শাখা হিসেবে এটি প্রতিপালিত হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে আমরা দেখি এটি ডালপালা মেলেছে দুটি ধারাকে কেন্দ্র করে। একটি হলো, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত। অন্যটি হলো, আসমাউর রিজাল। এই দুটি ধারা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা দরকার, যেন ইসলামের ইতিহাসের পুরো চিত্রটি সামনে আসে।

সিরাতচর্চা

ইসলামের ইতিহাস চর্চার একটি মৌলিক ভিত হলো সিরাত। প্রথম শতকের মুসলমানরা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে নবিজীবনের প্রতিটি অংশ নিখুঁতভাবে সংরক্ষণ করেছেন, যার ফলে হাদিসের এক বিশাল ভান্ডার সংরক্ষিত হয়ে গেছে। হাদিসের বিশাল ভান্ডারের একটি অংশ পরিচিতি পেয়েছে সিয়ার ও মাগাজি নামে, যে অংশে বিবৃত হয়েছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ও যুদ্ধজীবন।

হাদিসশাস্ত্রের পুরো অংশটিই বিবৃত হয়েছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেন্দ্র করে। তার কথা ও কাজ সংরক্ষণ করা হয়েছে হাদিসশাস্ত্রের পাতায় পাতায়। তবে হাদিসশাস্ত্র কখনোই সময়ের ধারাবাহিকতার বিন্যাসে সাজানো হয়নি। এখানে কখনো পরের ঘটনা আগে এসেছে, কখনো আগের ঘটনা পরে। ফলে নবিজীবনের যে আলোচনা আমরা হাদিসে পাই তা ধারাবাহিক নয়, বরং বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলো। এই বিষয়টি লক্ষ করে আলেমদের একাংশ সিদ্ধান্ত নিলেন, হাদিসশাস্ত্রের বাইরে নবিজির সিরাতের

জন্য পৃথক একটি শাস্ত্র সংকলন করা হবে। সেখানে ধারাবাহিকতার সাথে নবিজির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা হবে। আলেমদের এই অংশ পরবর্তী সময়ে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন আসহাবুস সিয়ার নামে, যেহেতু তারা নবিজির সিয়ার বা জীবন নিয়ে কাজ করেছিলেন। একই সময় আলেমদের আরেক অংশ সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িদের জীবনবৃত্তান্ত সংরক্ষণের কাজ শুরু করেন। তারা পরিচিতি পান আসহাবুল খবর বা আখবারি নামে। মুসলিম শাসকরা এই দুই দলকেই নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন।

এই ধারায় বলতে গেলে সবার আগে আসবে হজরত মুয়াবিয়া রা.-এর নাম। ইতিহাসের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি প্রায়ই এশার নামাজের পর নিজের মহলে আসহাবুস সিয়ার ও আসহাবুল খবরদের একত্র করতেন। তাদের মুখ থেকে পুরোনো দিনের ঘটনাবলি শুনতেন। একবার তিনি ইয়ামান থেকে বিখ্যাত আখবারি উবাইদ বিন শারিয়্যাহকে ডেকে এনে ধারাবাহিক পরম্পরায় বর্ণিত ঘটনাগুলোর একটি সংকলন প্রস্তুত করতে বলেন। খলিফার আদেশ পেয়ে উবাইদ বিন শারিয়্যাহ এই সংকলন প্রস্তুত করেন, এর নাম দেওয়া হয় 'আল-মুলুক ওয়া আখবারুল মাযিয়্যিন'[৬৯]। এ সময় আল-আমসাল নামে ইতিহাসের ঘটনাবলির আরেকটি সংকলন প্রস্তুত করা হয়।[৭০] এভাবে হজরত মুয়াবিয়া রা. তার শাসনামলে ইতিহাস সংকলনের ধারা শুরু করে দেন।

---

[৬৯]. এই কিতাবটি 'আল-মুলুকু ওয়া আখবারুল মাযিন' নামের স্থলে 'আখবারু উবাইদ ইবনু শারিয়াহ আল-জুরহামি ফি আখবারিল ইয়ামান ওয়া আশআরুহা ওয়া আনসাবুহা' নামে বেশ প্রসিদ্ধ ও প্রকাশিত। এই নামেই কিতাবটি ১৩৪৭ হিজরিতে ভারতের হায়দারাবাদের দাক্কান থেকে প্রকাশিত হয়। এবং এটি ওয়াহহাব ইবনু মুনাব্বিহের 'আত-তিজান ফি আখবারি মুলুক' কিতাবের সাথে সংযুক্ত রয়েছে।
এই কিতাবটি রচনার ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে বেশ আলোচনা রয়েছে। অনেকে 'আল-ফিহরিসত'-এর রচয়িতা ইবনুন নাদিমের এ বিষয়ে উল্লেখ করা ইতিহাসের কয়েক জায়গায় সমালোচনাও করেছেন। এবং উবাইদ ইবনু শারিয়াহর বয়স, ইসলাম গ্রহণ ও ব্যক্তিত্ব নিয়েও ইতিহাসবিদদের মাঝে বেশ তর্ক আছে। কেউ কেউ বলেন তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় ইসলাম কবুল করেছিলেন কিন্তু তার থেকে কিছুই শোনেননি। কেউ কেউ বলেন, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর ইসলাম কবুল করেছেন। বিস্তারিত দেখুন, *আল-ফিহরিসত*, ১/১৮০-১৮১; *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরাব কবলাল ইসলাম*, ১/৮৩; *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৩৮/২০২; *উসদুল গাবাহ*, ৩/৫৪২; আল-ইসাবাহ, ৩/১০১; *মুজামুল উদাবা*, ১২/৭৩; *মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার*, ২/৮৫-৯০; *আল-আখবারুত তিওয়াল*, ৭-৯; *তারিখু সিন্নিই মুলুকিল আরদি*, ১৮৯-১৯০; *আত-তিজান ফি আখবারি মুলুক*, ১৪৪; *আল-ইকলিল*, ৮/৭১, ১৮৪, ২১৫, ২৩২, ২৩৪, ২৪০; *আত-তারিখুল আরাবি ওয়া মাসাদিরুহু*, ২/৩৭৪; *আল-আলাম*, যিরিকলি, ৪/১৮৯, দারুল ইলম, বৈরুত।

[৭০]. *আল-মুসলিমুন ওয়া কিতাবাতুত তারিখ*, ৯০; *আল-ফিহরিসত*, ১১৮।

উমাইয়া যুগের আরেকজন প্রভাবশালী শাসক উমর বিন আবদুল আজিজ তার শাসনামলে সিয়ার ও মাগাজির দরস দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আসেম বিন কাতাদাহ আনসারিকে (মৃ. ১২১ হিজরি) আদেশ দেওয়া হয় তিনি যেন দামেশকের জামে মসজিদে সিয়ার ও মাগাজি নিয়ে দরস দেন। এই সময় বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনু শিহাব যুহরি (মৃ. ১২৪ হিজরি) নবিজির যুদ্ধজীবন বা মাগাজি নিয়ে একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। ইবনু শিহাব যুহরির শিষ্যদের মধ্যে মুসা বিন উকবা (মৃ. ১৪১ হিজরি) ও মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের (মৃ. ১৫১ হিজরি) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা এই শাস্ত্রকে আরও উঁচুতে উন্নীত করেন। মুসা বিন উকবা বর্ণনার শুদ্ধতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কাজ নিতেন। তিনি অনেকগুলো বর্ণনা থেকে বাছাই করে বিশুদ্ধ বর্ণনার একটি সংকলন তৈরি করেন। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ মুসা বিন উকবার এই সংকলনের প্রশংসা করেছিলেন।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক অবশ্য কিছুটা ব্যতিক্রম ছিলেন। বর্ণনার শুদ্ধতা যাচাইয়ের চেয়ে সব ধরনের বর্ণনা একত্র করার দিকেই তার বেশি মনোযোগ ছিল। তিনি সিরাত বিষয়ে সুবিশাল একটি সংকলন প্রস্তুত করেন।

ইবনু ইসহাকের পর সিরাত সংকলনের ময়দানে এগিয়ে আসেন ইয়ামানের আলেম আবদুল মালিক ইবনু হিশাম (২১৩ হিজরি)। তিনি ইবনু ইসহাকের সিরাতটি নতুন করে সাজান। এর দুর্বোধ্য অংশ ব্যাখ্যা করে দেন। তার এই সিরাতটি ছিল ইবনু ইসহাকের সিরাতের চেয়ে সংক্ষিপ্ত। পরবর্তী সময়ে ইবনু হিশামের এই সিরাত মুসলিমবিশ্বে ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা পায়। পরবর্তী সময়ের আলেমদের মধ্যে ইমাম ইবনু হিব্বানের (মৃ. ৩৫৪ হিজরি) কথা বলা যায়। তিনি 'আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ ওয়া আখবারুল খুলাফা' নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। সিরাতচর্চার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থও উৎসগ্রন্থের ভূমিকা রাখে। এরপর থেকে আলেমদের মধ্যে সিরাতচর্চার এক ধারা শুরু হয়, পরবর্তী দিনগুলোয় যা আরও দীর্ঘ হয়েছে।

আসমাউর রিজাল

হাদিসের বিশাল ভান্ডারকে বিশুদ্ধ ও অবিকৃত রাখার জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে জন্ম নেয় জ্ঞানের এক নতুন শাখা। নাম তার আসমাউর রিজাল। দিনে দিনে এই শাস্ত্র এতটাই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, এখন একজন প্রাজ্ঞ আলেমের জন্য এই শাস্ত্রের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আহমাদ আল-ইজলি (মৃ. ২৬১ হিজরি) 'আস-সিকাত' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটিকেই আসমাউর

রিজাল শাস্ত্রের প্রথম কিতাব ধরা হয়। এরপর উকাইলি, ইবনু হিব্বান, ইমাম দারা-কুতনি, ইবনু আদিসহ আরও অনেক আলেম এই বিষয়ে কিতাব রচনা করেন। শেষদিকে এসে আল্লামা মিযযি রচনা করেন 'তাহজিবুল কামাল', ইমাম যাহাবি রচনা করেন 'মিযানুল ইতিদাল', 'তাজকিরাতুল হুফফাজ', ইবনু হাজার আসকালানি রচনা করেন 'তাহজিবুত তাহযিব' ইত্যাদি গ্রন্থ। মোটামুটি হিজরি অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত এই শাস্ত্রে প্রচুর গ্রন্থ রচিত হতে থাকে।

ইতিহাসচর্চার ভিন্ন ধারা

সিরাত নিয়ে লিখিত বইগুলো যেমন ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তেমনই আসমাউর রিজালের বইগুলোও ইতিহাসশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু একই সময় আরেকটি ধারা গড়ে উঠেছিল যাকে সিরাত বা আসমাউর রিজাল, কোনো কাতারেই ফেলা যাচ্ছিল না। কিন্তু তাতেও নানা ধরনের ঘটনাবলি সংকলিত হচ্ছিল। এই ধারায় আমরা মুহাম্মাদ বিন উমর আল-ওয়াকেদির (মৃ. ২০৭ হিজরি) কথা বলতে পারি। তিনি 'ফুতুহুশ শাম' ও 'আখবারু মক্কা' নামে দুটি গ্রন্থ লেখেন। তবে ইতিহাস সংকলনের ক্ষেত্রে ওয়াকেদিও কোনো বাছবিচার করতেন না। সব ধরনের বর্ণনা একত্র করে দিতেন। ফলে তার রচনায় অনেক মনগড়া-বানোয়াট ঘটনাও এসে গেছে।

ওয়াকেদির শিষ্য ছিলেন মুহাম্মাদ বিন সাদ (মৃ. ২৩০ হিজরি)। তিনি 'আত-তবাকাতুল কুবরা' নামে বারো খণ্ডে একটি বই লেখেন। এই বইতে তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবিদের জীবনী তুলে আনেন। সংকলনের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ ইবনু সাদের চিন্তাধারা ছিল ওয়াকেদির বিপরীত। কোনো বর্ণনা উল্লেখ করার আগে তিনি সাধ্যমতো যাচাই-বাছাই করে নিতেন। ফলে তার গ্রন্থটি মুসলিমবিশ্বে মকবুল হয়ে যায়।

হাদিসশাস্ত্রের দিকপাল ইমাম বুখারিও এ সময় ইতিহাস নিয়ে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। 'আত-তারিখুল আওসাত' ও 'আত-তারিখুল কাবির'। তবে এ দুটি ছিল আসমাউর রিজালের কিতাব। এখানে ঘটনা বিবৃত হয়েছিল ইতিহাসের কোনো ধারাবাহিকতা ছাড়াই।

ষড়যন্ত্রের জাল

মনে রাখতে হবে এই শাস্ত্রগুলো রচিত হচ্ছিল হিজরি প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে। এই সময় মুসলিমবিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল সংঘাতপূর্ণ। রাজনৈতিক সংঘাতের জের ধরে জন্ম নেয় নতুন নতুন ধর্মীয় ফিরকা। বনু উমাইয়ার সাথে আহলে বাইতের বিরোধের জের ধরে জন্ম নেয় শিয়া মতবাদ।

আলি-মুয়াবিয়া রা. দ্বন্দ্বের সময় জন্ম নেয় খারেজি ফিরকা। এই ফিরকাগুলো নানাভাবে বিরোধীপক্ষের বিরুদ্ধে গুজব রটাচ্ছিল। ফিরকাগুলোর পক্ষ থেকে প্রচুর জাল হাদিস ও মিথ্যা ইতিহাস ছড়ানো হয়। তারা এমনটা করেছিল বিরোধীপক্ষকে ঘায়েল করতে। জাল হাদিসের ব্যাপারে মুহাদ্দিসে কেরাম চুপ থাকেননি। তারা দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেন এবং হাদিসের ভান্ডার থেকে এসব জাল হাদিস বেছে ফেলেন। কিন্তু ইতিহাসের বিস্তৃত ময়দানে জাল বানোয়াট বর্ণনাগুলো থেকেই যায়। এগুলো নিয়ে খুব বেশি বিস্তারিত কাজ করা হয়নি। ফলে ইতিহাসের ময়দানে এইসব জাল বর্ণনা তৈরি করে এক বিপজ্জনক চোরাবালি, পরবর্তী দিনগুলোয় যে চোরাবালির ফাঁদে আটকা পড়েছেন মুসলিমবিশ্বের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ।

সুবিন্যস্ত ইতিহাস

সময় গড়ানোর সাথে সাথে সবাই মন দিচ্ছিলেন ধারাবাহিকতার সাথে ইতিহাস বিন্যস্ত করতে। এই ধারায় প্রথম নামটি আসে উমর বিন শাব্বাহ আল-বসরির (মৃ. ২৬২ হিজরি)। তিনি 'তারিখু মাদিনাতিল মুনাওয়ারাহ' নামে একটি ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন। এর কিছুদিনের মধ্যে ইবনু কুতাইবা দিনাওয়ারি (মৃ. ২৭০ হিজরি) রচনা করেন 'আল-মাআরিফ' নামে একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি সংক্ষেপে হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে তার সময়কাল পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস বিবৃত করেছেন।

এ সময়ের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক আহমাদ বিন ইয়াহইয়া বালাজুরি (মৃ. ২৮৯ হিজরি) রচনা করেন 'ফুতুহুল বুলদান' ও 'আনসাবুল আশরাফ' নামে দুটি গ্রন্থ। এই দুটিকে ইসলামি ইতিহাসের প্রাচীন উৎস বিবেচনা করা হয়। তবে প্রথম ইতিহাস নিয়ে বিস্তৃত কাজ করেন মুহাম্মাদ ইবনু জারির তাবারি (মৃ. ৩১০ হিজরি)। তিনি রচনা করেন 'তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক'। ইতিপূর্বে ইতিহাস নিয়ে এত বিশাল গ্রন্থ আর কেউ রচনা করেননি। সাধারণত এটি তারিখে তাবারি নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। পরের ঐতিহাসিকদের অনেকেই যেমন, ইবনু কাসির, ইবনুল আসির প্রমুখ তাবারির লিখিত গ্রন্থ থেকে অনেক তথ্য ও বর্ণনা নিয়েছেন। তবে এই গ্রন্থেও নানা ধরনের বর্ণনা নেওয়া হয়েছে যার মধ্যে কিছু আছে বানোয়াট ও মিথ্যা।

তাবারির পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে ইতিহাসচর্চার ধুম পড়ে যায়। ঐতিহাসিকরা একের পর এক সুবিশাল গ্রন্থ রচনা করতে থাকেন। খতিব বাগদাদি (মৃ. ৪৬৩ হিজরি) রচনা করেন 'তারিখু বাগদাদ'। ইবনু আসাকির

(মৃ. ৫৭১ হিজরি) রচনা করেন 'তারিখু মাদিনাতি দিমাশক'। আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি (মৃ. ৫৯৭ হিজরি) রচনা করেন 'আল-মুনতাজাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল-উমাম'। ইবনুল আসির জাযারি (মৃ. ৬৩০ হিজরি) রচনা করেন 'আল-কামিল ফিত-তারিখ'। একই সময় আলেমদের অনেকে সাহাবায়ে কেরামের জীবনী লেখা শুরু করেন। যেমন ইবনু আবদিল বার লেখেন 'আল-ইসতিআব'। ইবনুল আসির লেখেন 'উসদুল গাবা'। ইবনু হাজার আসকালানি লেখেন, 'আল-ইসাবাহ ফি তাময়িজিস সাহাবাহ'। হিজরি সপ্তম শতাব্দীতে মুসলিমবিশ্বে তাতারদের হামলা হয়। তাদের হাতে পতন ঘটে খাওয়ারেজম সাম্রাজ্য ও আব্বাসি খিলাফাহর। ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে তাতাররা আগ্রাসন চালিয়ে যায়। পরে মামলুকরা এসে তাতারদের রুখে দেয়। নতুন করে মুসলিমরা আবার সমাজ গড়ে তোলে। এ সময় নতুন করে ইতিহাসের বইপত্র রচনা হতে থাকে। ইমাম যাহাবি (মৃ. ৭৪৮ হিজরি) লেখেন 'তারিখুল ইসলাম'। ইবনু কাসির (মৃ. ৭৭৪ হিজরি) লেখেন 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া'। ইবনু খালদুন (মৃ. ৮০৮ হিজরি) লেখেন 'দিওয়ানুল মুবতাদি ওয়াল-খবর'। ইবনুল ইমাদ হাম্বলি (মৃ. ১০৮৯ হিজরি) লেখেন 'শাজারাতুয যাহাব'। হিজরি সপ্তম শতাব্দী থেকে হিজরি নবম শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাসচর্চার ময়দান ছিল উন্মুক্ত। এ সময় এটি জ্ঞানের শাখা হিসেবে আরও প্রশস্ত হয়ে ওঠে।

ভূগোল ও ভ্রমণকাহিনি

মুসলমানরা ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার পাশাপাশি ভূগোল সম্পর্কিত বইপত্র রচনা করেছেন। বিভিন্ন এলাকা সফর করে সফরনামা লিখেছেন। পরবর্তীকালে এই বইপত্রগুলোও হয়ে উঠেছে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এসব বইতে মিলছে ইতিহাসের অনেক দুর্লভ তথ্য। ইবনু শাব্বাহ (মৃ. ২৬২ হিজরি) রচনা করেন 'তারিখুল মাদিনাহ' নামে একটি গ্রন্থ। ইমাম ফাকেহি (মৃ. ২৭২ হিজরি) ও ইমাম আযরাকি (মৃ. ২৫০ হিজরি) রচনা করেন 'তারিখে মক্কা' নামে পৃথক দুটি গ্রন্থ। ইবনু খুরদাদবেহ (মৃ. ২৮০ হিজরি) রচনা করেন 'আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক' নামে ভূগোলের একটি গ্রন্থ। এতে বিভিন্ন এলাকার বৈশিষ্ট্য ও বিবরণ তুলে ধরেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ইবনুল হাইক হামদানি (মৃ. ৩৩৪ হিজরি) রচনা করেন সিফাতু জাযিরাতিল আরব নামে আরেকটি গ্রন্থ। আল-বেরুনি (মৃ. ৪৪০ হিজরি) লেখেন 'কিতাবুল হিন্দ'। আবু নুয়াইম আসবাহানি (মৃ. ৪০৫ হিজরি) লেখেন 'তারিখু নাইসাবুর'। হামযাহ জুরজানি (মৃ. ৪২৭ হিজরি) লেখেন 'তারিখু জুরজান'। বিখ্যাত ভূগোলবিদ আল-ইদ্রিসি (মৃ. ৫৬০ হিজরি) রচনা করেন 'নুজহাতুল মুশতাক'। ইয়াকুত

হামাবি (মৃ. ৬২৬ হিজরি) ছাড়িয়ে যান অন্য সবাইকে। মুসলিমবিশ্বের প্রায় সকল এলাকার ভৌগোলিক বিবরণ নিয়ে তিনি রচনা করেন 'মুজামুল বুলদান' নামে সুবিশাল এক গ্রন্থ। সাতশ বছর পার হলেও তার এই গ্রন্থের আবেদন সামান্য কমেনি। আজও এই গ্রন্থ থেকে সমানতালে উপকৃত হচ্ছে আলেম ও তালিবুল ইলমরা। যারা বিভিন্ন এলাকায় সফর করে সফরনামা লিখেছেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন ইবনু যুবাইর আন্দালুসি (মৃ. ৬১৪ হিজরি) ও ইবনু বাতুতা (সাধারণত ইবনে বতুতা নামে অধিক পরিচিত) (মৃত্যু. ৭৭৯ হিজরি)।

জীবনীগ্রন্থগুলো

ইতিহাসের অন্যান্য শাখায় বইপত্র রচনার পাশাপাশি বরেণ্যদের জীবনী এক মলাটে আনার চেষ্টাও শুরু হয়ে যায়। শুরুর দিকে খলিফা বিন খইয়াত রচনা করেন 'আত-তবাকাত' নামে একটি গ্রন্থ। এরপর আযদি রচনা করেন 'তবাকাতুস সুফিয়া'। ইবনুল জাওযি রচনা করেন 'সিফাতুস সাফওয়া'। ইমাম যাহাবি রচনা করেন 'সিয়ারু আলামিন নুবালা'। ইমাম সুয়ুতি লেখেন 'তবাকাতুল হুফফাজ'। আবু ইসহাক শিরাজি লেখেন 'তবাকাতুল ফুকাহা'। ইয়াকুত হামাবি লেখেন 'মুজামুল উদাবা'। ইবনুল মুতায লেখেন 'তবাকাতুশ শুয়ারা'। কখনো কখনো শুধু একজন ব্যক্তির জীবনী নিয়েও একটি গ্রন্থ রচনা করা হচ্ছিল। যেমন আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন আবদুল হাকাম (মৃ. ২২৪ হিজরি) রচনা করেন 'সিরাতু উমর ইবনু আবদিল আযিয'। আবুল ফজল সালিহ (মৃ. ২৬০ হিজরি) রচনা করেন 'সিরাতু আহমাদ বিন হাম্বল'। কাজি সাইমারি রচনা করেন 'আখবারু আবি হানিফা'। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির জীবনী নিয়ে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ রচনা করেন 'আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়্যা'।

এখানে আমরা মুসলমানদের ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে সামান্য একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র। ইতিহাস বিষয়ে রচিত শত শত বইয়ের মাঝখান থেকে এক-দুটি বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে মাত্র। মুসলমানরা ইতিহাস রচনার সময় ব্যক্তি, জাতি, এলাকা, শহর সবকিছুর ইতিহাস সংরক্ষণ করেছেন। পেশাগত সম্প্রদায়েরও আলাদা ইতিহাস রচনা করেছেন। আলেমদের মধ্যেও শ্রেণিবিন্যাস করে আলাদাভাবে তাদের জীবনী সংকলন করেছেন। ফকিহদের জীবনী আলাদা সংকলিত হয়েছে, মুফাসসিরদের জীবনী আলাদা। হানাফি মাজহাবের আলেমদের জীবনী আলাদা এনেছেন, সুফিদের জীবনী আলাদা এনেছেন, শাফেয়ি মাজহাবের আলেমদের জীবনী আলাদা এনেছেন।

'তবাকাতুল আহনাফ', 'তবাকাতুশ শাফেয়িয়্যা', 'যাইলু তবাকাতিল হানাবিলা', 'তবাকাতুল আউলিয়া', 'হিলয়াতুল আউলিয়া', 'ওফায়াতুল আইয়ান', 'আখবারুল কুজাত' এই ধরনের গ্রন্থ। এভাবে মুসলমানরা ইতিহাসশাস্ত্র সংরক্ষণ করেন। পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সংরক্ষণ করেন পূর্ববর্তীদের ইতিহাস।

* * *

ইসলামের ইতিহাসের উৎস

অনেকে ভেবে থাকেন ইতিহাসের উৎস শুধু ইতিহাসের বইপত্র। বিষয়টি আদপে এমন নয়। ইসলামের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মোটাদাগে দশটি উৎস আমাদের সামনে আসে। এই উৎসগুলোর সবগুলোর মান ও গুরুত্ব একরকম নয়, কিন্তু নানা কারণে এগুলোর ওপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। নিম্নে ইসলামের ইতিহাসের এই উৎসসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

১. কুরআন কারিম

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিশুদ্ধ উৎস হলো কুরআন কারিম। ওহির মাধ্যমে হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আল্লাহ যে বার্তা পাঠিয়েছেন তাই আল-কুরআন। এতে বিবৃত হয়েছে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস ও শরয়ি বিধিবিধান। একইসাথে আল্লাহ এখানে বর্ণনা করেছেন ইতিহাসের বেশ কিছু ঘটনা। কুরআন কারিম ইতিহাসের গ্রন্থ নয়, কিন্তু এতে বিবৃত হয়েছে ইতিহাসের বেশ কিছু উপাদান। এই উপাদানগুলো সবচেয়ে বিশুদ্ধ। পৃথিবীর সকল ইতিহাসগ্রন্থও যদি কুরআনে বর্ণিত কোনো ঐতিহাসিক তথ্যের বিপরীতে অবস্থান নেয়, তাহলে ইতিহাসগ্রন্থগুলোর বক্তব্য পরিত্যাজ্য হবে। একজন মুসলমানের আকিদা এটিই।

কুরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্যগুলো তিন ধরনের। **এক.** অতীতের জাতিসমূহের ঘটনাবলি। যেমন : কওমে আদ, কওমে সামুদ, আসহাবে কাহাফ, বনি ইসরাইল ও অন্যান্য নবিদের ঘটনাবলি। **দুই.** নবিজির সিরাত ও তৎকালীন বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেমন বদরের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ, পারসিকদের হাতে রোমানদের পরাজয় ইত্যাদি। তিন. ভবিষ্যতের ঘটনাবলির প্রতি ইশারা।

কুরআন কারিম থেকে আমরা এই তিন ধরনের ঐতিহাসিক তথ্য পাই। কুরআনে বর্ণিত প্রতিটি তথ্য সুনিশ্চিত, বিশুদ্ধ ও শতভাগ সঠিক। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহ তাআলা নিজেই ইরশাদ করেছেন—

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا﴾

আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে? [সুরা নিসা : ১২২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন—

﴿تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ﴾

এটি গায়বের খবর, আমি আপনার প্রতি ওহি প্রেরণ করছি। ইতিপূর্বে এটা আপনার এবং আপনার জাতির জানা ছিল না। [সুরা হুদ : ৪৯]

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾

আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনি বর্ণনা করেছি, যেমতে আমি এ কুরআন তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি। তুমি এর আগে অবশ্যই এ ব্যাপারে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। [সুরা ইউসুফ : ৩]

ইসলামের ইতিহাসের প্রথম ও প্রধান উৎস কুরআন কারিম। কোনো ঘটনার বিষয়ে যদি কুরআন কারিমে আয়াত পাওয়া যায়, তাহলে সেই বিষয়ে আর কোনো সোর্সের বক্তব্য দেখার দরকার নেই। যেমন মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআন কারিম স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছে। কীভাবে আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হলো এবং তিনি দুনিয়াতে এলেন সেই আলোচনা কুরআন কারিমে আছে। মানুষের সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে বিবর্তনবাদী ধারা আমাদের সামনে ভিন্ন একটি ইতিহাস উপস্থাপন করে। তারা আদিম মানুষের গল্প শোনায়, যারা পাহাড়ে বসবাস করত, কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারত না ইত্যাদি ইত্যাদি। যেহেতু তাদের এই থিউরি কুরআন কারিমের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক, তাই তা পরিত্যাজ্য। এ ক্ষেত্রে কুরআন কারিমের বক্তব্যই শিরোধার্য।

কুরআন কারিম সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি বর্ণনা করেছে। তাদের প্রশংসা করেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইনজিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারাগাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের ওপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে—চাষিকে আনন্দে অভিভূত করে—যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। [সুরা ফাতহ : ২৯]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের দুটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। এক. তারা মুমিনদের প্রতি সহানুভূতিশীল। দুই. তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর। এখন পরবর্তীকালে রচিত কোনো ইতিহাসগ্রন্থে যদি সাহাবায়ে কেরামের এমন চিত্র উপস্থাপন করা হয়, যাতে দেখা যায় তারা মুমিনদের প্রতি কঠোর ছিলেন, কিংবা কাফেরদের কাছে টেনে নিয়েছেন, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কুরআন কারিমের বক্তব্যই আমাদেরকে মেনে নিতে হবে। যদি এমন কোনো বিবরণ বিশুদ্ধ সূত্রে আমাদের সামনে আসে, যেখানে দেখা যায় সাহাবায়ে কেরাম মুমিনদের প্রতি কঠোর হয়েছেন তাহলে বুঝতে হবে সেখানে অবশ্যই কোনো ব্যাখ্যা আছে। এক বাক্যে বলে দেওয়ার মতো কোনো বিষয় নয় এটি।

মূলকথা হলো, ইসলামের ইতিহাসের প্রথম ও প্রধান উৎস কুরআন কারিম। এই উৎসে বর্ণিত তথ্য বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই এখানে বর্ণিত সকল তথ্য গ্রহণ করা যায়।

২. হাদিস

কুরআন কারিমের পর ইতিহাসের বিশুদ্ধ যে সোর্স আমাদের সামনে আছে তা হলো হাদিস শরিফ। হাদিসের বিশাল ভান্ডারে ইতিহাসের অনেক তথ্য ছড়িয়ে আছে। কুরআন কারিমে জাতিসমূহের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত হলেও তা আলোচনা করা হয়েছে সংক্ষেপে ও বিক্ষিপ্ত আকারে। কারণ, ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করা কুরআনের উদ্দেশ্য নয় বরং ইতিহাসের একটি অংশ তুলে ধরে তা থেকে শিক্ষা নির্দেশ করাই উদ্দেশ্য। ফলে কুরআন কারিমে আমরা পাই ইতিহাসের বিক্ষিপ্ত বিবরণ, যার অনেক অংশই বর্ণিত নেই

সেখানে। যদি সামগ্রিক পুরো ইতিহাসের চিত্রটি পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে দ্বারস্থ হতে হবে হাদিসের ভান্ডারের। কারণ হাদিস শরিফ হলো কুরআন কারিমেরই ব্যাখ্যা। এ ছাড়া হাদিস শরিফে এসে গেছে নবিজির সিরাতের ঘটনাবলির বিস্তৃত বিবরণ। ফলে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম ধাপ অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যাবে হাদিসের ভান্ডারে। বিশুদ্ধতার দিক থেকে এর অবস্থান দ্বিতীয় স্তরে, কারণ হাদিসের মধ্যে নানা শ্রেণিবিভাগ আছে। সব হাদিসের মান এক স্তরের নয়। কিছু হাদিস আছে অত্যন্ত দুর্বল। আবার হাদিসের নামে অনেক বানোয়াট বর্ণনাও ছড়িয়ে আছে। ফলে হাদিসের ভান্ডার থেকে তথ্য নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সতর্কতার সাথে যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে। কুরআন কারিমের মতো নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা যাবে না।

হাদিস শরিফেও তিন ধরনের ঘটনার বিবরণ দেখা যায়। এক. অতীতের ঘটনাবলি। দুই. নবিজির জীবনের অংশ। সাহাবায়ে কেরামের জিহাদের বিবরণ। মদিনার ইহুদিদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক। তিন. ভবিষ্যতে সংঘটিত ঘটনাবলির বিবরণ। যেমন : দাজ্জাল, ইয়াজুজ মাজুজ, মাহদির আবির্ভাব ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩. ইতিহাসের সাধারণ বইপত্র

কুরআন কারিম ও হাদিসের পর ইতিহাসের সাধারণ বইপত্রের ওপর আমাদের নির্ভর করতে হবে। ঐতিহাসিকরা নানা আঙ্গিকে ইতিহাসের বইপত্র রচনা করেছেন। তাদের সবগুলোর মান ও ধরন এক নয়। আমাদেরকে সতর্ক থেকে এসব গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে হবে, কারণ ইতিহাসের বইতে নানা ধরনের তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে যার সব সঠিক নয়। খতিব বাগদাদির ‘তারিখে বাগদাদ’ কিংবা ইবনুল আসিরের ‘আল-কামিলে’ এমন অনেক তথ্য এসেছে যা বিশুদ্ধতার নিক্তিতে উত্তীর্ণ নয়। আবার কখনো কখনো শিয়া ও অন্যান্য ভ্রান্ত ফিরকার লোকেরা বিকৃত ইতিহাস রচনা করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতকে কলঙ্কিত করতে চেয়েছে। যেমন ইয়াকুবি রচিত ‘তারিখে ইয়াকুবি’ কিংবা মাসউদির লিখিত ‘মুরুজুয যাহাব’ গ্রন্থগুলো। ফলে ইতিহাসের ভান্ডার হয়ে উঠেছে একইসাথে কাঁটা ও ফুলের মেলবন্ধন। এখান থেকে ফুল তুলতে চাইলে এগোতে হবে সতর্কতার সাথে। কিছু মানুষ ইতিহাসের বইকে শতভাগ বিশুদ্ধ মনে করে এর ওপর নির্ভর করে বসে, এটি ভুল। ইতিহাসের বই থেকে তথ্য নিতে হবে যাচাই-বাছাই করে। আধুনিক গবেষকদের অনেকে ইতিহাসের বইগুলো নতুন করে তাহকিকসহ প্রকাশ করছেন ফলে এখন উপকৃত হওয়া

সহজ হচ্ছে। তবে এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, অনেক মুহাক্কিকও প্রান্তিকতামুক্ত হতে পারেন না। নিরপেক্ষতার পরিচয় না দিয়ে অনেকেই নিজ আকিদা, চেতনা ও পক্ষকে সমর্থনে বহু দলিল উল্লেখ করে তাহকিক ও তার উসুলের মান নষ্ট করে দেন। বিশুদ্ধ তথ্য সরবরাহের পরিবর্তে তারা নিজ ঘরানার চিন্তা উপস্থাপনেই বেশি ব্যস্ত হন। ফলে এই বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে।

৪. ভূগোল-বিষয়ক বইপত্র

মুসলিম ভূগোলবিদরা ভূগোল বিষয়ে নানা বইপত্র রচনা করেছেন। এসব বইপত্রে তারা বিভিন্ন শহরের বর্ণনা দিয়েছেন। ভৌগোলিক বর্ণনার পাশাপাশি অনেক সময় ঐতিহাসিক কিছু বর্ণনাও চলে এসেছে এসব বইতে। যেমন ইয়াকুত হামাবি রচিত 'মুজামুল বুলদান' গ্রন্থে আমরা বিভিন্ন শহরের ভৌগোলিক বর্ণনার পাশাপাশি এসব শহরের কিঞ্চিৎ ইতিহাস, এখানকার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ ও তাদের অবদান সম্পর্কেও জানতে পারি। অনেক সময় এসব বইতে এমন অনেক তথ্যের সন্ধান মেলে যা হয়তো ইতিহাসের অন্যান্য বইতে নেই। ফলে এসব বইপত্রও ইতিহাসের একটি সোর্স হিসেবে বিবেচিত হয়। এসব বইপত্রে বিভিন্ন যুগের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়, যা ইতিহাসের সাধারণ বইপত্রে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

৫. ভ্রমণকাহিনি

ইতিহাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো ভ্রমণকাহিনি। যুগে যুগে মুসলিম পর্যটকরা বিভিন্ন অঞ্চল ও এলাকা সফর করেছেন। তারপর নিজেদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। পরবর্তী সময়ে তাদের এসব ভ্রমণকাহিনিও হয়ে উঠেছে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইবনু হাওকাল, ইবনু যুবাইর আন্দালুসি কিংবা আবদুল লতিফ বাগদাদি তাদের প্রত্যেকের সফরনামাতে রয়েছে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইবনু যুবাইর আন্দালুসি ক্রুসেড চলাকালীন মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। তার সফরনামায় বিভিন্ন এলাকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির পাশাপাশি সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি সম্পর্কেও বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। দামেশকের মাদরাসাসমূহ সম্পর্কেও তিনি কিছু তথ্য দিয়েছেন যা থেকে আমরা মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা নিতে পারি। ইবনু হাওকাল সিসিলি ভ্রমণ করেছিলেন। তার ভ্রমণকাহিনিতে তিনি সিসিলির মক্তব সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন। আধুনিক গবেষকদের জন্য এ তথ্যগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ। ভ্রমণকাহিনিতেও ইতিহাসের

এমন অনেক তথ্য মেলে যা ইতিহাসের সাধারণ বইপত্রে অনুপস্থিত। এমনকি অনেক সময় ঐতিহাসিকরা নিজেরাই এসব বইপত্র থেকে তথ্য নিয়েছেন।

৬. সাহিত্যের বইপত্র

সাহিত্যের ধারা আর ইতিহাসের ধারা দুটি ভিন্ন ও পৃথক ধারা। সাহিত্যে কল্পনার প্রভাব বেশি থাকে, অপরদিকে ইতিহাসে কল্পনার কোনো স্থান নেই। ফলে ইতিহাসের তথ্য নেওয়ার জন্য সাহিত্যের বইপত্রের ওপর প্রথম ধাপেই নির্ভর করা হয় না। কারণ সাহিত্যের কল্পনার ভেতর থেকে ইতিহাসের তথ্য আহরণ করা খুবই কঠিন। কিন্তু কখনো সাহিত্যের বইপত্রেও ইতিহাসের কিছু উপাদান পাওয়া যায়, যা থেকে গবেষকরা উপকৃত হতে পারেন।

ক্রুসেডের সময়কালে কবিরা মুসলমানদের বিজয়ের পর যেসব কবিতা রচনা করতেন, তা যদিও সাহিত্যের উপাদান কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তার প্রয়োজনীয়তা ফেলে দেওয়ার মতো নয়। এজন্যই ঐতিহাসিক আবু শামাহ তার লিখিত 'আর-রওযাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন' গ্রন্থে মুসলিম কবিদের লেখা এমন অনেক কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। কখনো কখনো ঐতিহাসিকদের লেখা বই হয়ে উঠেছে সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নমুনা। মাক্কারির লেখা 'নাফহুত তিব' গ্রন্থটি একইসাথে ইতিহাস ও উৎকৃষ্ট সাহিত্য দুই ধারার প্রতিনিধিত্ব করে আমাদের সামনে উপস্থিত।

৭. আত্মজীবনী

এটিও ইতিহাসের তথ্যের ক্ষেত্রে জরুরি একটি উপাদান। কারণ এতে ব্যক্তি তার জীবনের দেখা ও শোনা ঘটনাবলি লিখে থাকেন। মুসলমানদের মধ্যে আত্মজীবনী লেখার ধারা শুরু হয়েছে খুব বেশিদিন হয়নি। দুই শতাব্দী আগেও এই ধারায় তেমন কাজ হয়নি। কিন্তু গত শতাব্দীতে বেশ কিছু জরুরি কাজ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, শাইখ আলি তানতাবির আত্মজীবনী, হাসানুল বান্নার আত্মজীবনী, সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবির আত্মজীবনী, শাইখ জাকারিয়া কান্ধলবির আত্মজীবনী, মুহাম্মাদ কুরদ আলির আত্মজীবনী। এসব গ্রন্থে তারা তাদের সামসময়িক অনেক জরুরি বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন। ভবিষ্যতে যারা গত শতাব্দীর ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করবেন তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের জোগান দেবে এই গ্রন্থগুলো।

আত্মজীবনীর কাছাকাছি একটি ধারা হলো দিনলিপি। দিনলিপিতেও ব্যক্তি তার সময়কাল ও সমাজ সম্পর্কে অনেকে জরুরি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। মিশরের বিখ্যাত ঐতিহাসিক জাবারতি নেপোলিয়নের মিশর হামলার সময়

দিনলিপি লিখেছিলেন, যা পরে 'মাজহারুত তাকদিস বি যাওয়ালি দাওলাতিল ফারান্সিস' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে সে সময়ের ইতিহাসের অনেক উপাদান তুলে দিয়েছেন লেখক, যা পরের গবেষকদের কাজে এসেছে। সিপাহি বিদ্রোহের সময় মির্জা গালিব 'দাস্তাম্বু' নামে যে দিনলিপি লিখেছেন তা হয়ে উঠেছে ইতিহাসের একটি প্রামাণিক দলিল।

৮. ব্যক্তিগত পত্রাবলি

ইতিহাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক পত্রাবলি। পত্র লেখার সময় সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়ের জরুরি বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। ফলে পরবর্তীদের জন্য এসব পত্র হয়ে ওঠে তথ্যের আকর। হজরত উমর রা. ও মুঘল সম্রাট আলমগিরের প্রশাসনিক পত্রাবলি আমাদেরকে ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের জোগান দিয়েছে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবির রাজনৈতিক পত্রাবলি পাঠে আমরা মুঘল শাসনের শেষদিকে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা ও আলেমদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাই। গত শতাব্দীতে মাওলানা মওদুদির সাথে মরিয়ম জামিলার পত্রালাপ কিংবা জামালুদ্দিন কাসেমির সাথে মুহাম্মাদ বাহজাত বাইতারের পত্রালাপ হয়ে উঠেছে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এসব পত্রে তারা প্রকাশ করেছেন সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের নিজস্ব চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ। আগামী দিনে যা গবেষকদের উপকৃত করবে।

৯. প্রশাসনিক দস্তাবেজ

আব্বাসি আমলের শুরুর দিকে তালাসের যুদ্ধ সংঘটিত হলে মুসলমানদের হাতে কাগজ নির্মাণের ফর্মুলা চলে আসে। মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় কাগজকল। ফলে ধীরে ধীরে মুসলিমবিশ্বে কাগজ সহজলভ্য হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় ফরমানগুলোও কাগজে লেখা হতে থাকে। এসব ফরমানে আমরা ইতিহাসের অনেক তথ্য পাই। কখন কোন শাসক কোন এলাকায় কী ধরনের আদেশ জারি করেছিলেন তার স্পষ্ট বর্ণনা মেলে এসব ফরমানে। ফলে প্রশাসনিক ফরমানগুলোও ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ফরমান। এসব ফরমানের কিছু অংশ সরাসরি টিকে আছে এখনো। আর কিছু অংশ ঐতিহাসিকরা তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এসব নিয়ে গবেষকরা নানা আঙ্গিকে কাজ করে যাচ্ছেন। মুঘল আমলের অনেক সরকারি ফরমান এখনো লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস, খোদাবক্স লাইব্রেরি পাটনাসহ বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও আর্কাইভে টিকে আছে।

১০. অসিয়তনামা

মৃত্যুর আগে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অসিয়ত লিখে যাওয়ার ধারা বেশ পুরোনো। সালাফদের অনেকেই মৃত্যুর আগে অসিয়তনামা লিখে যান। এসব অসিয়তে অনেক সময় তারা এমনসব বিবরণ লিখে যান যা তারা জীবিত অবস্থায় লেখার সাহস করেননি। তারা এতে এমন অনেক সত্য প্রকাশ করে দেন যা জীবিত অবস্থায় বললে জীবনের আশঙ্কা ছিল। এজন্য অসিয়তনামাও হয়ে ওঠে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান।

ইতিহাস অধ্যয়ন ও তথ্য নেওয়ার ক্ষেত্রে এই উৎসগুলো গুরুত্বপূর্ণ। তবে একজন সাধারণ পাঠক চাইলেই সবগুলো উৎস থেকে উপকৃত হতে পারেন না। যেমন একজন সাধারণ পাঠক চাইলেই প্রাচীন কোনো পাণ্ডুলিপি বা ফরমানের পাঠোদ্ধার করতে পারবেন না। এজন্য তাকে গবেষকের শরণাপন্ন হতে হবে।

* * *

ইসলামের ইতিহাস পাঠের ধরন

ইসলামের ইতিহাস পাঠের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। এই বিষয়গুলো সামনে রাখলে প্রান্তিকতামুক্ত ইতিহাস পাঠ করা যাবে ইনশাআল্লাহ।

১. প্রয়োজন সামগ্রিক পাঠ

ইতিহাস একটি বিস্তৃত বিষয়। ব্যক্তির জীবনী বলি বা সাম্রাজ্যের ইতিহাস, কোনোকিছুর ব্যাপারেই আংশিক পাঠ কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। একটি ঘটনার সামগ্রিক পাঠ না করে শুধু একটি অংশ দেখেই সিদ্ধান্ত দিলে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুল প্রমাণিত হবে। কোনো অঞ্চল, ব্যক্তি বা শতাব্দীর ইতিহাস মূল্যায়ন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই এর সাথে প্রাসঙ্গিক সবগুলো বিষয় সামনে রাখতে হবে।

যদি কেউ হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জুলুম দেখে উমাইয়া শাসনকে মূল্যায়ন করতে চায়, তাহলে তার মনে হবে উমাইয়াদের পুরো শাসনব্যবস্থা ছিল জুলুমের শাসন। এ সময়ের মানুষের ন্যূনতম মৌলিক অধিকারগুলোও দেওয়া হচ্ছিল না। আবার কেউ যদি খলিফা মামুন কিংবা মুতাসিমের ওপর মুতাযিলা চিন্তার প্রভাব এবং তাদের হাতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের আলেমদের নির্যাতিত হওয়ার ঘটনাবলি পড়ে তাহলে তার মনে হবে আব্বাসি খলিফাদের কারোই আকিদা বিশুদ্ধ ছিল না। তাদের দ্বারা শুধু ভ্রান্ত ফিরকার লোকেরাই উপকৃত হয়েছে।

অথচ বাস্তবতা এমন নয়। হাজ্জাজের মতো জালেম প্রশাসক থাকলেও উমাইয়া শাসনের সার্বিক চিত্র এটি নয়। তাদের সময় নতুন নতুন ভূখণ্ড ইসলামের ছায়াতলে এসেছে। বিচক্ষণ ও সচেতন ঐতিহাসিক ইমাম যাহাবির বক্তব্য দেখুন। সেই সময়কাল সম্পর্কে নিজের মূল্যায়ন তিনি ব্যক্ত করেছেন এভাবে, সে সময় ইসলাম ও মুসলিমরা পরিপূর্ণ সম্মান ও ইলমের মাঝে দিন কাটাচ্ছিল। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল জিহাদের পতাকা। নববি সুন্নাহগুলো ছিল সবার মাঝে প্রসিদ্ধ। বিদআত ছিল পদদলিত। সত্য উচ্চারণকারীদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। ইবাদতগুজার বান্দায় জমিন ছিল ভরপুর। মানুষ বসবাস করছিল নিরাপদে। মাগরিব ও আন্দালুস সীমান্ত থেকে কারাখিতাই সাম্রাজ্য, হিন্দুস্তানের একাংশ থেকে হাবশা পর্যন্ত মুসলিম সেনারা অবাধে বিচরণ করতে থাকে।[৭১]

---

[৭১]. *তাজকিরাতুল হুফফাজ*, ১/২২৩।

আব্বাসি শাসনামলেও আমরা দেখি শাসকদের সবাই মামুন কিংবা মুতাসিমের মতো বিভ্রান্ত ছিলেন না। অনেক নেককার খলিফা শাসন করেছিলেন। খলিফা হারুনুর রশিদের মতো আব্বাসি খলিফাও সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন যিনি এক বছর হজ করতেন, এক বছর জিহাদ করতেন। ফলে মামুন কিংবা মুতাসিমের ইতিহাস পড়ে সব খলিফাকে মূল্যায়ন করা যাচ্ছে না।

এজন্য একজন ইতিহাস-পাঠকের প্রথম করণীয় হলো তিনি নির্মোহভাবে সামগ্রিক ইতিহাস পাঠ করবেন। আংশিক পড়েই কোনো সিদ্ধান্ত দিয়ে বসবেন না। ইতিহাসের সবগুলো অংশ পাঠ করে তবেই তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন, কারণ তখন তার সামনে সবগুলো বিষয় স্পষ্ট থাকবে এবং সামগ্রিক চিত্রটি ফুটে উঠবে।

২. ইতিহাসই চূড়ান্ত নয়

ইতিহাস আমাদের কিছু ঘটনাবলির বিবরণ জানায় মাত্র। ইতিহাস আমাদের ভালো মানুষের কথা জানায়, ইতিহাস আমাদের খারাপ মানুষের কথাও জানায়। ইতিহাস আমাদের জানায় তাদের সিদ্ধান্ত ও কর্মের কথা। তবে কোন কাজটি খারাপ আর কোন কাজটি ভালো সে বিষয়ে ইতিহাস চুপ থাকে । ইতিহাসের কাজ তথ্য সরবরাহ করা। সেটা বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব আপনার আমার।

অতীতের কোন কাজটি ভালো ছিল, আর কোনটি খারাপ ইতিহাস তা বলে দেবে না। কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের সাহায্যে আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোনটি গ্রহণীয় আর কোনটি বর্জনীয়। যদি ইতিহাসের কোনো ঘটনা দেখেই তাকে দলিল বানানো হয় তাহলে তা মারাত্মক ভুল হবে। কারণ ইতিহাস শুধু ঘটনাটি উল্লেখ করেছে, সেই ঘটনায় বর্ণিত কাজটি ঠিক হয়েছে নাকি ভুল হয়েছে তা উল্লেখ করেনি।

আজকাল এক নতুন ধারা চালু হয়েছে। কিছু হলেই ইতিহাসের কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা টেনে এনে দলিল বানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের বক্তব্য খতিয়ে দেখার প্রয়োজন দেখছে না কেউ।

এক সময় অনেকে বলে বেড়াত ইসলামে দূত হত্যা জায়েজ। দলিল হলো, সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ হালাকু খানের দূতকে হত্যা করেছেন। এই এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা দিয়ে এত বড় সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল অথচ আগে দেখা দরকার ছিল এ বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহ কী বলে। দেখা দরকার ছিল, সুলতান কুতুজের কাজটি ঠিক হয়েছে নাকি ভুল। ইতিহাসে সব ধরনের ঘটনাই আছে। সুলতান কুতুজ দূত হত্যা করেছিলেন এটা যেমন আছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসাইলামার দূতকে হত্যা না করে বলেছিলেন, 'দূত হত্যা বৈধ হলে তোমাদেরকে হত্যা করতাম,' এটাও আছে।

একটি ইসলামি দলে অমুসলিম সদস্য নেওয়া হয়েছে, ব্যস এটা বৈধ করার জন্য ইতিহাস থেকে দলিল টেনে দেওয়া হলো যে অনেক মুসলিম শাসক রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অমুসলিমদের নিয়োগ দিয়েছিলেন। তাদের এসব সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল কী ভুল ছিল, এবং এসব নিয়োগের ফলে ইসলামি সালতানাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কি না সেসবের কোনো বিশ্লেষণ নেই। শুধু উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া হলো। মুশকিল হলো, এসব রাজাবাদশাদের অনেকে তো ব্যাপক অশ্লীলতার সাথেও জড়িত ছিলেন। তাহলে সেটাও কি দলিল বানাতে হবে? ইতিহাস কাউকে আকিদা শেখায় না। বরং আকিদা দিয়ে ইতিহাসকে মাপতে হয়। ইতিহাসের কোনো ঘটনা থেকে শরিয়াহর বিধান প্রমাণিত হয় না। বরং শরিয়াহর বিধান বর্ণনা করে ইতিহাস থেকে এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনাগুলো খুঁজে নিতে হয়।

ইতিহাস সম্রাট আকবরের কর্মকাণ্ড জানিয়ে চুপ থাকে। এসব কর্মকাণ্ডকে মাপতে হয় কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের আলোকে।

ইতিহাসে কোনো বর্ণনা পেলেই যদি সেটাকে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক হয়, তাহলে নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়বে। মূলকথা হলো, ইতিহাসের ঘটনা থেকে বিধান সাব্যস্ত হয় না।

ইবনু খশশাব হাম্বলির মতো বিখ্যাত আলেম রাস্তায় দাঁড়িয়ে বানরের খেলা দেখতেন। এ থেকে সব আলেমের জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে বানরের খেলা দেখা ওয়াজিব হয়ে যায় না। শাজারাতুদ দুর মিশর শাসন করেছেন, এজন্য সবখানে মহিলাকে নেতৃত্বে বসিয়ে দেওয়া আবশ্যক হয়ে যায় না। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কাবা চত্বরে মিনজানিক থেকে পাথর ছুড়েছে, এজন্য অন্য শাসকদেরকেও এই কাজ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

ইতিহাসের কোনো বর্ণনা সামনে এলে প্রথমে দেখতে হবে বর্ণনাটি বিশুদ্ধ কি না। এরপর দেখতে হবে, এই ঘটনার শরয়ি অবস্থান কী। শরিয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকে কাজটি সঠিক নাকি ভুল। এরপর আসে এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণের বিষয়।

কিন্তু এখন এসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে না। ইতিহাসের বইপত্র খুলে নিজের পক্ষে দলিল বানানোর মতো ঘটনা খোঁজা হচ্ছে। আর ইতিহাসে এমন ঘটনার অভাব নেই। ফলে সবাই ইতিহাস থেকে নিজের পক্ষে দলিল খুঁজে পাচ্ছে।

এ এক নৈরাজ্যকর অবস্থা। এই নৈরাজ্যকর অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় হলো ইতিহাসকে চূড়ান্ত মনে না করা। ইতিহাসকে ইতিহাসের জায়গায় রেখে ফিকহের আলোকে নিজের কর্মপন্থা ঠিক করা। একটি সহজ মূলনীতি মনে রাখা যেতে পারে। আকিদা ও ফিকহের মানদণ্ডে ইতিহাসের যে অংশ উত্তীর্ণ, সেটুকুই কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণীয়, বাকিটুকু বর্জনীয়।

৩. তথ্য গ্রহণে সতর্কতা

আগেই বলা হয়েছে ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে শতভাগ বিশুদ্ধ তথ্য নেই। এখানে ভুল-শুদ্ধ নানা তথ্য মিশে গেছে। একইসাথে ঐতিহাসিকদের সবার বিশ্বস্ততা ও আমানতদারি এক নয়। আবার তাদের কেউ কেউ ছিলেন কোনো বিশেষ মতবাদ বা ঘরানা দ্বারা প্রভাবিত। ফলে তারা বিপরীত ঘরানার ব্যাপারে তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ি করেছেন। এখন তথ্য নেওয়ার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো মাথায় না রেখে ঢালাওভাবে তথ্য গ্রহণ করলে সমস্যা। আন্দালুসের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনুল ইজারির[৭২] কথা ধরা যাক। তার লিখিত ইতিহাসগ্রন্থ 'আল-বায়ানুল মুগরিবে' তিনি মুরাবিতিন সাম্রাজ্যের অনেক নিন্দা করেছেন এবং মুওয়াহহিদি সাম্রাজ্যের প্রশংসা করেছেন। এটি পড়ে কেউ যদি একে শতভাগ গ্রহণ করে নেয় তাহলে সমস্যা। কারণ তার এই মূল্যায়ন যথার্থ নয়। তিনি ব্যক্তিগত আবেগের কারণে মুরাবিতিনদের যথার্থ মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাদের অবদানকে খাটো করেছেন। এখন কেউ যদি 'আল-বায়ানুল মুগরিবে' বর্ণিত তথ্যের ওপর ভর করে মুরাবিতিনদের সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে চলে আসেন, তাহলে তিনি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। তাকে অবশ্যই এ ক্ষেত্রে শুধু ইবনুল ইজারির বক্তব্যের ওপর নির্ভর করা চলবে না। এমন আরেকটি উদাহরণ হলো ইবনু বতুতার সফরনামা। দিল্লি ভ্রমণকালে সুলতান মুহাম্মাদ বিন তুঘলকের সাথে তার মনোমালিন্য হয়েছিল। এর ফলে তিনি তার সফরনামায় মুহাম্মাদ বিন তুঘলকের বেশ নিন্দা করেছেন। এখন তার আলোচনা থেকেও মুহাম্মাদ বিন তুঘলক সম্পর্কে মূল চিত্র স্পষ্ট করা সম্ভব নয়। কারণ এখানে তিনি সত্য এড়িয়ে বিষোদগার করেছেন। ফলে আমাদেরকে ইতিহাসের অন্য সোর্স থেকেও মুহাম্মাদ বিন তুঘলক সম্পর্কে তথ্য নিতে হয়।

---

[৭২]. তার পুরো নাম আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মারাকিশি। তবে তিনি ইবনুল ইজারি নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি আন্দালুসের ইতিহাস জানার অন্যতম নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। ৬৯৫ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন। *আল-আলাম*, ৭/৯৫।

ইতিহাসের গ্রন্থগুলো যারা লিখেছেন তারা সব ঘটনা নিজের চোখে দেখেননি। বেশিরভাগ তথ্য তারা নানাজনের কাছে শুনে লিখেছেন। এই বর্ণনাকারীদের সবার স্তর একরকম নয়। আবার হাদিসশাস্ত্রের মতো সবাইকে মাপাও সম্ভব নয়। ফলে এখানে অনেক বাড়াবাড়িও চলে এসেছে। ইতিহাসের বইতে অনেক সময় বিভিন্ন সেনাবাহিনীর সেনাসংখ্যা কিংবা শহরের জনসংখ্যা উল্লেখে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। এমন সংখ্যা দেওয়া হয়েছে যা মোটেও বাস্তবসম্মত নয়। এখন ইতিহাস বইতে আছে বলেই যদি তা অন্ধভাবে বিশ্বাস করে নেওয়া হয় তাহলে তা ভুল হবে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে। সেই যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিতে হবে।

৪. অন্যায় পক্ষপাতিত্ব পরিহার্য

ইতিহাস আমাদেরকে সেসব বিবরণ শোনায় যা ঘটে গেছে। সুতরাং ঘটনা যেভাবে ঘটেছে সেভাবেই আমাদেরকে বিবৃত করতে হবে। পক্ষপাতিত্ব কিংবা বিরোধিতা করতে গিয়ে এসব ঘটনাকে ভিন্নভাবে বর্ণনা করার সুযোগ নেই। ঐতিহাসিক ও লেখকদের অনেকে পক্ষপাতিত্ব কিংবা বিরোধিতা করতে গিয়ে ইতিহাসের মূল ঘটনাকে বিকৃত করে ফেলেন। পক্ষপাতিত্বের কারণে তারা কারও শুধু একচেটিয়া প্রশংসাই করে যান, তার দোষগুলো আড়াল করেন, ফলে সঠিক চিত্রটি সামনে আসে না। কখনো আবার বিরোধিতা করতে গিয়ে শুধু তার দোষগুলোই সামনে আনেন, ভালো কাজগুলো আড়াল করে ফেলেন। দুটিই পরিত্যাজ্য। ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে কারও প্রতি পক্ষপাতিত্বের সুযোগ নেই। যার যা অবদান তা আলোচনা করতে হবে। তারপর বিশ্লেষণ করতে হবে তার এই অবদান উম্মাহর জন্য কতটুকু কল্যাণকর হয়েছিল।

সম্প্রতি ডক্টর মাহমুদ যিয়াদাহ রচিত 'আল-হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আল-মুফতারা আলাইহি' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এই বইতে লেখক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রতি বেশ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রতি অভিযোগ করা হয় তার অনেকগুলোই অসত্য ও আরোপিত। এখানে লেখক অযথা পক্ষপাতিত্ব করে ইতিহাসকে বিকৃত করতে চেয়েছেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জুলুম ও অত্যাচারের কথা সর্বজনস্বীকৃত। ইমাম যাহাবির মতো বিচক্ষণ ও সতর্ক ঐতিহাসিকও লিখেছেন, আল্লাহ তাকে ৯৫ হিজরিতে ধ্বংস করেছেন। সে ছিল জালেম, রক্তপিপাসু, নাসেবি, খবিস। তার কিছু ভালো কাজ থাকলেও তা ডুবে আছে তার পাপের সাগরে।[৭৩]

---

[৭৩]. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৪/৩৪৩। এ ছাড়াও হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের ব্যাপারে তুলনামূলক নির্ভরযোগ্য ও নিরপেক্ষ ইতিহাস বিস্তারিত জানতে দেখুন—

তো এমন একজন জালিমের পক্ষ টেনে বই লেখার মানেই হলো ইতিহাসকে বিকৃত করা। ডক্টর মুহাম্মাদ মুসা আশ-শরিফ বইটি সম্পর্কে নিজের মূল্যায়ন ব্যক্ত করেছেন এভাবে, এটি হলো একজন জালেমের পক্ষ টেনে অন্ধ পক্ষপাতিত্ব। এই কাজ আল্লাহ ও মুমিনদের রাগান্বিত করবে।[৭৪]

বনু উমাইয়ার পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়েও কেউ কেউ এমন পক্ষপাতিত্ব টেনেছেন। বনু উমাইয়ার অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে তারা জুলুম করে বসেছেন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ও আহলে বাইতের প্রতি। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন মুহিব্বুদ্দিন ইবনুল খতিব। আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিমের টীকা লিখতে গিয়ে তিনি মাদায়িনির বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মত দিয়েছেন। কিন্তু একই গ্রন্থের অন্যত্র তিনি মাদায়িনির বর্ণনা এনে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইরের ওপর প্রশ্ন তুলেছেন। অথচ বনু উমাইয়ার পক্ষপাতিত্ব করার চেয়ে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইরের মতো মহান একজন সাহাবির সম্মান রক্ষা করা বেশি জরুরি ছিল।

ইতিহাস পাঠের ক্ষেত্রে একজন পাঠককে এ বিষয়গুলো সচেতনভাবে এড়িয়ে যেতে হবে। লেখকের অন্যায় পক্ষপাতিত্ব ও বিরোধিতার জায়গা চিহ্নিত করে সেগুলো গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৫. ইতিহাসবিদদের লেখার ধরন বোঝা

প্রাচীন ঐতিহাসিক ও আধুনিক ঐতিহাসিকদের লেখার মধ্যে রয়েছে বড় ধরনের তফাত। এই তফাত ও ধরন না বুঝে এলোপাথাড়ি অধ্যয়ন করা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

এবার আমরা প্রসিদ্ধ কয়েকজন ঐতিহাসিক ও তাদের রচিত ইতিহাসগ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করব।

* * *

আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৯/১৩৭-১৫৮; *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ১২/১১৩-১৮৮; *ওফায়াতুল আইয়ান*, ২/২৯-৪৬; *তারিখুল ইসলাম*, ৫/৩১০-৩১৬, ৬/৩১৪-৩২৭।

৭৪. *দিরাসাতুন তারিখিয়্যাতুন মানহাজিয়্যাতুন নকদিয়্যা*, ৬৪।

ইবনু জারির তাবারি ও তারিখে তাবারি

‘তারিখে তাবারি’র আসল নাম ‘তারিখুল উমামি ওয়াল-মুলুক’। কিন্তু বইটি বিখ্যাত হয়ে উঠেছে এর লেখক তাবারির নামানুসারে। এটি এখন প্রসিদ্ধ ‘তারিখে তাবারি’ নামে। একে ‘তারিখুর রুসুল ওয়াল-মুলুক’ নামেও পরিচিত করা হয় কখনো কখনো। এই গ্রন্থের লেখক ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনু জারির বিন ইয়াযিদ তাবারি রহিমাহুল্লাহ। তিনি ছিলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের অনুসারী একজন আলেম। এই নামে শিয়াদের একজন আলেম ছিলেন। তার নাম আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির বিন রুস্তম তাবারি। অনেক সময় দুই তাবারিকে লোকে গুলিয়ে ফেলে। আমাদের আলোচ্য ইমাম তাবারি, যিনি কিনা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের আলেম ছিলেন তাকে অনেকে শিয়া মনে করে। ভুল করে তাকে শিয়া আলেম তাবারি মনে করে কেউ কেউ। কিন্তু তারা দুজন পৃথক ব্যক্তি। ইমাম যাহাবি রহিমাহুল্লাহ স্পষ্ট লিখেছেন, (তাকে শিয়া বলা) মিথ্যা ও অপবাদ। ইবনু জারির ইসলামের একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন।[৭৫] ইবনু জারির তাবারির জন্ম ২২৪ হিজরিতে[৭৬], তাবারিস্তানে। মিশর, সিরিয়া ও অন্যান্য এলাকায় সফর করে তিনি ইলম অর্জন করেন।[৭৭]

---

৭৫. *মিযানুল ইতিদাল*, ৩/৪৯৯।

৭৬. কেউ কেউ অবশ্য ২২৫ হিজরিও বলেছেন।

৭৭. ইমাম ইবনু জারির ত্ববারি রহ.-কে সে সময় বাগদাদের আকিদাকেন্দ্রিক ফিতনার সময় একদল তথাকথিত হাম্বলিরা অনেক হেনস্থা করেছিলেন। তাকে শিয়া অপবাদ দেওয়া হয়েছিল যেমনটি সুবিস্তর উল্লেখ করেছেন ইমাম যাহাবি, ইমাম ইবনু কাসির, ইমাম ইবনুল আসির ও ইমাম সালাহুদ্দিন আস-সাফাদি প্রমুখ। এ সকল তথাকথিত হাম্বলিকে ইমাম যাহাবি রহ. ‘মুতাআসসিবাতুল হানাবিলা’ তথা ‘গোড়াপন্থি হাম্বলি’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এবং ইমাম যাহাবি রহ. এও উল্লেখ করেন যে—

ولقد ظلمته الحنابلة.

নিশ্চয়ই (আশআরি আকিদাকে ইস্যু করে) হাম্বলিরা তার প্রতি জুলুম করেছে!

তবাকাতুল ফুকাহায়িশ শাফেইয়্যা, ১/১৩৩; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১১/১৪৫; *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, ৭/৮; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৪/২৭২-২৮২; *আল-ওয়াফি বিল ওফায়াত*, ২/২৮৪।

ইমাম ইবনু কাসির রহ.-ও তার ‘তবাকাতে’ কতিপয় কথিত আসারি ও হাম্বলি দাবিদারদের ইমাম তাবারির আশআরি আকিদাকে কেন্দ্র করে তাকে শিয়া অপবাদসহ অন্যান্য জুলুমের কথা উল্লেখ করে তাদের ‘মুতাআসসিব’ তথা গোড়াপন্থি হিসেবে ইশারা করে তিনি বলেন—

كان قد وقع بينه - الطبري - وبين الحنابلة أظنه بسبب مسألة اللفظ، واتهم بالتشيع، وطلبوا عقد مناظرة بينهم وبينه، فجاء ابن جرير لذلك ولم يجئ منهم أحد، وقد بالغ

শিক্ষাজীবন শেষে তিনি বাগদাদ আসেন। এখানেই অবস্থান করেন। এখানে তার সময় কাটে লেখালেখি, হাদিসের দরস ও ফতোয়া দিয়ে। লেখালেখি ও ইলমচর্চায় তিনি এত বেশি সময় দিতেন যে এই কারণে বিয়েও করতে পারেননি। ৩১০ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি অত্যন্ত নেককার ও যাহেদ একজন আলেম ছিলেন। সারা জীবন তিনি শাসকদের সংস্রব এড়িয়ে চলেছেন। তাদের থেকে দূরে থেকে নিজের মতো করে ইলমি খেদমত আনজাম দিয়েছেন। তাফসির, হাদিস, ফিকহ ও ইতিহাসশাস্ত্রে তার ছিল অসাধারণ দক্ষতা। তাফসিরে তিনি রচনা করেছিলেন 'তাফসিরে তাবারি' নামে সুবিশাল এক গ্রন্থ, আজও যা ইলমপিপাসুদের পিপাসা মিটাচ্ছে।

ইবনু জারির তাবারির অন্যতম শ্রেষ্ঠকর্ম বলে বিবেচিত হয় 'তারিখে তাবারি'। এই গ্রন্থে তিনি সৃষ্টির শুরু থেকে ৩০২ হিজরি পর্যন্ত সময়কালের ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করেন। এই কিতাবটি রচিত হয়েছি হিজরি সনের ধারাবাহিকতা অনুসারে। ইবনু জারির তাবারি তার নিজস্ব সনদে প্রতিটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অনেক সময় একই বিষয়ে বিপরীতমুখী দুটি বর্ণনাও এনেছেন।[৭৮]

কিতাবটির বৈশিষ্ট্য

১. প্রসিদ্ধ অন্য সকল ইতিহাসগ্রন্থের আগে রচিত হয়েছে এই বইটি। বলতে গেলে অন্য ইতিহাসগ্রন্থের চেয়ে এই বইটি সাহাবায়ে কেরামের সময়ের নিকটবর্তী। এই গ্রন্থের পূর্বে যে-সকল গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার কোনোটাই এত বিস্তৃত আকারে রচিত হয়নি। ফলে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা অনেকেই তার এই গ্রন্থটির ওপর নির্ভর করেছেন।

الحنابلة في هذه المسألة وتعصبوا لها كثيرًا، واعتقدوا أن القول بها يفضي إلى القول بخلق القرآن، وليس كما زعموا، فإن الحق لا يحتاط له بالباطل، والله أعلم.

তবাকাতুল ফুকাহায়িশ শাফেইয়্যা, ১/১৩৩।

৭৮. *ওয়াফায়াতুল আয়ান*, ৪/১৯১-১৯২; *তারিখু বাগদাদ*, ২/১৬২-১৭৩; *তবাকাতুল ফুকাহায়িশ শাফেইয়্যা*, ১/১৩৩; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১১/১৪৫; *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, ৭/৮; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৪/২৭২-২৮২; *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২/২৫২-২৫৩; *তারিখুল ইসলাম*, ৭/১৫৯-১৬১; *আল-ইবার ফি খবরি মান গাবার*, ১/৪৬০; *আল-ওয়াফি বিল ওফায়াত*, ২/২৮৪; *মুজামুল উদাবা*, ১৮/৪৭-৬৮; *তারিখে বাগদাদ*, ২/১৬৩-১৬৬; *তারিখু দিমাশক*, ১৮/৩৫৫-৩৫৭; *তবাকাতুশ শাফেইয়্যা*, ১/৯৯-১০০। এসব তথ্যসূত্রে মুরাজায়াত করলে উল্লিখিত বিষয়সহ ইমাম তাবারি, তার রচনা, ইলমি গভীরতা, ইলমের মাঝে নিমগ্নতা, ইলমের জন্য কষ্ট-মুজাহাদা, তার মর্যাদা ও উম্মতের মাঝে তার মাকবুলিয়াত সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যাবে।

২. এখানে প্রতিটি তথ্য বর্ণিত হয়েছে সনদ-সহকারে। ফলে যে-কেউ চাইলে সনদের মান যাচাই করে বর্ণনার শুদ্ধ্যশুদ্ধি নির্ণয় করতে পারবে।

৩. তাবারি প্রতিটি বর্ণনা হুবহু উদ্ধৃত করেছেন। নিজ থেকে কোনো অংশ সংযুক্ত করেননি।

৪. গ্রন্থের শুরুতে লেখক সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এরপর আম্বিয়ায়ে কেরাম, তাদের সমকালীন জাতি ও সাম্রাজ্যসমূহ, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ইত্যাদি আলোচনা করেছেন।

৫. নবিজির হিজরতের পর থেকে প্রতিটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন হিজরি সন অনুসারে। এভাবে ৩০২ হিজরি পর্যন্ত সময়কালের ঘটনাবলি ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন।

৬. বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুসারে তার আলোচনা কোথাও দীর্ঘ আবার কোথাও সংক্ষেপিত হয়েছে। কোথাও দেখা গেছে একটি বছরের আলোচনা তিনি প্রায় শতাধিক পৃষ্ঠা ধরে করেছেন, আবার কোথাও এক-দুই পৃষ্ঠাতেই সেরে দিয়েছেন।

৭. প্রতিটি বছরের আলোচনা শেষে সে বছর যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। অনেকক্ষেত্রে সে বছর বিভিন্ন এলাকায় নিযুক্ত প্রশাসকদের নাম উল্লেখ করেছেন, সে বছর হজ কাফেলার আমির কে ছিলেন তা উল্লেখ করেছেন। একইসাথে সে বছর সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধের ফলাফলও বর্ণনা করা হয়েছে।

৮. এই গ্রন্থে প্রচুর পত্রাবলি, কবিতা ও বক্তৃতা উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাবারি যেসব সোর্স থেকে এসব সংকলন করেছেন সেসব গ্রন্থের অনেকগুলোই কালের পরিক্রমায় হারিয়ে গেছে, ফলে গুরুত্বপূর্ণ এসব ঐতিহাসিক নথির জন্য সবাই এই গ্রন্থটির মুখাপেক্ষী।

সীমাবদ্ধতা

১. তাবারি শুধু বর্ণনা উদ্ধৃত করে ক্ষান্ত হয়েছেন। তিনি এসবের মান ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কিছুই বলেননি। তাবারি তার বইতে শিয়াদের অনেক জাল-বানোয়াট বর্ণনাও এনেছেন, যার ফলে সাধারণ পাঠক যারা সনদ সম্পর্কে অবগত নয়, কিংবা চাইলেই সনদের মান যাচাই করতে পারে না, তারা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ভুল ধারণা রাখার সুযোগ পাবে। ইবনু জারির তাবারি তার গ্রন্থে সব ধরনের বর্ণনা এনেছেন। এমনকি 'তারিখে তাবারি'র ভূমিকাতে তিনি নিজেও এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন এভাবে, আমার এই গ্রন্থে যেসব বর্ণনা

অবিশ্বাস্য মনে হবে সে ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এসব আমার বানানো নয়। আমার কাছে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে আমি সেভাবেই উল্লেখ করেছি।[৭৯]

এখানে স্পষ্টতই ইমাম তাবারি তার গ্রন্থে বর্ণিত তথ্য থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করেছেন। তার ভাষ্যমতে, তিনি যা পেয়েছেন তাই সংকলন করেছেন। তিনি কাজটি করেছেন সনদসহ, যার ফলে যার ইচ্ছা সে যাচাই করে নিতে পারবে।

মনে রাখতে হবে সময়টা ছিল হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ও চতুর্থ শতাব্দীর শুরু। মুসলিমবিশ্বে তখন জোরেশোরে চলছে ইলমচর্চা। সে সময়ের আলেমরা সবাই সনদসহ পর্যালোচনা করতে সক্ষম ছিলেন। সময়টা আমাদের যুগের মতো ছিল না, যখন মজবুত ইলমি ব্যক্তিত্বের শূন্যতা চলছে। সে সময় আলেমরা যে-কেউ চাইলে সনদ থেকে যাচাই করে নিতে পারতেন বিশুদ্ধ বর্ণনাটি। ইমাম তাবারি চেয়েছিলেন যত ধরনের বর্ণনা আছে সংকলিত হয়ে যাক, পরে এগুলো লোকে যাচাই করে নেবে। তিনি সংকলন করার মানে এই নয় যে প্রতিটি বর্ণনার সাথেই তিনি একমত। কারণ 'তারিখে তাবারি'-তে অনেক স্থানে একই বিষয়ে শতভাগ বিপরীত দুটি বর্ণনাও আছে। ইমাম তাবারি নিশ্চয় একই বিষয়ে বিপরীতমুখী দুটি মত রাখতেন না।

এই কথাগুলো বলতে হচ্ছে, কারণ আমাদের সমাজে একটি শ্রেণি গড়ে উঠেছে যারা নিজেদের অপব্যাখ্যা ও বিকৃত ব্যাখ্যার পক্ষে ইমাম তাবারি ও তার গ্রন্থকে ঢাল হিসেবে দাঁড় করাচ্ছে। সাহাবায়ে কেরামের সম্মানে আঘাত করার জন্য তারা তারিখে তাবারি থেকে খুঁজে খুঁজে শিয়াদের বিকৃত মিথ্যা ও অসত্য বর্ণনাগুলো বের করে নিয়ে আসছে। তারপর তারা বলে দিচ্ছে, দেখুন ইমাম তাবারির মতো মহান আলেমও সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে এমন সব কথা লিখেছেন। আমরা বললে দোষ কী?

তাদের এই বক্তব্যের পেছনে হয়তো তাদের নৈতিকতাবর্জিত কর্মপন্থা দায়ী অথবা তাদের অজ্ঞতা দায়ী। হয়তো তারা জেনে-বুঝেই ইমাম তাবারির নামে অপবাদ দিচ্ছে অথবা তারা ইমাম তাবারি ও তার ইতিহাসচর্চার ধরনটিই বুঝতে পারেনি। ইমাম তাবারি কোনো কথা লেখা মানে এটি বিশুদ্ধ হয়ে যায় না, কিংবা ইমাম তাবারি এটি বিশ্বাস করেন, এমনও হয় না। 'তারিখে তাবারি'-তে কোনো ইতিহাস দেখলে আগে সনদ দেখতে হবে। কারণ ইমাম তাবারি সনদ দিয়েছেনই তা যাচাই করার জন্য। ইমাম তাবারির এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ছিল সব ধরনের বর্ণনা একত্র করা, তার উদ্দেশ্য কখনোই এটি ছিল না, তার এসব

---

[৭৯]. *তারিখু তাবারি*, ১/৭-৮।

বর্ণনা ধার করে কেউ সাহাবায়ে কেরামের সম্মানে হামলা করুক, কিংবা তাদের ব্যাপারে আপত্তি জানাক।

'তারিখে তাবারি'-কে আমরা একটি ডাটাবুক হিসেবে ধরে নিতে পারি, যেখানে ভুল-শুদ্ধ, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সব ধরনের ডাটা এন্ট্রি দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে ডাটা নিতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই সতর্কতার সাথে নিতে হবে। 'তারিখে তাবারি' থেকে বর্ণনা নিতে হলে আমাদেরকে আগে এর সনদ দেখতে হবে। সনদ বিশুদ্ধ হলে তারপর তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

২. মুশাজারাতে সাহাবা কিংবা ফিতনার সময়ের বেশিরভাগ বর্ণনা তিনি এনেছেন মুহাম্মাদ বিন সায়িব কালবি,[৮০]

---

৮০. মুহাম্মাদ ইবনুস সায়িব আল-কালবি ৬০ হিজরিতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৬ হিজরিতে কুফাতেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাফসির ও আহলে আরবদের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বিশ্বাস ও চেতনায় তিনি সে সময় শিয়া বলেই বিবেচিত হতেন। তার বাবা সায়িব ও তার দুই ভাই উবাইদ ও আবদুর রহমান জংগে জামালে আলি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। তার বাবা সায়িব ইবনু বিশরকে ৭২ হিজরিতে সাহাবি যুবাইর ইবনুল আওয়ামের ছেলে মুসআব ইবনুয যুবাইরের সাথে হত্যা করা হয়। তিনি আবদুর রহমান ইবনুল আশআসের দলভুক্ত হয়ে উমাইয়াহদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও আক্রমণ করেছিলেন এবং ৮৩ হিজরিতে দাইর আল-জামাজিম (যা কুফা ও বসরার মাঝামাঝি স্থান) যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর তিনি তাফসির, আখবার ও আনসাবের ওপর মনোনিবেশ করলেন। এভাবে তিনি তাফসিরশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করলেন। ভিন্ন মতাদর্শী হওয়া সত্ত্বেও তার তাফসির সম্পর্কে রিজালশাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দিস ইবনু আদি রহ. আবু সালেহ থেকে বর্ণনা করেন—

وهو رجل معروف بالتفسير وليس لأحد تفسير أطول ولاَ أشبع مِنْهُ

কালবি হচ্ছেন তাফসিরশাস্ত্রে বেশ প্রসিদ্ধ, তার থেকে অধিক সুদীর্ঘ ও তৃপ্তিকারক তাফসির আর কারও নেই! *ওয়াফায়াতুল আয়ান*, ৪/৩০৯-৩১১; *তবাকাতুল কুবরা*, ৬/৩৫৯-৩৬০; *আল-মাআরেফ*, পৃ.২৯৮; *আল-কামেল ফি দুয়াফায়ির রিজাল*, ৬/১২০।

কিন্তু মুহাদ্দিসরা হাদিসশাস্ত্রে তাকে জইফ ও মাতরুক আখ্যায়িত করেছেন। এ ছাড়াও তিনি ইতিহাস ও তাফসিরে বহু জাল, দুর্বল ও বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করেছেন।

ইমাম যাহাবি রহ. তার ব্যাপারে বলেন—

العلامة الأخباري أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي المفسر. وكان أيضا رأسا في الأنساب إلا أنه شيعي متروك الحديث.

তিনি হচ্ছেন আল্লামা, ইতিহাস বিশেষজ্ঞ, মুফাসসির আবুন নাদর মুহাম্মাদ ইবনুস সায়িব ইবনু বিশর আল-কালবি। এবং তিনি ছিলেন 'আনসাব' তথা কুলজিশাস্ত্র ও বংশপরম্পরা শাস্ত্রের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। তবে তিনি শিয়া ও হাদিসশাস্ত্রে মাতরুক। *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৬/২৪৯।

উল্লেখ্য যে, তার পুত্র হিশাম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুস সায়িব (যাকে ইবনুল কালবিও বলা হয়) থেকেও ইমাম তাবারি 'তারিখুল মুলুকি ওয়াল-উমাম' গ্রন্থে বহু বর্ণনা এনেছেন। তিনিও নিজ পিতার মতোই ইতিহাসবিদ ও আনসাব বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এবং এ ব্যাপারে মুহাদ্দিস ও মুয়াররিখগণ তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তিনিও তার বাবার মতো মুহাদ্দিসদের নিকট হাদিসশাস্ত্রে সমালোচিত। ইমাম

সাইফ বিন উমর আসাদি[৮১],

দারা-কুতনি রহ.-সহ অন্যরা তার ব্যাপারে বলেন 'মাতরুকুল হাদিস'। ইমাম ইবনু আসাকির (রহ.) তার ব্যাপারে বলেন—

رافضي ليس بثقة .

তিনি রাফেযি, নির্ভরযোগ্য রাবি নন।

ইমাম যাহাবি রহ. তার ব্যাপারে বলেন—

العلامة الأخباري النسابة الأوحد أبو المنذر هشام بن الأخباري الباهر محمد بن السائب بن بشر الكلبي الكوفي الشيعي أحد المتروكين ، كأبيه .

তিনি হচ্ছেন আল্লামা, আখবারি (ঐতিহাসিক), নাসসাবাহ (আনসাব বিশেষজ্ঞ), অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী আবু মুনযির হিশাম যার বাবা হচ্ছেন, বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও বিদ্বান মুহাম্মাদ ইবনুস সায়িব ইবনু বিশর আল-কালবি আল-কুফির ছেলে। তিনিও তার বাবার মতো শিয়া ও মাতরুক রাবিদের অন্যতম ছিলেন। ইমাম ইবনু মাইন রহ. তার সমালোচনা করেছেন। ইমাম ইবনু হিব্বান রহ. তাকে শিয়াপ্রীতিতে অতিরঞ্জক ও তার ইতিহাসকে ভুলে-ভরা আখ্যায়িত করেছেন। তিনি ২০৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১০/১০১-১০২; *লিসানুল মিযান*, ৮/৩৩৮-৩৩৯; *আল-ইবার ফি খবরি মান আবার*, ১/২৭১; *আদ-দুয়াফা*, ৪/৭৮; *আল-মাজরুহিন*, ২/২৬৪, ৪৩৯; *আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল*, ২/৩১; *মিযানুল ইতিদাল*, ৪/৩০৪; *তারিখুল ইসলাম*, ৫/২১১; *তারিখু দিমাশক*, ১৬/৭০।

বি.দ্র. মাতরুক বলা হয়—

مَتْرُوكُهُ مَا وَاحِدٌ بِهِ انْفَرَدْ *** وَأَجْمَعُوا لِضَعْفِهِ فَهْوَ كَرَدْ.

যে হাদিস একাই কোনো রাবি বর্ণনা করেছেন, যার দুর্বলতার ওপর সবাই একমত, তাই 'মাতরুক' বা পরিত্যক্ত। *আল-মানজুমাতুল বাইকুনিয়াহ*, ১।

অর্থাৎ এটি এমন হাদিস যা একক সূত্রে কোনো অত্যধিক দুর্বল রাবি থেকে বর্ণিত হয়, এবং রাবির দুর্বলতা মূলত তার প্রতি হাদিস মিথ্যা বলার অভিযোগ থাকার কারণে হয় অথবা হাদিস বর্ণনায় প্রচুর ভুল ও সাংঘাতিক অন্যমনস্ক থাকার কারণে তাকে মাতরুক তথা পরিত্যক্ত বলা বলা হয়। *তাদরিবুর রাবি*, ১/২৪০; *আত-তাইসির ওয়াত-তাসিল*, ১৮৮; *আল-কলায়িদুল আনবারিয়া*, ১০৫; *কফউল আসার*,৭৬।

[৮১]. সাইফ ইবনু উমর আত-তামিমি হচ্ছে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি কুফাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে ২০০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন—

كان سيف بن عمر يروي الموضوعات عن الأثبات وقالوا إنه كان يضع الحديث واتهم بالزندقة

সাইফ ইবনু উমার হাদিসশাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের থেকে অনেক মাওজু হাদিস বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিসরা বলেন, তিনি হাদিস জাল করতেন এবং তার ব্যাপারে যান্দাকাহ তথা শরিয়তবিরোধী বহু কাজ করার অভিযোগ রয়েছে। তাকে ইমাম হাকেমও যান্দাকাহর অভিযোগ করেন। ইমাম ইবনু আদি রহ. বলেন—

بعض أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة لم يتابع عليها.

তার বর্ণিত কিছু হাদিস বেশ প্রসিদ্ধ, এবং তার বর্ণিত অধিকাংশ হাদিসই অগ্রহণযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য।

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাইন রহ. বলেন—

ضعيف الحديث فليس فيه خير.

আবু মিখনাফ[৮২] প্রমুখ মিথ্যাবাদী ও দুর্বল বর্ণনাকারীদের থেকে। ফলে 'তারিখে তাবারি'র এই অংশে যেসব বর্ণনা এসেছে তার বেশিরভাগই নির্ভরযোগ্য নয়।

তিনি জইফুল হাদিস, তার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই! (দুয়ারির বর্ণনায় 'তার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই' এই অংশটুকু নেই।)
ইমাম ইবনু আবি হাতেম বলেন—

متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدي.

তিনি মাতরুকুল হাদিস, তার বর্ণিত হাদিসসমূহ (প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও সিরাত বিশেষজ্ঞ) ওয়াকেদির মতোই (জাল ও দুর্বলতায় ভরা)। ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন—

ليس بشئ كذاب.

তিনি কিছুই না, মিথ্যুক!

ইমাম নাসায়ি, ইমাম দারা-কুতনি ও ইমাম ইবনুস সাকান রহ.-সহ অন্য মুহাদ্দিসরা তাকে জইফ বলেছেন। তথ্যসূত্র : *আল-জারহু ওয়াত-তাদিল*, ৪/২৯৫-২৯৬; তরজমা, ১১৯৮; *আল-কামিল*, ৩/৪৩৫-৪৩৬; *আদ-দুয়াফা ওয়াল-মাতরুকিন*, তরজমা, ২৫৬; *তারিখে ইবনু মাইন* (দুয়ারির সংকলন) ২/২৪৫; *সুয়ালাতুল আজুররি*, ৫/৪৩; *আদ-দুয়াফা ওয়াল-মাতরুকিন*, তরজমা, ২৮৩; *আল-মাজরুহিন*, ১/৩৪৫; *তাহযিবুল কামাল*, ১২/৩২৬; *তাহযিবুত তাহযিব*, ৪/২৯৫, ৫/২৫৯; *তাকরিবুত তাহযিব*, ১/৩৪৪; *মিযানুল ইতিদাল*, ২/২৫৫; *আল-ইসাবাহ*, ৩/২৩০।

তবে ইমাম ইবনু হিব্বান কর্তৃক তাকে যান্দাকাহর অভিযোগ দেওয়াকে সকল মুহাদ্দিস ইতিবাচক দৃষ্টিতে নেননি। যার কারণে ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রহ. বলেন—

أفحش ابن حبان القول فيه.

ইবনু হিব্বান তার ব্যাপারে উক্ত কথা আরোপ করে অধিক কদর্যপূর্ণ কাজ করেছেন। *তাকরিবুত তাহযিব*, ১/৩৪৪।

[৮২]. আবু মিখনাফ লুত ইবনু ইয়াহইয়া আল-কুফি ছিলেন অনেক ইতিহাস-সংক্রান্ত কিতাবের রচয়িতা। তবে তিনিও ইতিহাস সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও হাদিসশাস্ত্রে সমালোচিত একজন রাবি। উপরন্তু তিনি ছিলেন কট্টরপন্থি একজন শিয়া। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাইন রহ. তার ব্যাপারে বলেন—

ليس بثقة.

তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

ইমাম আবু হাতেম রহ. তাকে 'মাতরুকুল হাদিস' আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম ইবনু আদি রহ. বলেন—

وهو شيعي محترق.

তিনি কট্টরপন্থি শিয়া।

ইমাম দারা-কুতনি রহ. বলেন—

أخباري ضعيف.

দুর্বল (বর্ণনাকারী) ইতিহাসবেত্তা।

উপরোল্লেখিত প্রখ্যাত শিয়াপ্রেমিক হিশাম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুস সায়িব তথা ইবনুল কালবি তার থেকে প্রচুর ইলম আহরণ করেছে। ইমাম যাহাবি তাকে রাফেযি শিয়া আখ্যায়িত করেছেন। ১৫৭ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। *আল-জারহু ওয়াত-তাদিল*, ৭/১৮২, ৮/৩০৭; *আল-কামিল*, ৬/৯৩; *তাহযিবুল কামাল*, ৫/১৪৭; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৭/৩০১-৩০২, ১০/১০১-১০২; *মিযানুল ইতিদাল*, ৩/৪১৯-৪২০, তরজমা, ৬৯৯২ (হারফুল লাম), ৪/৫৭১; *তারিখুল ইসলাম*, ৯/৫৮১

৩. ইমাম তাবারি তার এই গ্রন্থে সকল ধরনের বর্ণনা সংকলন করেছেন। এমনকি একই বিষয়ে পরস্পরবিরোধী দুটি বর্ণনাও তিনি এনেছেন। কিন্তু কোনোটির শুদ্ধতার ব্যাপারেই তিনি নিজের কোনো মতামত দেননি। ফলে একজন সাধারণ পাঠককে খুবই বিপদে পড়তে হয় এসব ক্ষেত্রে। সে দেখে দুধরনের বর্ণনা এসেছে কিন্তু ইমাম তাবারি কোনোটিকেই প্রাধান্য দেননি। ফলে তার পক্ষে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হয় না। এটি গ্রন্থটির একটি বড় ধরনের ত্রুটি।

৪. বেশিরভাগ ঘটনা অতিরিক্ত দীর্ঘ করে আলোচনা করা হয়েছে। পাঠকের জন্য মনোযোগ ধরে রাখা অনেক সময় কষ্টকর হয়ে ওঠে।

তবে সবকথার পরেও এটিই বলতে হয়, 'তারিখে তাবারি' ইতিহাসের এমন একটি অসামান্য সংকলন, কোনো গবেষকই এটি থেকে নিজেকে অমুখাপেক্ষী রাখতে সক্ষম নয়। তাকে এর সাহায্য নিতে হবেই। সম্প্রতি দার ইবনু কাসির থেকে 'তারিখে তাবারি'র নতুন সংস্করণ এসেছে 'সহিহ তারিখু তাবারি' ও 'জয়িফ তারিখু তাবারি' নামে। এখানে বিশুদ্ধ ও দুর্বল বর্ণনাগুলো আলাদা করে দেওয়া হয়েছে ফলে সাধারণ পাঠকরাও এখন এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

তারিখুত তাবারি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মূল্যায়ন

১। খতিব বাগদাদি বলেন, ইবনু জারির তাবারির প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো 'আখবারুল উমাম ওয়া তারিখুহুম'।[৮৩]

(হারফুল লাম); *লিসানুল মিযান*, ৭/১০৪, তরজমা, ১১১৬; *ফাওয়াতুল ওফায়াত*, ২/২৩৮, তরজমা, ৪০৫ (হারফুল লাম)।

হজরত আমিরে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধাচরণ, কারবালার ইতিহাসে অনির্ভরযোগ্য বিবৃতি বর্ণনা করায় শিয়াদের মুজতাহিদ ও ইমাম কর্তৃক তিনি বেশ প্রশংসিত হয়েছেন এমনকি তাকে শিয়া প্রমাণ করতে শিয়া ও রাফেযিদের ঐতিহাসিক ও রিজালশাস্ত্রবিদরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের হাওয়ালায় উদ্ধৃতি নকল পর্যন্ত করেছে। বিস্তারিত দেখুন শিয়াদের সে সকল কিতাবাদিতে—
রিজালুন নাজাশি, নাজাশি, পৃ. ৩২০; *আল-ফিহরিসত*, শাইখ আত-তুসি, ২০৪; *রিজালুত তুসি*, শাইখ আত-তুসি, ৮১, তরজমা, ৭৯৬; *খুলাসাতুল আকওয়াল*, হুলি, ২৩৩; *রিজালু ইবনি দাউদ*, ইবনু দাউদ আল-হুলি, পৃ. ১৫৭, তরজমা, ১২৫১; *নকদুর রিজাল*, তাফরিশি, ৪/৭৪-৭৫, তরজমা, ৪৩০৬; *জামেউর রুয়াত*, মুহাম্মাদ আলি আল-উরদবিলি, ২/৩৩; *তরায়িফুল মাকাল*, সাইয়েদ আলি আল-বারুজারদি, ১/৫৬৬, তরজমা, ৫৪০২, ২/৬৩, তরজমা, ৭১৭৪; *মুজামু রিজালিল হাদিস*, সাইয়েদ খুওয়াই, ১৫/১৪০-১৪২, তরজমা, ৯৭৯২; *আল-মুফিদু মিন মুজামি রিজালিল হাদিস*, জাওহারি, পৃ. ৪৭৬, তরজমা, ৯৭৬৯, ৯৭৭২, ৯৭৯২।

৮৩. *তারিখু বাগদাদ*, ২/১৬২। খতিব বাগদাদি রহ.-এর বক্তব্য হচ্ছে—

وله الكتاب المشهور في أخبار الأمم وتاريخهم.

২। ইবনু খাল্লিকান বলেন, 'তারিখুত তাবারি' সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও সমৃদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ।[৮৪]

৩। ইয়াকুত হামাবি বলেন, এই গ্রন্থে তিনি জ্ঞানের অনেক বিষয়, দ্বীনি ও দুনিয়াবি, লিপিবদ্ধ করেছেন।[৮৫]

খতিব বাগদাদি ও তারিখু বাগদাদ

খতিব বাগদাদি ছিলেন স্বীয় যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমদের একজন। ৩৯২ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হাদিসশাস্ত্রে তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন শাফেয়ি মাজহাবের অনুসারী। নানা বিষয়ে তিনি প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন। ৪৬৩ হিজরিতে তিনি বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন।[৮৬]

খতিব বাগদাদির সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ হলো 'তারিখু বাগদাদ'। এই গ্রন্থে তিনি একইসাথে বাগদাদ শহরের ইতিহাস এবং এখানে অবস্থানকারী আলেম ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের জীবনী আলোচনা করেছেন। জীবনী-সংকলন হলেও এতে ইলমের নানা শাস্ত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বর্ণনা একত্র করা হয়েছে।

ডক্টর বাশশার আওয়াদ মারুফ সম্প্রতি এই কিতাবটি তাহকিক করে প্রকাশ করেছেন। তার তাহকিকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, বাগদাদের আলেমদের জীবনী নিয়ে লিখিত এটিই প্রথম কিতাব যা আমাদের সামনে আছে। পরবর্তীকালে যারাই এ বিষয়ে কলম ধরেছেন সবার উৎস হিসেবে কাজ করেছে এই বইটি।

কিতাবটির বৈশিষ্ট্য

১। কিতাবটির প্রথম খণ্ডে খতিব বাগদাদি আলোচনা করেছেন বাগদাদ শহর সম্পর্কে। ধারাবাহিক আলোচনায় তিনি তুলে ধরেছেন বাগদাদ শহর

---

৮৪. *ওফায়াতুল আইয়ান*, ৪/১৯১। ইবনু খাল্লিকানের এই বক্তব্য অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সামগ্রিক বিশুদ্ধতার বিচারে 'তারিখুত তাবারি'র অবস্থান বেশ নিচে।

৮৫. *সহিহ তারিখুত তাবারি*, ৯১।

৮৬. খতিব বাগদাদির বিস্তারিত জীবনী জানতে দেখুন, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৮/২৭০-২৯৭; *আল-মুনতাজাম*, ইবনুল জাওযি, ৮/২৬৫; *আল-মুসতাফাদ মিন যাইলি তারিখি বাগদাদ*, ইবনুদ দিমইয়াতি পৃ. ৫৭-৬০; *তাযকিরাতুল হুফফাজ*, ৩/১১৩৭-১১৪৩; *তবাকাতুশ শাফেইয়্যা*, সুবকি, ৪/৩০-৪৫; *তাবয়িনুল কাযিবিল মুফতারি*, ইবনু আসাকির, পৃ. ২৬৮-২৭০; *তাহযিবু তারিখি মাদিনাতি দিমাশক*, ইবনু আসাকির, ১/৪০০-৪০২ (তাহকিক ও তারতিব : আব্দুল কাদের বাদরান); *মুজামুল উদাবা*, হামাবি ৪/১৮-২৭; *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত*, সাফাদি, ৭/১৯৬; *ওয়াফায়াতুল আয়ান*, ইবনু খাল্লিকান, ১/৯৩ (তাহকিক : ইহসান আব্বাস, দারু সাদের, বৈরুত)।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এই শহরের রাস্তাঘাট, ইমারত, মসজিদ, লেক, হাম্মাম, সরাইখানা ইত্যাদির। একইসাথে তিনি বাগদাদ সম্পর্কে আলেম ও জ্ঞানীগুণীদের উক্তিগুলোও একত্র করেছেন। ফলে প্রথম খণ্ডটি হয়ে উঠেছে বাগদাদ শহর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নথি। ইংরেজি, ফরাসি ও অন্যান্য ভাষায় এই খণ্ডটি অনুবাদ হয়েছে।

২। কিতাবের শুরু করা হয়েছে যাদের নামের শুরুতে মুহাম্মাদ আছে তাদের নাম দিয়ে। খতিব বাগদাদি এমনটি করেছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার কারণে।

৩। খতিব বাগদাদি প্রতিটি বর্ণনার সাথে সনদ এনেছেন। ফলে সনদ দেখে যাচাই করার সুযোগ আছে।

৪। জীবনীর ফাঁকে ফাঁকে নানা শাস্ত্রের প্রচুর বইপত্রের নাম-তালিকা দিয়েছেন, যা থেকে ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রের এক বিশাল ভান্ডার সামনে চলে আসে।

৫। খতিব বাগদাদি শুধু একজন ঐতিহাসিকই ছিলেন না, বরং আল-জারহু ওয়াত-তাদিল শাস্ত্র সম্পর্কেও তিনি ছিলেন খুবই দক্ষ। এজন্য বিভিন্ন বর্ণনা সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট করে নিজের মন্তব্য ও মতামত দিয়েছেন। তার এসব মতামত পরবর্তীদের জন্য জরুরি প্রমাণিত হয়েছে। এমনকি ইমাম মিযযি রহিমাহুল্লাহ তার লিখিত 'তাহযিবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, তিনি 'তারিখু বাগদাদ' থেকে এমন প্রচুর মতামত নিয়েছেন।

সীমাবদ্ধতা

১। ইতিহাসের একটি বৃহৎ ও গ্রহণযোগ্য উৎস হওয়া সত্ত্বেও এই গ্রন্থে খতিব বাগদাদি অনেকের ব্যাপারে ইনসাফ করতে পারেননি। তিনি এমন কিছু বর্ণনা এনেছেন যা কোনো কোনো আলেমের জন্য মানহানিকর এবং শাস্ত্রীয় বিচারে অগ্রহণযোগ্য। বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফার ক্ষেত্রে বিষয়টি খুবই বিব্রতকর। খতিব বাগদাদি এই গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তার সম্পর্কে এমন কিছু বর্ণনা এনেছেন যা শাস্ত্রীয় বিচারে ভিত্তিহীন আবার ইমাম আবু হানিফার সম্মানের সাথেও মানানসই নয়। বিষয়টি এতটাই প্রকট হয়ে উঠেছে যে, সে যুগে এবং এ যুগে অনেকেই খতিব বাগদাদির এই বিষয়টি নিয়ে কলম ধরেছেন। ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন 'আস-সাহমুল মুসিব ফি বায়ানি তাআসসুবিল খতিব'। আল-

মালিকুল মুয়াজ্জম[৮৭] লিখেছেন 'আস-সাহমুল মুসিব ফি কাবিদিল খতিব'। আল্লামা যাহেদ কাউসারি রচনা করেছেন 'তানিবুল খতিব আলা মা সাকাহু ফি তারজামাতি আবি হানিফাতা মিনাল আকাজিব'।

ইবনু আসাকির ও তারিখু মাদিনাতি দিমাশক

সিকাতুদ্দিন আবুল কাসেম আলি বিন হাসান বিন হিবাতুল্লাহ আদ-দিমাশকি আশ-শাফেয়ি। সংক্ষেপে তিনি ইবনু আসাকির নামেই প্রসিদ্ধ। ৪৯৯ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হাদিস অন্বেষণে তিনি বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। তিনি প্রচুর বইপত্র লিখেছেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ হলো 'তারিখু মাদিনাতি দিমাশক' বা 'তারিখে দিমাশক'। ইবনু আসাকির ৫৭১ হিজরিতে দামেশকে ইনতিকাল করেন।[৮৮]

ইবনু আসাকিরের রচিত 'তারিখু মাদিনাতি দিমাশক' ইসলামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ৮০ খণ্ডের এই বইটি নির্দিষ্ট কোনো শহর ও এর অধিবাসীদের নিয়ে লেখা সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের ভূমিকায় ডক্টর সালাহুদ্দিন মুনজিদ লিখেছেন, দামেশকের জন্য গর্ব তাকে দেওয়া হয়েছে এমন এক গ্রন্থ যা কোনো ইসলামি শহর নিয়ে রচিত সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। এর লেখক ইসলামের প্রথম সারির আলেমদের একজন।

কিতাবটির বৈশিষ্ট্য

১। রচনাশৈলীর দিক থেকে এটি অনেকটা 'তারিখে বাগদাদ'-এর মতোই। এই গ্রন্থের শুরুতে ইবনু আসাকির দামেশক শহরের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। আলোচনা করেছেন দামেশক শহরের প্রতিষ্ঠাকালীন ঘটনাবলি।

---

[৮৭]. তিনি ছিলেন আইয়ুবি রাজবংশের একজন সুলতান। তিনি সিরিয়া শাসন করতেন। একজন আলেম ও সাহসী যোদ্ধা হিসেবে তার সুখ্যাতি ছিল। তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। দামেশকে তিনি মাদরাসাতুল মুয়াজ্জিমিয়্যা নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ৫৭৬ হিজরিতে তিনি কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনতিকাল করেন ৬২৪ হিজরিতে দামেশকে।
একজন আলেম ও সাহসী যোদ্ধা হিসেবে তার বেশ সুখ্যাতি রয়েছে। তিনি কুরআন কারিমের হাফেজ হওয়ার পাশাপাশি হানাফি মাজহাবের বিশিষ্ট ফকিহও ছিলেন।
ইলমুল আরুজ ও দিওয়ানে শেরসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তার রচিত কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। তার অনেক কীর্তির মাঝে অন্যতম কীর্তি হচ্ছে দামেশকের মাদরাসাতুল মুয়াজ্জিমিয়্যা প্রতিষ্ঠা করা।
মালিকুল মুআজ্জাম রহ.-এর মৃত্যুর পর তার পুত্র মালিক নাসির দাউদ রাজত্বের দায়ভার গ্রহণ করেন।
সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২২/১২০-১২২; আর-রাওদাতুল গান্নায়ি ফি দিমাশকিল ফাইহায়ি, নুমান আফান্দি, পৃ. ৫৬-৫৮। আল-আলাম, ৫/১০৭।

[৮৮]. তার বিস্তারিত জীবনীর জন্য দেখুন, *ওফায়াতুল আয়ান*, ৩/৩০৯।

২। ঘটনা ও বর্ণনাগুলো সনদসহ এনেছেন।

৩। অনেক ক্ষেত্রে সনদের মান নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সীমাবদ্ধতা

১। তার এই গ্রন্থেও কিছু বর্ণনা আছে যা বিশুদ্ধ নয়। সনদ যাচাই করে তা গ্রহণ করতে হয়।

২। বর্ণনাগুলো তিনি এনেছেন দীর্ঘ সনদসহ। ফলে সাধারণ পাঠকের জন্য এটি পাঠ করে উপকৃত হওয়া বেশ কষ্টসাধ্য।

ইবনুল আসির ও তার গ্রন্থ আল-কামিল ফিত-তারিখ

ইবনুল আসির জাযারি রহিমাহুল্লাহ। আরেকজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। ৫৫৫ হিজরিতে জাযিরা ইবনু উমরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইলমের অন্বেষণে তিনি মোসুল, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন সফর করেন। যৌবনে তিনি সালাহুদ্দিন আইয়ুবির সাথে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। তিনি আলেপ্পো সফরে গেলে সেখানে তার সাথে আরেকজন বিখ্যাত জীবনীকার ইবনু খাল্লিকানের সাক্ষাৎ হয়। জীবনের শেষদিকে তিনি মোসুলে এসে স্থায়ী হন। এখানে তিনি লেখালেখি করতে থাকেন। ৬৩০ হিজরিতে এখানেই তার ইনতিকাল হয়।

ইতিহাসশাস্ত্রে 'আল-কামিল ফিত-তারিখ' নামক গ্রন্থটি রচনা করে মুসলিম ঐতিহাসিকদের কাতারে তিনি নিজের নামটি সংযুক্ত করেছেন।[৮৯]

কিতাবটির বৈশিষ্ট্য

১। হিজরি সন অনুসারে সকল ঘটনা আনা হয়েছে। কোনো একটি বছরের আলোচনায় গেলে সে বছরে যা যা ঘটেছে সব বিস্তারিত পাওয়া যাবে। হিন্দুস্তান, আন্দালুস, মিশর কিংবা বাগদাদ সব এলাকার আলোচনাই এনেছেন তিনি। ফলে এই গ্রন্থ পড়তে গেলে পাঠক এক বছরে কী কী ঘটেছে তার

---

[৮৯]. ইমাম ইবনুল আসির রহ. সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন—
ওয়াফায়াতুল আয়ান, ৩/৩৪৮; *উসদুল গাবাহ*, ইবনুল আসির, ১/৭, দারুল ফিকর, বৈরুত; *আল-আলাম*, যিরিকলি, ৮/৩১; *শাজারাতুয যাহাব*, ইবনুল ইমাদ, ৫/১৮৬; *মুজামুল মুআল্লিফিন*, উমর রেজা কাহহালা, ১৩/৯৮; *ইনবাহুর রুয়াত আলা আনবাহিন নুহাত*, জামালুদ্দিন কিফতি, ৩/২৫৭, তরজমা, ৭৪১; *আল-ইবার ফি খবরি মান গাবার*, যাহাবি, ৩/১৪৩; *আন-নুজুমুয যাহিরাহ ফি মুলুকি মিসর ওয়াল-কাহিরাহ*, ইবনু তাগরি বারদি আল-হানাফি, ৬/১৯৮।

সামগ্রিক চিত্র পেয়ে যাবেন। বা কারও যদি কোনো বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে জানা দরকার হয় তাহলে তিনি নির্দিষ্ট সনের আলোচনা খুললেই তা পেয়ে যাবেন।

২। 'আল-কামিল ফিত তারিখ'-এ তিন ধরনের বর্ণনা দেখা যায়। হারুনুর রশিদের সময়কাল পর্যন্ত যে আলোচনা তার বেশিরভাগ তিনি নিয়েছেন 'তারিখে তাবারি' থেকে। এর পরের আলোচনাগুলো নিয়েছেন ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে। তার জীবদ্দশায় যেসব ঘটনা ঘটেছে এগুলো হয়তো তিনি নিজে দেখে লিখেছেন, অথবা কারও মুখে শুনে লিখেছেন।

৩। এই বইতে সাধারণত তিনি কোনো বর্ণনার সনদ আনেননি।

৪। প্রতি বছর যেসব ব্যক্তিত্ব মারা গেছেন তাদের নামের তালিকা দিয়েছেন।

৫। লেখার ধরন আকর্ষণীয়। ফলে পাঠক আগ্রহ ধরে রাখেন।

৬। তিনি শুধু ঘটনা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি। অনেক জায়গায় তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। শাসকদের নানা দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন আব্বাসি খলিফা নাসির লি দ্বীনিল্লাহর জীবনী লেখার সময় তিনি তার অত্যাচারের আলোচনা করেছেন। কোথাও কোথাও তিনি ইতিহাসের ঘটনাবলি থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা নিয়েও আলোচনা করেছেন।

সীমাবদ্ধতা

১। ইবনুল আসির সব ধরনের বর্ণনাই এনেছেন। তার এই গ্রন্থে প্রচুর জাল ও বানোয়াট বর্ণনাও আছে। এগুলোর মান সম্পর্কে তিনি কোনো মন্তব্যই করেননি।

২। ইতিহাস লেখার সময় তিনি সনদ উল্লেখ করেননি। ফলে তার এসব তথ্য যাচাই করাও কঠিন হয়ে পড়েছে।

৩। সমকালীন শাসকদের মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও তিনি কঠোরতা করেছেন। যেমন সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি সম্পর্কে তার মূল্যায়ন ছিল কঠোর। অনেক সময় তিনি কোনো শাসকের ওপর মূল্যায়ন করতে গিয়ে বাড়াবাড়িও করে ফেলেছেন। এক কথায় মানুষজন সম্পর্কে তার মূল্যায়ন শতভাগ ভারসাম্যপূর্ণ নয়। সেখানে বাড়াবাড়ির প্রভাব আছে। তবে এ থেকে একটা বিষয় বোঝা যায়। তা হলো তিনি তোষামোদ করতে পারতেন না। যা বিশ্বাস করতেন তাই বলতেন বা লিখতেন। এ ক্ষেত্রে কেউ তাকে প্রভাবিত করতে পারত না।

৪। মিশরে প্রতিষ্ঠিত উবাইদি সাম্রাজ্যের শাসকরা নিজেদের পরিচয় দিত ফাতেমি বলে। আলেমদের বেশিরভাগ তাদের এই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ তাদের এই বংশধারাকে সত্যায়নও করেছেন। ইবনুল আসির নিজেও উবাইদিদেরকে ফাতেমি বলার পক্ষে। কিন্তু বিষয়টি যদি শুধু বংশধারাতে সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে সমস্যা ছিল না। সমস্যা হলো ইবনুল আসির উবাইদিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। 'আল-কামিল ফিত-তারিখ'-এ তিনি উবাইদিদের ভালো দিকগুলোই শুধু আলোচনা করেছেন। তাদের মন্দ অপকর্ম ও জুলুমের ব্যাপারে সামান্য আলোচনাও আনেননি। অথচ উবাইদিদের কুফর ও জুলুম একটি সর্বজনস্বীকৃত বিষয়। ইমাম যাহাবি এ সম্পর্কে লিখেছেন, উবাইদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে মরক্কোর আলেমরা একমত। তারা উবাইদিদের মধ্যে এমনসব কুফর দেখেন যার ব্যাখ্যা করার কোনো অবকাশ নেই। এ বিষয়ে আমি অনেক ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। ইতিহাসের সকল ঘটনাই উবাইদিদের কুফরের পক্ষে মত দেয়। উবাইদুল্লাহর পুত্র কায়েসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অনেক আলেম খারেজি নেতা আবু ইয়াযিদের সাথেও ঐক্য করেন। তারা বলেন, যারা আহলে কেবলা নয় তাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য আমরা সকল আহলে কেবলা এক হয়ে লড়াই করতে পারি।[৯০]

---

[৯০]. আসলে উবাইদিরা নিজেদের ফাতেমি ও হাশেমি বংশ হিসেবে দাবি করে থাকে। কিন্তু তাদের এই দাবি মিথ্যা। কখনো তারা আবার দাবি করে থাকে দাওলুল আলাবিয়া। আল্লামা আবু শামাহ আল-মাকদেসি রহ. তাদের কুফরি নিয়ে বিস্তারিত আকারে বই লিখেছেন যার নাম 'কাশফু মা কানা আলাইহি বানু উবাইদ মিনাল কুফরি ওয়াল কাযিবি ওয়াল-মাকরি ওয়াল-কাইদি'। আল্লামা আবু শামাহ আল মাকদেসি রহ. তার কিতাবে তাদের ইহুদি, মাজুসি, বাতেনি ও মুলহিদ আখ্যায়িত করেন।

উবাইদি ফাতেমি সাম্রাজ্যের কুফরি নিয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন—*সিয়ারু আলামিন নুবালা,* ১৫/১৪১-১৯১; *তারিখুল ইসলাম,* ৩৯/২৭৫; *আর-রাওযাতাইন ফি আখবারিত দাওলাতাইন,* আবু শামাহ, ২/২১৬-২১৮; *তারিখুদ দাওলাতিল ফাতেমিয়া,* হাসান ইবরাহিম পৃ. ৩৪৯। *ওয়াফায়াতুল আয়ান,* ইবনু খাল্লিকান, ২/২০০; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ইবনু কাসির,* ১১/৩৮৬।

এদের ভয়ংকর আকিদার ব্যাপারে জানার জন্য সম্মানিত আলেমদের উদ্দেশে ইমাম যাহাবির 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হলো—

وعندما ادعى " عبيد الله " الرسالة أحضر فقيهين من فقهاء القيروان ، وهو جالس على كرسي ملكه ، وأوعز إلى أحد خدمه فقال للشيخين : أتشهدا أن هذا رسول الله ؟ فقالا : والله لو جاءنا هذا والشمس عن يمينه والقمر عن يساره يقولان : إنه رسول الله : ما قلنا ذلك ، فأمر بذبحهما .

সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৪/২১৭। তিনি আরও বলেন—

قلبوا الإسلام ، وأعلنوا بالرفض ، وأبطنوا مذهب الإسماعيلية...وأما العبيديون الباطنية : فأعداء الله ورسوله .

দুঃখজনক হলেও সত্য ইবনুল আসির তার গ্রন্থে উবাইদিদের এসব কুফর ও অপকর্ম সম্পর্কে কোনো আলোকপাতই করেননি। বরং স্থানে স্থানে তিনি উবাইদি শাসকদের সম্বোধন করেছেন 'আল-খলিফাতুল আলাবি' বলে, যেন তারা ইসলামের মহান কোনো শাসক। ইবনুল আসির শুধু উবাইদিদের ক্ষেত্রে পক্ষপাত করেছেন এমন নয় বরং তিনি বুয়াইহি ও হামদানিদের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত প্রশংসা করেছেন। অথচ এরা সবাই ছিল আহলুস সুন্নাহ বহির্ভূত, শিয়া সম্প্রদায়ের লোক। রুকনুদ্দৌলা হাসান বিন বুয়াইয়ের মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে তিনি লিখেছেন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'। অথচ এই ব্যক্তিকে আলেমরা অভিহিত করেছেন দ্বীন ও দুনিয়ার বিপদ নামে। মুইজ্জুদ্দৌলা বুয়াইহি যে কিনা বাগদাদে শিয়া মতবাদ প্রচার ও প্রসারে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে এবং আশুরা-সংক্রান্ত একের পর এক বিদআত চালু করেছে তার ব্যাপারেও ইবনুল আসির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

এটি অত্যন্ত বিস্ময়কর যে ইবনুল আসির উবাইদিদের অপকর্ম সম্পর্কে একেবারে নিশ্চুপ ছিলেন। অথচ তিনি এমন অনেক শাসকের সমালোচনা করেছেন বা দোষ বিচার করেছেন যারা সর্বদিক থেকে উবাইদিদের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। শুধু এই অংশ নয়, বরং হিজরি প্রথম শতাব্দীর ঘটনাবলি বিবরণের সময়ও তিনি শিয়াদের পক্ষ টেনে অদ্ভুত অদ্ভুত সব বর্ণনা এনেছেন যার কোনো ভিত্তিই নেই। এমন নয় যে ইবনুল আসির শিয়া ছিলেন বা শিয়া পরিবারের ছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আগাগোড়া সুন্নি পরিবারে। তার ভাই মাজদুদ্দিন আবুস সাআদাত ছিলেন একজন বিখ্যাত সুন্নি আলেম। তার লিখিত 'জামিউল উসুল' কিতাবটি বেশ বিখ্যাত। ইবনুল আসিরের পিতা ছিলেন জেংগি সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। ইবনুল আসির বসবাস করেছেন মোসুলে। এটি ছিল আগাগোড়া সুন্নি অধ্যুষিত এলাকা। ফলে একজন ইতিহাস পাঠকের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর অজানাই থাকে, ইবনুল আসির কেন অযথা শিয়াদের প্রতি অন্যায় পক্ষপাত দেখালেন।

ইবনুল আসির শিয়াদের প্রতি অন্যায় পক্ষপাত দেখালেও আহলুস সুন্নাহর অনেক কীর্তিমানের ব্যাপারে তথ্য চেপে গেছেন। যেমন আন্দালুসের শাসক আবদুর রহমান আন-নাসিরের জীবনীতে তার জিহাদি ত্যাগ ও বীরত্বের কিছুই তিনি উল্লেখ করেননি।

সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৫/৩৭৩।

ইমাম যাহাবি ও তারিখুল ইসলাম

হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবি। আসমাউর রিজাল শাস্ত্রের অবিস্মরণীয় কিংবদন্তি। ইতিহাসশাস্ত্রেও রয়েছে তার অসামান্য অবদান। ৬৩৭ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশোনা শেষ করে তিনি দামেশকে চলে আসেন, এখানে অবস্থান করে লেখালেখি ও দরস-তাদরিসে ব্যস্ত রাখেন নিজেকে। তার সম্পর্কে আল্লামা সাখাবি বলেছিলেন, হাদিস ও রিজালশাস্ত্রের ক্ষেত্রে মানুষ চার ব্যক্তির উত্তরসূরি। তারা হলেন, মিযযি, যাহাবি, ইরাকি ও ইবনু হাজার।[৯১]

ইমাম যাহাবি ইতিহাসশাস্ত্রে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'তারিখুল ইসলাম', 'দুওয়ালুল ইসলাম', 'আল-ইবার ফি খবারি মান গবার' ইত্যাদি। এ ছাড়া 'তাজকিরাতুল হুফফাজ', 'মিযানুল ইতিদাল', 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' ইত্যাদি গ্রন্থগুলোও হয়ে উঠেছে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। 'তারিখুল ইসলাম' গ্রন্থটি ইতিহাস বিষয়ে সুবিশাল একটি গ্রন্থ। তারিখে দামেশকের পর এটিই সবচেয়ে বৃহৎ গ্রন্থ ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে।[৯২] এই গ্রন্থে ৭০০ বছরের বেশি সময়ের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে।

---

[৯১]. ইমাম যাহাবি রহ. সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে তারই কিতাব 'সিয়ারু আলামিন নুবালা'—যেটির তাহকিক করেছেন ড. বাশশার আওয়াদ আল-মারুফ, তার মুকাদ্দামা ও ভূমিকা পড়া যেতে পারে।
এ ছাড়াও তার আরেকটি কিতাব 'মান তুকুল্লিমাফিহি ওয়া হুয়া মাওসুক আও সালিহুল হাদিস'—যার তাহকিক করেছেন শাইখ আবদুল্লাহ ইবনু জইফুল্লাহ আর-রাহিলি, এই কিতাবের মুকাদ্দামা ও ভূমিকাতেও তিনি ইমাম যাহাবির ব্যাপারে ইমামদের বক্তব্য উল্লেখ করে আলোচনা এনেছেন। এ ছাড়াও ইবনু শাকের আল-কুতবি তার 'ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত' গ্রন্থে—যার তাহকিক করেছেন শাইখ ইহসান আব্বাস (প্রকাশ : দারু সাদির, বৈরুত), ইমাম তাজুদ্দিন আস-সুবকি তার 'তবাকাতুশ শাফেইয়াতিল কুবরা' গ্রন্থে—যার তাহকিক করেছেন মাহমুদ তনাহি, ইমাম সুয়ুতি রহ. তার 'তবাকাতুল হুফফাজ' গ্রন্থে (প্রকাশ : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত), আল্লামা মারয়ি ইবনু ইউসুফ আল-হাম্বলি তার 'আশ-শাহাদাতুয যাকিয়্যাহ ফি সানায়িল আয়িম্মাতি আলা ইবনু তাইমিয়া' গ্রন্থে—তাহকিক করেছেন নাজম আবদুর রহমান খলাফ (প্রকাশ : দারু ফুরকান, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত), আল্লামা শাওকানি তার 'আল-বাদরুত তলি বি মাহাসিনি মিন বাদিল কারনিস সাবি' গ্রন্থে (প্রকাশ : দারুল মারেফাহ, বৈরুত) ইমাম যাহাবির ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।
এ ছাড়াও খাইরুদ্দিন যিরিকলি তার 'আল-আলাম' (৫/৩২৬) গ্রন্থেও ইমাম যাহাবির কিছু আলোচনা এনেছেন।

[৯২]. দারুল ফিকর থেকে 'তারিখু মাদিনাতি দিমাশক'-এর যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তা ৮০ খণ্ড। এর মধ্যে ৭৬ খণ্ড মূল বই। বাকি চার খণ্ড সূচিপত্র। অপরদিকে আবদুস সালাম তাদমুরির সম্পাদনায় 'তারিখুল ইসলাম'-এর যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তা মোট ৫৩ খণ্ড।

কিতাবটির বৈশিষ্ট্য

১। এখানে তিনি জীবনী ও ইতিহাসকে আলাদা স্তরে বিন্যাস করেছেন। প্রথমে কয়েক বছরের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। এরপর সেই কয়েক বছরে যারা মারা গেছে তাদের জীবনী আলোচনা করেছেন। ফলে এখানে ইতিহাস ও আসমাউর রিজাল দুটি সম্পর্কেই জ্ঞানলাভ করা যায়।

২। অনেক জায়গায় তিনি বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। এর শুদ্ধ্যশুদ্ধি নিয়ে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

৩। ইমাম যাহাবি ছিলেন অত্যন্ত গভীর ইলমের অধিকারী ও ভারসাম্যপূর্ণ মেজাজের অধিকারী। এই গ্রন্থে তিনি নানা বিষয়ে ভারসাম্যপূর্ণ নির্মোহ পর্যালোচনা করেছেন। যা একটি বিষয়ের সঠিক চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরতে সহায়ক।

৪। অন্য ঐতিহাসিকদের মতো সব ধরনের বর্ণনা আনার পরিবর্তে তিনি বর্ণনাগুলো যাচাই করে বিশুদ্ধ অংশকেই একত্র করেছেন। ফলে এই গ্রন্থ পাঠ করা তুলনামূলক নিরাপদ।

৫। এই গ্রন্থে একইসাথে তিনি সনদ, মতন ও ব্যক্তিকে পর্যালোচনা করেছেন। ফাঁকে ফাঁকে নিজের মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন। তার এসব মন্তব্যের আকার ছোট হলেও তাতে চলে এসেছে অনেক তথ্যের সারনির্যাস।

সীমাবদ্ধতা

১। বইটির কলেবর অনেক বড়, ফলে সকল ধরনের পাঠকের পক্ষে এই গ্রন্থ সংগ্রহ করা কঠিন।

২। বইতে ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে খুবই সংক্ষেপে। জীবনী অংশটি হয়েছে বেশি বিস্তৃত। এই গ্রন্থে ইতিহাসের চেয়ে জীবনীর আলোচনা বেশি।

ইবনু কাসির ও আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

‘আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া’ ইসলামের ইতিহাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এটি রচনা করেছেন হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসির দামেশকি রহ.। তিনি একাধারে মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ফকিহ ছিলেন। ৭০১ হিজরিতে তিনি সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ৭৭৪ হিজরিতে তিনি দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন।[৯৩]

কিতাবটির বৈশিষ্ট্য

১। নবিজির সিরাত নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রতিটি বর্ণনা সনদসহ এনেছেন। অনেক জায়গায় সনদের ওপর পর্যালোচনা করেছেন।

২। মুশাজারাতে সাহাবার বেশিরভাগ অংশ ‘তারিখে তাবারি’ ও ‘আল-কামিল ফিত-তারিখ’ থেকে নিয়েছেন। কিছু ক্ষেত্রে পর্যালোচনা করেছেন।

৩। উমাইয়া ও আব্বাসি শাসনামলের ইতিহাস তিনি সংক্ষিপ্ত আকারে এনেছেন। ‘তাবারি’ কিংবা ‘আল-কামিল’-এর মতো বিশদ বিবরণ দেননি।

৪। তাতারদের হাতে বাগদাদের পতন থেকে মামলুকদের উত্থান ও শাসন এই সময়কালের বিবরণ দিয়েছেন খুব বিস্তৃত পরিসরে। সম্ভবত এর কারণ হলো উমাইয়া ও আব্বাসিদের ইতিহাস নিয়ে বিস্তৃত বইপত্র আছে। কেউ বিস্তারিত জানতে চাইলে সেগুলো পড়ে নিতে পারবে। কিন্তু মামলুকদের আলোচনা নিয়ে তখনও তেমন কোনো কাজ শুরু হয়নি, তাই ইবনু কাসির তাদের ইতিহাস বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করাকে জরুরি মনে করেছেন।[৯৪]

---

[৯৩]. ইমাম ইবনু কাসির রহ. সম্পর্কে আরও সুবিস্তর জানতে পড়ুন—
তার ‘আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া’ কিতাবে তাহকিক ও তাখরিজকারীর পক্ষ থেকে সংযুক্ত ১ম খণ্ডের ৫ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে ১০ নম্বর পৃষ্ঠা পর্যন্ত। এবং এই কিতাবটি তাহকিক করে ছাপিয়েছেন কায়রোর দারুল হাদিস। এবং ড. মুহাম্মাদ আয-যুহাইলি ‘ইবনু কাসির আদ-দিমাশকি’ নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থেই তার সম্পর্কে সুবিস্তর আলোচনা এনেছেন। এ ছাড়াও আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন—
আল-মিনহালুস সাফি ওয়াল-মুসতাওফি বাদাল ওয়াফি, ইবনু তাগরি বারদি, ১/১৭৭, ৪১৬; *তবাকাতুল হুফফাজ*, সুয়ুতি, ১/১১২; *ইনবাউল গুমার ফি আবনায়িল উমার*, আসকালানি, ১/১২, ৩৯; *শাযারাতুয যাহাব*, ইবনুল ইমাদ, ৬/২৩১, ৭/৪৯; *তবাকাতুল মুফাসসিরিন*, দাওয়াদি, ১/১১১; *আদ-দারিস ফি তারিখিল মাদারিস*, নুয়াইমি, ১/৩৬; *তবাকাতুশ শাফেইয়্যা*, ইবনু কাজি শুহবাহ, ১/১৫৬; *আদ-দাউল লামি*, সাখাবি, ৩/২৫৪, ৯/২৫৫; *আল-আলাম*, যিরিকলি, ৭/২৭৪; *আদ-দুরারুল কামিনাহ*, আসকালানি, ৪/১৭; *যাইলু তবাকাতিল হুফফায*, সুয়ুতি, ৩৬১।

[৯৪]. মামলুকদের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনু তাগরি বারদি। তিনি ইবনু কাসিরের প্রায় এক শতাব্দী পর রচনা করেন ‘আন-নুজুমুয যাহিরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল-কাহিরা’ নামক গ্রন্থটি।

৫। প্রতি বছর যেসব আলেম মারা গেছেন তাদের জীবনী দেওয়া হয়েছে। তবে অনেকের জীবনী বাদও গেছে।

সীমাবদ্ধতা

১। সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাস অংশে অনেক দুর্বল ও বানোয়াট বর্ণনাও এনেছেন এবং এগুলোর মান নির্ণয় করে দেওয়া হয়নি।

২। ঘটনাবলির বর্ণনার ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি। কোনো ঘটনা খুব বড় পরিসরে আলোচনা করেছেন। কোনো ঘটনা সংক্ষিপ্ত পরিসরে। সিরাতুন্নবি ও সাহাবায়ে কেরামের অংশ তিনি বেশ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। উমাইয়া ও আব্বাসিদের অংশ করেছেন সংক্ষিপ্ত। আবার মামলুকদের অংশে এসে আলোচনা বেশ দীর্ঘই করেছেন।

ইবনু খালদুন ও তারিখে ইবনু খালদুন

মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইবনে খালদুনের অবস্থানটি অন্যদের চেয়ে ভিন্ন। তার হাত ধরে ইতিহাসশাস্ত্র পেয়েছে এক নতুন উচ্চতা যা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে অমুসলিম গবেষকরাও। তিনি ইতিহাস বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন যা সাধারণত তারিখে ইবনে খালদুন নামে অধিক পরিচিত। তবে বইটির মূল নাম হলো 'তারিখুল ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদি ওয়াল-খবর ফি আইয়ামিল আরব ওয়াল-আজম ওয়াল-বারবার'। এই বইয়ের ভূমিকা তিনি লেখেন অনেক বিস্তৃত আকারে যা আল-মুকাদ্দিমা নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এই গ্রন্থে তিনি ইতিহাসকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এর সমাজতাত্ত্বিক দিকটি স্পষ্ট করেছেন। গতানুগতিক ইতিহাস রচনার ধারাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন তিনি। ইবনে খালদুনের জন্ম ৭৩২ হিজরিতে। ইনতিকাল ৮০৮ হিজরিতে।

কিতাবটির বৈশিষ্ট্য

১। এই ইতিহাসগ্রন্থের শুরুতে ইবনু খালদুন সুবিশাল একটি ভূমিকা লিখেছেন, যেখানে তিনি ভূগোল, ইতিহাস, জাতিসমূহের উত্থান-পতনের সূত্রাবলি, সমাজ ও সংস্কৃতির ধারা ইত্যাদি নিয়ে এমন আলোচনা উপস্থাপন করেছেন যা তার আগে আর কেউ করেননি। এই একটি ভূমিকার কারণে 'তারিখে ইবনু খালদুন' প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে।

২। ইবনু খালদুনের বইটি অন্যদের বই থেকে আলাদা। তিনি অন্যদের মতো প্রতি বছর ধরে আলোচনা করেননি। তিনি নির্দিষ্ট একটি সাম্রাজ্য ধরে আলোচনা

শুরু করেছেন তারপর এই সাম্রাজ্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আলোচনা করেছেন। ফলে পাঠক অল্প পাঠেই নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ ও স্পষ্ট ধারণা পেয়ে যায়। অন্য ইতিহাস-বইগুলোর সমস্যা হলো সেখানে একটি সাম্রাজ্যের আলোচনা কয়েকটি বছরে ছড়িয়ে থাকে। এবং একইসাথে কয়েকটি সাম্রাজ্যের আলোচনা চলতে থাকে। কিন্তু তারিখে ইবনু খালদুনে এই সমস্যা নেই। ফলে পাঠক ধারাবাহিকভাবে পাঠ করে যেতে পারে। তার মন বিক্ষিপ্ত হয় না।

৩। লেখার ধরন খুবই সুন্দর। প্রতিটি ঘটনা তিনি একটি অপরটির সাথে নিখুঁতভাবে সংযুক্ত করে দিয়েছেন। ফলে পাঠকের কোনো বেগ পোহাতে হয় না।

৪। তথ্য আনার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ রেখেছেন। এমন অনেক বর্ণনা তিনি বাদ দিয়েছেন যা আগের ঐতিহাসিকরা এনেছেন। মুকাদ্দিমার শুরুতেও তিনি কিছু জাল ও বানোয়াট বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমন হারুনুর রশিদের বোন আব্বাসার সাথে উজির জাফর বারমাকির প্রণয় নিয়ে একটি বানোয়াট ঘটনা 'তারিখে তাবারি'-সহ অন্য অনেক ইতিহাসগ্রন্থে আছে। ইবনু খালদুন মুকাদ্দিমায় এই ঘটনার ওপর আপত্তি তুলেছেন এবং একে ভিত্তিহীন বলেছেন।

৫। অল্প পৃষ্ঠায় অনেক বেশি তথ্য এনেছেন। এটি সম্ভব হয়েছে তার নিখুঁত বিন্যাসের কারণে। একজন পাঠক অন্য ঐতিহাসিকদের বই ১০০ পৃষ্ঠা পড়ে যা জানবেন ইবনু খালদুনের বই ২০ পৃষ্ঠা পড়ে এর চেয়ে বেশি জানবেন।

৬। এই বইতে দুর্বল, বানোয়াট ও মিথ্যা বর্ণনার সংখ্যা খুবই কম। ফলে এটি হয়ে উঠেছে এমন একটি বই যে পাঠের পরামর্শ যে-কাউকে দেওয়া যায়।

সীমাবদ্ধতা

১। কোথাও কোথাও আলোচনা নীরস হয়ে উঠেছে, ফলে পাঠক আগ্রহ নাও পেতে পারেন। তবে শাস্ত্রীয় পাঠকরা ঠিকই এর গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

২। দুই-একটি জায়গায় ইবনু খালদুন তার ভিন্নমতের স্বাক্ষর দিয়েছেন যা আহলুস সুন্নাহর অন্য আলেমদের মতের বাইরে চলে গেছে।

ইমাম যাহাবি ও সিয়ারু আলামিন নুবালা

ইমাম যাহাবির আরেকটি জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ হলো 'সিয়ারু আলামিন নুবালা'। এটি একটি জীবনীগ্রন্থ। যুগ যুগ ধরে আলেম ও তালিবুল ইলমদের পিপাসা মিটাচ্ছে এই গ্রন্থ। যে দৃষ্টিকোণ থেকেই এই গ্রন্থ পড়া হোক, তা পাঠককে উপকৃত করবেই। যদি কেউ ইতিহাস জানতে চান তাহলে এখানে পাবেন ইতিহাসের এক বড় অংশ। যদি কেউ জরাহ তাদিল জানতে চান, তাহলে এই গ্রন্থে তিনি তা পাবেন। যদি কেউ ইবাদতের প্রতি আগ্রহী হতে চান তাহলে এই গ্রন্থ পাঠে তার সামনে সালাফদের ইবাদতের চিত্র ফুটে উঠবে। তিনি নিজে ইবাদতে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। যদি কোনো গবেষক এই গ্রন্থ পাঠ করেন তাহলে তিনি পাবেন জ্ঞানের নানা শাস্ত্র নিয়ে চিত্তাকর্ষক তথ্য।

কিতাবটির বৈশিষ্ট্য

১। অন্য জীবনীগ্রন্থগুলোর তুলনায় 'সিয়ারু আলামিন নুবালা'য় কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন এই গ্রন্থে লেখক জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে ইনসাফের সাথে আলোচনা করেছেন। কারও প্রতি অন্যায় পক্ষপাত দেখাননি, আবার কারও ব্যাপারে বাড়াবাড়িও করেননি। ইমাম যাহাবির এই ভারসাম্যপূর্ণ নীতির কারণে এই বইটি হয়ে উঠেছে অনন্য।

২। এই বইতে বিভিন্ন ঘটনা ও বক্তব্যের সনদ নিয়ে তিনি পর্যালোচনা করেছেন। প্রসিদ্ধ অনেক বানোয়াট ঘটনার স্বরূপ তিনি তুলে ধরেছেন। ভুলগুলো চিহ্নিত করে দিয়েছেন।

৩। এই বইতে নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণিকে প্রাধান্য না দিয়ে মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকিহ, সাহিত্যিক, সেনাপতি, শাসক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী সব পেশা ও শ্রেণির ব্যক্তিত্বদের জীবনী আনা হয়েছে। তবে বেশি আনা হয়েছে মুহাদ্দিসদের জীবনী। এর কারণ স্পষ্ট, রিজালশাস্ত্রের প্রতি ইমাম যাহাবির ছিল বিশেষ দুর্বলতা।

৪। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে ইমাম যাহাবি 'কুলতু' বলে নিজের কিছু মতামত, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। যা পাঠকের সামনে সঠিক বিষয়টি স্পষ্ট হতে সাহায্য করে।

ইবনুল ইমাদ হাম্বলি ও শাজারাতুয যাহাব

ইবনুল ইমাদের পুরো নাম আবদুল হাই বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ ইবনুল ইমাদ হাম্বলি। তিনি ছিলেন একইসাথে ফকিহ, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। দামেশকের সালিহিয়্যা অঞ্চলে ১০৩২ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের দীর্ঘ সময় তিনি কায়রোতে অবস্থান করেন। তিনি অনেক বইপত্র রচনা করেন। ১০৮৯ হিজরিতে হজের মৌসুমে মক্কায় তিনি ইনতিকাল করেন। তার লিখিত 'শাজারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব' একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।[৯৫]

কিতাবটির বৈশিষ্ট্য

১। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইবনুল ইমাদ হাম্বলির পর ইতিহাস নিয়ে বিস্তৃত কাজ আর কেউ করেননি। তার এই গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে মুসলমানদের ইতিহাসচর্চার একটি যুগের সমাপ্তি হয়। এই গ্রন্থে প্রায় ১০০০ হিজরি পর্যন্ত মোট ১০০০ বছরের আলোচনা সংক্ষিপ্তাকারে এসেছে। এক মলাটে এত বিস্তৃত সময়ের তথ্য আর কেউ আনেননি।

২। এই গ্রন্থে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও জীবনী দুটিই এসেছে।

৩। অল্প সময়ে ইতিহাসের বিশেষ কোনো ঘটনা ও ব্যক্তি সম্পর্কে জানার জন্য এই গ্রন্থটি অনেক সহায়ক।

---

[৯৫]. ইবনুল ইমাদের ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানার জন্য তারই রচিত 'শাযারাতুয যাহাব' কিতাব—যার তাহকিক করেছেন শাইখ মাহমুদ আরনাউত, (প্রকাশ : দারু ইবনি কাসির, দামেশক, বৈরুত) তার ভূমিকাতেই রয়েছে।

এ ছাড়াও তার ব্যাপারে আরও জানতে দেখুন—

মুহিব্বির 'খুলাসাতুল আসার ফি আয়ানিল কারনিল হাদি আশার', ২/৩৪০-৩৪১ (প্রকাশ : দারু সাদির, বৈরুত); যিরিকলির 'আল-আলাম', ৩/২৯০ (দারুল ইলম লিল মালাইন)।

আবদুর রহমান বিন হাসান আল-জাবারতি ও আজাইবুল আসার

গত তিন শতাব্দীতে যেসব মুসলিম ঐতিহাসিক ইতিহাস নিয়ে বিস্তৃত কাজ করেছেন তাদের মধ্যে আবদুর রহমান বিন হাসান আল-জাবারতির নাম সবার শীর্ষে। তিনি ১১৬৭ হিজরিতে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। ইলমি পরিবারে জন্মগ্রহণের সুবাদে বাল্যকাল থেকেই তার ইলমচর্চার পথ সুগম হয়েছিল। ১২৪১ হিজরিতে তিনি মারা যান। তার লিখিত ইতিহাসগ্রন্থের নাম 'আজাইবুল আসার ফিত-তারাজিমি ওয়াল-আখবার'।[৯৬]

কিতাবটির বৈশিষ্ট্য

১। এই গ্রন্থে লেখক হিজরি একাদশ শতাব্দীর পরের ঘটনাবলি লিখেছেন। এই গ্রন্থে ১১০০ হিজরি থেকে ১২৩৬ হিজরি পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলি লেখা হয়েছে।

২। বিশেষভাবে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে মিশর ও উসমানিদের ইতিহাস। তবে একইসাথে এসেছে নজদ, ইয়ামান, ফিলিস্তিন, হিজাজ ইত্যাদি অঞ্চলের ইতিহাসও।

৩। বেশিরভাগ ঘটনা তিনি বেশ বিস্তৃত পরিসরে এনেছেন। বিশেষ করে ফরাসিদের তৎপরতা ও উলামায়ে আজহারের ভূমিকার কথা তিনি এখানে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন।

---

[৯৬]. আবদুর রহমান আল-জাবারতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন—
যিরিকলির 'আল-আলাম', ৩/৩০৪; *আল-মাওসুআতুল আরাবিয়াহ*, ৭/৪৬৮; স্যামুয়েল মোরিয়ার তাহকিককৃত জাবারতির রচিত 'আজায়িবুল আসার' কিতাবের ভূমিকা; ড. আবদুর রহিম আবদুর রহমানের তাহকিককৃত 'আজায়িবুল আসার' কিতাবের ভূমিকা।

মুশাজারাতে সাহাবা বিপজ্জনক চোরাবালি

সহজ বাংলায় মুশাজারাতে সাহাবার অর্থ হলো সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও লড়াই। হজরত উসমান রা.-এর ইনতিকালের পর থেকে এই দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এ সময় মুসলিমবিশ্ব দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ছিলেন হজরত আলি রা., অন্যদিকে ছিলেন হজরত মুয়াবিয়া রা.। তাদের মধ্যে জংগে সিফফিন নামে বড় একটি যুদ্ধও হয় যেখানে দুই পক্ষের অনেকে নিহত হন। এ ছাড়া হজরত আয়েশা রা.-এর সাথেও হজরত আলি রা.-এর একটি যুদ্ধ হয় যা ইতিহাসে জংগে জামাল নামে পরিচিত। এই উত্তাল সময়কেই মুশাজারাতে সাহাবা বলা হয়।

মুশাজারাতে সাহাবা ইসলামের ইতিহাসের এক বিপজ্জনক চোরাবালি। এই চোরাবালির ফাঁদে পড়ে ডুবে গেছে অনেক বড় বড় ইসলামি ব্যক্তিত্ব। তাদের কলম হয়ে উঠেছে যোদ্ধাদের তরবারির চেয়েও হিংস্র ও ধারালো। তাদের কলম একের পর এক আঘাত হেনেছে সাহাবায়ে কেরামের সম্মানে। বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তারা সাহাবায়ে কেরামের মুবারক জামাতকে। গত শতাব্দীতে বেশ কয়েকজন ইসলামি ব্যক্তিত্ব এই পথে হেঁটেছেন। সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান ও সম্মানকে তারা নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। তারা চলে গেলেও রয়ে গেছে তাদের লেখা বইপত্র। এসব বইপত্রের অনেকগুলোই বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। সাধারণ লোকজন এসব বইপত্র পড়ছে, নানাভাবে তাদের মধ্যেও চিন্তাগত বিকৃতি প্রবেশ করছে। এজন্য মুশাজারাতে সাহাবার অংশ পাঠের কিছু উসুল বা মূলনীতি আমাদের জানা থাকা দরকার। এই মূলনীতি জানা থাকলে আমরা এই বিপজ্জনক চোরাবালি নিরাপদে পার হতে পারব ইনশাআল্লাহ।

মুশাজারাতে সাহাবা নিয়ে যারা অতিরিক্ত চর্চা করেন এবং এর ওপর ভর করে সাহাবায়ে কেরামের মুবারক জামাতকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা চালান তাদের পুরো প্রকল্পের মূল রসদ হলো ইতিহাসের বইপত্র। ইতিহাসের বইপত্র থেকে তারা এমন এমন বর্ণনা খুঁজে আনেন যেগুলো আলোচনা করলে সাহাবায়ে কেরামের চরিত্রের ওপর আঘাত করা সহজ হয়, তাদের কর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলা সহজ হয়। তাদের মূল শক্তি হলো ইতিহাসের এসব বর্ণনা। তারা বেশ জোরের সাথেই বলেন, ইমাম তাবারির গ্রন্থে এই বর্ণনা আছে, ইবনু খাল্লিকানের গ্রন্থে এই বর্ণনা আছে, তারা কি মিথ্যা লিখেছেন? আমরা তো তাদের থেকেই উদ্ধৃতি

করছি মাত্র। আমাদের যদি এতে দোষ হয় তাহলে তো ইমাম তাবারিকেও দোষারোপ করতে হবে।

যেহেতু তাদের মূল শক্তি ইতিহাসের কিছু বর্ণনা, ফলে এসব নিয়ে আমাদের পর্যালোচনা করতে হবে। পরবর্তী আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝে নিই।

১। অনেক সময় একটি ঘটনাকে ব্যক্তি নিজের অবস্থার ওপর বিবেচনা করে বিচার করে। দেখা যায় ঘটনাটি হয়তো ইতিবাচকই ছিল, কিন্তু ব্যক্তি নিজের মানসিকতার কারণে একে নেতিবাচক হিসেবে দেখেছে এবং অন্যের কাছে ব্যক্ত করেছে। অনেক সময় নিজের ঈমান-আকিদার দুর্বলতার কারণে এই সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। ধরা যাক, কারও চেহারায় ময়লা লেগে আছে। এখন সে নিজের সামনে আয়না ধরলে দেখবে সেখানে ময়লা দেখা যাচ্ছে। এই ময়লা দূর করতে হলে আগে তার নিজের চেহারা থেকে ময়লা সরাতে হবে। আয়নার দোষ দিয়ে লাভ নেই। মুশাজারাতে সাহাবা নিয়ে যারা ভুল ব্যাখ্যা করেন, তাদের অন্তরে ঈমান ও আকিদা দৃঢ় হয়নি। অর্থাৎ এটি তাদের নিজেদের কমজোরি, এর দায় সাহাবায়ে কেরামের ঘাড়ে তুলে লাভ নেই। এর সমাধান পেতে চাইলে আগে নিজের ঈমান-আকিদা পরিশুদ্ধ করতে হবে।

২। একটি ঘটনা বলে এটিকে নিজের মতো ব্যাখ্যা করে দেওয়া বোকামি। একটি ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে হলে এর সময়কাল, আশপাশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা জেনে সে অনুসারেই ব্যাখ্যা করতে হয়। ১৫০০ বছর আগের কোনো ঘটনা বর্তমান সময়ের মাপকাঠিতে রেখে বিবেচনা করলে ফলাফল যা আসবে তা বিশুদ্ধ হবে না, এটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ কোনো ঘটনা বিশ্লেষণ করতে হলে শুধু ঘটনাটি জানা থাকাই যথেষ্ট নয়, বরং ঘটনাটি নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণের যোগ্যতাও থাকতে হবে। সব মানুষের পড়াশোনা, জ্ঞান, বুদ্ধি ও মেধা এক পরিমাণের হয় না। ফলে দেখা যায় একটি ঘটনা নানাজন নানাভাবে ব্যাখ্যা করে বসে। অনেক সময় দেখা যায় তাদের এইসব ব্যাখ্যার সাথে মূল ঘটনার কোনো সম্পর্কই থাকে না।

৩। অনেকে মনে করেন ঐতিহাসিকরা কোনো ঘটনা উদ্ধৃত করা মানেই এটি শতভাগ সঠিক কিংবা ঐতিহাসিক নিজেও এর সাথে একমত। এটাই ভুল ধারণা। ইতিপূর্বে আমরা ইবনু জারির তাবারির বক্তব্য দেখিয়েছি 'তারিখুত তাবারি'র ভূমিকা থেকে। সেখানে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, তিনি শুধু ঘটনাগুলো উদ্ধৃত করেছেন মাত্র। সুতরাং 'তারিখে তাবারি'-তে কোনো বর্ণনা থাকা মানেই

এই নয় যে তাবারির এই বর্ণনা শতভাগ সঠিক কিংবা তাবারি নিজে এর সাথে শতভাগ একমত। সুতরাং ইতিহাসের এমন কোনো বর্ণনা যা সাহাবায়ে কেরামের শান ও মানের বিপরীত, তা দেখা মাত্রই গ্রহণ করা যাবে না। প্রথমে দেখতে হবে, এটির সনদ বিশুদ্ধ কি না। এরপর দেখতে হবে এটি আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক কি না। এই দুই স্তর পার না করে এসব বর্ণনা গ্রহণের সুযোগ নেই।

এই তিনটি বিষয় মাথায় রেখে এবার আমরা মুশাজারাতে সাহাবা-সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবেশ করব।

প্রেক্ষাপট

হজরত উসমান রা.-এর শাসনামল থেকেই শুরু হয় ফিতনার যুগ। এ সময় মুনাফিকদের চক্রান্তে মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ক্ষোভ, ধীরে ধীরে দানা পাকিয়ে ওঠে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে বিদ্রোহীদের মদিনায় প্রবেশ করে হজরত উসমান রা.-কে শহিদ করার মাধ্যমে। এরপর হজরত আলি রা.-এর শাসন শুরু হলেও সমস্যা কমেনি বরং ক্রমেই বাড়তে থাকে। এ সময় হজরত তালহা রা., হজরত যুবাইর রা., হজরত মুয়াবিয়া রা., হজরত আমর ইবনুল আস রা. এবং উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা.-সহ সাহাবিদের মধ্যে ইখতিলাফ শুরু হয়। তাদের এই ইখতিলাফ ছিল একান্তই দ্বীনি কারণে এবং সকলেই তাদের নিজ নিজ জায়গা থেকে দ্বীনি স্বার্থে ইজতিহাদ করছিলেন। কিন্তু সে সময় মুনাফিকরা ঘাপটি মেরে ছিল মুসলিম সমাজে এবং তারা নানাভাবে এই পরিস্থিতি থেকে ফায়দা লুটতে যাচ্ছিল। বিশেষ করে সাবায়িরা ছিল এই চক্রান্তের মূলে। তারা ঘটনার জটিলতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে যেমন কাজ করেছে তেমনই এসব ঘটনার পরে প্রচুর জাল বর্ণনা তৈরির মাধ্যমে সে সময়ের চিত্রায়ণটিই বদলে দিয়েছে। সাবায়িরা ইতিহাসের পাতায় পাতায় এত বেশি জাল বর্ণনা ছড়িয়ে দিয়েছে যার ফলে সে সময়ের সঠিক চিত্র অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন অসম্ভব তত্ত্বতালাশ ও অনুসন্ধান। সাবায়িদের এসব প্রোপাগান্ডার মোটিভ ও স্বরূপ না বুঝলে আমরা সে সময়কে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হব। জুলুম করে ফেলব সাহাবিদের ব্যাপারে।

সাবায়িদের এসব বর্ণনা মূলত দুধারী তলোয়ার। একদিকে তারা সাহাবায়ে কেরামকে কলুষিত করার জন্য একের পর এক বানোয়াট বর্ণনা বানিয়েছে, অপরদিকে কখনো কখনো তারা এমন ভাব দেখিয়েছে যেন তারা হজরত আলি রা.-এর প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তার আনুগত্য করতে সদা প্রস্তুত। তারা

একের পর এক মিথ্যা বর্ণনা তৈরি করার মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছে, হজরত উসমান রা.-কে হত্যাকারী ব্যক্তিরা হজরত আলি রা.-এর কাছের মানুষ। হজরত আলি রা. তার বিভিন্ন কাজকর্মে সাবায়িদের প্রাধান্য দিতেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসব বানোয়াট বর্ণনা তৈরির পেছনে সাবায়িদের উদ্দেশ্য ছিল দুটি। **এক.** প্রথমত তারা চেয়েছিল নিজেদেরকে আহলে হক প্রমাণ করতে। এজন্য তারা নিজেদেরকে হজরত আলি রা.-এর দলের দিকে সম্পৃক্ত করে। **দুই.** তারা চেয়েছিল অধিকাংশ সাহাবির চরিত্রে কালিমা লেপন করতে। তাই তারা এসব বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণ করতে চায় হজরত আলি রা. হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার পরেও অধিকাংশ সাহাবি তার হাতে বাইআত দেননি। এভাবে সাবায়িরা অধিকাংশ সাহাবির ওপর হক ত্যাগ ও দুনিয়া তালাশের মিথ্যা অভিযোগ তুলতে থাকে।[৯৭]

সাবায়িদের এই ষড়যন্ত্র অনেক অল্প জানা মুসলমানকে বিভ্রান্ত করেছে। তারা ধরে নিয়েছে হজরত আলি রা.-এর পক্ষে যারা ছিলেন তারা ছাড়া বাকি সবাই বিভ্রান্ত। পরে তারা বেছে নিয়েছে অন্য পক্ষের সাহাবায়ে কেরামকে গালিগালাজের পথ। আবার অনেকে চলে গেছেন আরেক প্রান্তে। তারা সাবায়ি বর্ণনায় প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, হজরত আলি রা.-এর সমর্থকরা ছিল সাবায়ি। ফলে তিনি হকের ওপর ছিলেন না। এই শ্রেণির লোকজন হজরত আয়েশা রা., হজরত উসমান রা., হজরত যুবায়ের রা., হজরত তালহা রা., হজরত মুয়াবিয়া রা.-এর পক্ষ নেয় এবং হজরত আলি রা.-কে একজন সাধারণ দুনিয়াদার শাসক হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করে।

প্রথম শ্রেণির লোকজন চলে গেছে রাফেজিদের দলে। পরের শ্রেণির লোকজন চলে গেছে নাসিবিদের দলে।[৯৮] নাসিবিদের মানসিকতা সম্পর্কে

---

৯৭. *নাসিবিয়্যত*, তাহকিক কে ভেস মে, ২৩৯, মাওলানা আবদুর রশিদ নুমানি।

৯৮. নাসেবিরা সাধারণত ইয়াজিদপন্থি এবং আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার পরিবার-পরিজন তথা আহলুল বাইতদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। তারা খারেজিদের মতো আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কাফের না বললেও ফাসেক বলে থাকে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাত তাদের ভ্রান্ত বললেও তাকফির করে না। *মিনহাজুস সুন্নাহ*, ৭/৩৩৯; *মাজমুউল ফাতাওয়া*, ৩/১৫৪; *আত-তানকিহ ফি শারহিল উরওয়াতিল উসকা*, ৩/৬৯; *আনওয়ারুন নুমানিয়া*, জাযায়েরি, ২/১৪৭; *ফাতহুল বারি*, ১২/৩০০; *শারহুল কাবির*, ৫২; *তাহযিবুল আহকাম* (তেহরান থেকে মুদ্রিত), ৪/১২২; *ফয়জুল কাশানি ফিল-ওয়াফি* (এটিও তেহরানের মুদ্রণ), ৬/৪৩।
ইমাম ইবনু তাইমিয়ার ভাষায় এরা আহলে বাইতকে কষ্ট দেয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, হজরত আলি রা. সম্পর্কে তারা দাবি করে তিনি ছিলেন অত্যাচারী ও দুনিয়ালোভী শাসক। তিনি খিলাফত চেয়েছিলেন নিজের জন্য। এবং তরবারির মাধ্যমে তা অর্জন করতে চেয়েছিলেন।[৯৯]

মুশাজারাতে সাহাবা সম্পর্কিত আলোচনায় দুধরনের প্রান্তিকতার মুখোমুখি হতে হয় আমাদের। একদিকে রয়েছে শিয়া প্রভাবিত আলোচনা, অন্যদিকে রয়েছে নাসিবিদের প্রভাব। এই দুটি প্রভাবেরই চূড়ান্ত ফলাফল হলো, কোনো না কোনো সাহাবির ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা করা ও তাকে গালমন্দ করা। এমনকি অনেক সময় লোকজন মুশাজারাতে সাহাবা নিয়ে বেশি আলোচনা করতে করতে এক সময় দ্বীনে ইসলামের ওপরই নানা সংশয় ও আপত্তি তুলে ধরে।

এই সমস্যার মূলে রয়েছে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা। মুশাজারাতে সাহাবা সম্পর্কে আলোচনা শুরুর আগেই আমাদেরকে বুঝতে হবে ইসলামে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থানটি কোন স্তরের। এই বিষয়টি পরিষ্কার না করে মুশাজারাতে সাহাবার আলোচনায় প্রবেশ করলে হারিয়ে যেতে হবে এক বিপজ্জনক চোরাবালিতে।

সাহাবায়ে কেরাম মাহফুজ

সাহাবায়ে কেরাম মাসুম নন, মাহফুজ। মাসুম শুধু আম্বিয়ায়ে কেরাম। দুটি শব্দের তফাত জেনে নেওয়া যাক। মাসুম মানে যাদের দ্বারা কোনো ভুল-ত্রুটি বা অপরাধ হয়নি। এটি শুধু আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে নির্দিষ্ট। অপরদিকে সাহাবায়ে কেরাম হলেন মাহফুজ। অর্থাৎ তাদের দ্বারা দুনিয়াতে ভুল-ত্রুটি হওয়া সম্ভব। কিন্তু এর জন্য আখিরাতে তাদেরকে পাকড়াও হতে হবে না। আখিরাতের শাস্তি থেকে তারা থাকবেন মাহফুজ বা নিরাপদ।

মাহফুজের আরেকটি অর্থ হলো, দুনিয়াতে তারা সকল গালমন্দ, অপবাদ ইত্যাদি থেকেও মাহফুজ বা নিরাপদ। কোনো মানুষের অধিকার নেই, সে কোনো সাহাবিকে তার কাজের সূত্র ধরে গালমন্দ করবে, কটূক্তি করবে।

ويحبون أهل بيت رسول الإسلام ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الإسلام... ويتبرأون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، وأهل السنة والجماعة يمسكون عما شجر بين الصحابة.

আল-আকিদাতুল ওয়াসেতিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩/১৫৪।

[৯৯]. *মিনহাজুস সুন্নাহ,* ২/৫৯।

আর কী করেই-বা গালমন্দ করা হবে উম্মতের সেই মুবারক জামাতকে যাদের সম্পর্কে একাধিক আয়াতে আল্লাহ তাআলা প্রশংসা করেছেন। এমন কিছু আয়াত দেখা যাক।

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا﴾

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইনজিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারাগাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের ওপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে—চাষিকে আনন্দে অভিভূত করে—যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। [সুরা ফাতহ : ২৯]

﴿أُوْلَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ﴾

তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী। [সুরা হুজুরাত : ৭]

﴿أُوْلَٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى﴾

আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য শোধিত করেছেন।

[সুরা হুজুরাত : ৩]

﴿لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾

অবশ্যই আমি তাদের ওপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব।

[সুরা আলে ইমরান : ১৯৫]

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আল্লাহ তাআলা নিজের চূড়ান্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এই বলে—

﴿رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

[সুরা বাইয়িনাহ : ৮]

সতর্কতা

মুশাজারাতে সাহাবার ইতিহাস আলোচনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। এখানে শুধু কিছু সতর্কতার কথা বলব, যা মুশাজারাতে সাহাবার ইতিহাস আলোচনার পূর্বে মাথায় রাখা উচিত।

১। সাহাবায়ে কেরাম মাহফুজ। দুনিয়ার কোনো ভুলের জন্য তারা আখিরাতে পাকড়াও হবেন না। আবার তাদের এসব কাজের জন্য দুনিয়াতেও কেউ তাদেরকে গালি দিতে পারবে না। কটূক্তি করতে পারবে না। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেছেন, যদি তোমরা কোনো ব্যক্তিকে দেখো সে মন্দভাবে সাহাবায়ে কেরামের আলোচনা করছে তাহলে তার ইসলামের ওপর প্রশ্ন তোলো।[১০০]

বিশর বিন হারিস বলেন, যে সাহাবিদের গালি দেয় সে কাফের। যদিও সে নামায পড়ে, রোজা রাখে এবং মনে করে সে মুসলমান।[১০১]

২। সাধারণ মানুষের জন্য কোনো প্রাজ্ঞ উস্তাদের সান্নিধ্য ও তত্ত্বাবধান ব্যতীত মুশাজারাতে সাহাবার আলোচনা পড়া উচিত নয়। এতে বিভ্রান্ত হওয়ার শতভাগ আশঙ্কা থাকে।

৩। মুশাজারাতের আলোচনা পাঠের উদ্দেশ্য হবে ইতিহাসের একটি অধ্যায় জানা। কোনোভাবেই সাহাবায়ে কেরামের ভুল-ত্রুটি অনুসন্ধানের নিয়ত করে এটি পড়া ঠিক হবে না।

৪। মুশাজারাতে সাহাবা পড়ার সময় সকল প্রান্তিকতা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। দুদিকেই সম্মানিত সাহাবিরা আছেন। তাদের কারও পক্ষ নিতে গিয়ে

---

[১০০]. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন—

إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام.

আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ইবনু কাসির, ৮/১৪২।

[১০১]. বিশর ইবনুল হারেস রহ. বলেন—

من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين.

আশ-শারহু ওয়াল-ইবানাহ, ইবনু বাত্তা, পৃ. ১৬২।

অন্যদলকে আঘাত করা কোনোভাবেই জায়েজ হবে না।[১০২] ইমাম তহাবি স্পষ্ট লিখেছেন, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল সাহাবিকে ভালোবাসব। আমরা তাদের কারও ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি করব না।[১০৩]

---

[১০২]. সাহাবিদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদকে উম্মতের আলেমগণ মুশাজারাত তথা বাতাসের তীব্রতায় পাতায় পাতায় টক্কর লাগা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টিতে ন্যায় ভেবেই প্রত্যেকে পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাদের কেউই তা দুনিয়ার উদ্দেশ্যে কিংবা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে করেননি, তবে তাদের সাথে যুদ্ধরত সাহাবি নয় এমন কতিপয় ব্যক্তির কথা ভিন্ন। আর তাদের এসব কর্মকাণ্ড নিজেদের ইজতিহাদি সিদ্ধান্ত থেকেই সংঘটিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ ইজহাদ করতে গিয়ে ভুল করেছেন আবার কেউ সঠিক ছিলেন। আর এ ক্ষেত্রে উভয় দলই সওয়াব পাবে বলে হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر.

যখন কোনো বিশেষজ্ঞ হুকুম দেয়, আর তাতে সে ইজতিহাদ করে তারপর সেটা সঠিক হয়, তাহলে তার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব। আর যদি ইজতিহাদ করে ভুল করে তাহলে তার জন্য রয়েছে একটি সওয়াব। *সহিহ বুখারি*, ৬৯১৯; *সহিহ মুসলিম*, ৪৫৮৪; *সুনানে আবু দাউদ*, ৩৫৭৬।

সাহাবিদের পারস্পরিক এই যুদ্ধকে ইমাম নববি ওজর, ইজতিহাদি ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদের কেউ কেউ এই ইজতিহাদে সঠিক ছিলেন আবার কেউ ভুল। কিন্তু সকলের ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করার কথা উল্লেখ করেছেন।

اعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ليست بداخلة في هذا الوعيد ـ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ـ ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم، والإمساك عما شجر بينهم، وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية، ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق، ومخالفه يأثم، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى الله، وكان بعضهم مصيباً وبعضهم مخطئاً معذوراً في الخطأ، لأنه اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه.

শারহু সহিহ মুসলিম, ১১/১৮।

ইমাম ইবনু হাযাম রহ.-ও একই কথা বলেন। এবং এ ক্ষেত্রে তিনি বলেন এই ইজতিহাদে যদিও আলি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সঠিক ছিলেন কিন্তু মুয়াবিয়া ও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ভুল হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদের কারণে একটি সওয়াব পাবেন এবং আলি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুইটি সওয়াব পাবেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কারোই গুনাহ হয়নি। তিনি বলেন—

فلم يطلب معاوية من ذلك إلا ما كان له من الحق أن يطلبه، وأصاب في ذلك الأثر الذي ذكرنا، وإنما أخطأ في تقديمه ذلك على البيعة فقط، فله أجر الاجتهاد في ذلك، ولا إثم عليه فيما حرم من الإصابة كسائر المخطئين في اجتهادهم الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم أجرا واحدا، وللمصيب أجرين.

وقد علمنا أن من لزمه حق واجب وامتنع من أدائه وقاتل دونه، فإنه يجب على الإمام أن يقاتله وإن كان منا، وليس ذلك بمؤثر في عدالته وفضله، فبالمقابل هو مأجور لاجتهاده ونيته في طلب الخير،

فبهذا قطعنا على صواب علي رضي الله عنه وصحة أمانته، وأنه صاحب الحق، وإن له أجرين: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة.

وقطعنا أن معاوية رضي الله عنه ومن معه مخطئون مجتهدون مأجورون أجرا واحدا، وأيضا في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن مارقة تمرق بين طائفتين من أمته يقتلها أولى الطائفتين بالحق، فمرقت تلك المارقة وهم الخوارج من أصحاب علي وأصحاب معاوية، فقتلهم علي وأصحابه، فصح أنهم أولى الطائفتين بالحق، وأيضا الخبر الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية.

(قال أبو محمد) المجتهد المخطئ إذا قاتل على ما يرى أنه الحق قاصدا إلى الله تعالى نيته غير عالم بأنه مخطئ فهو باعثه وإن كان مأجورا أو لا حد عليه إذا ترك القاتل ولا قود، وأما إذا قاتل وهو يدري أنه مخطئ فهذا المحارب تلزمه المحاربة والقود وهذا يفسق ويخرج لا المجتهد المخطئ، وبيان ذلك قول الله تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} إلى قوله {إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم} فهذا نص قولنا دون تكلف تأويل ولا زوال عن موجب ظاهر الآية، وقد سماهم الله عز وجل مؤمنين باغين بعضهم أخوة بعض في حين تقاتلهم وأهل العدل المبغي عليهم والمأمورين بالإصلاح بينهم وبينهم ولم يصفهم عز وجل بفسق من أجل ذلك التقاتل ولا ينقص إيمان، وإنما هم مخطئون باغون ولا يريد واحد منهم قتل آخر.

আল-ফাসলু ফিল-মিলালি ওয়ান-নিহাল, ৪/১৫৯-১৬১; *তাফসিরে ইবনে কাসির*, ৪/৩০৬।
ইমাম মাযিরি আল-মালেকি রহ. এটিকে একে অন্যের তাবিল ও ইজতিহাদের সাথে তুলনা করেছেন—

ومعاوية من عدول الصحابة، وأفاضلهم، وما وقع من الحروب بينه وبين علي، وما جرى بين الصحابة من الدماء، فعلى التأويل والاجتهاد، وكل يعتقد أن ما فعله صواب وسداد.

وقد يختلف مالك، وأبو حنيفة، والشافعي في مسائل من الدماء، حتى يوجب بعضهم إراقة دم رجل، ويحرمه الآخر، ولا يستنكر هذا عند المسلمين، ولا يستبشع، لما كان أصله الاجتهاد، وبه تعبد الله عز وجل العلماء، وكذلك ما جرى بين الصحابة - رضي الله عنهم - في هذه الدماء.

ইকমালুল মুআল্লিম বি ফাওয়ায়েদে মুসলিম, ৭/৩৮১।
একই কথা ইমাম কুরতুবি রহ.-ও উল্লেখ করেন এবং সাহাবিদের এই স্পর্শকাতর বিষয়ে নাড়াচাড়া করা থেকে বিরত থাকার কথা বলেন ও সাহাবিদের মর্যাদার দিক লক্ষ রেখে উত্তম আঙ্গিকে তা উপস্থাপন করার কথা বলেন।

لا يجوز أن يُنسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه، وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم، وأخبر بالرضا عنهم. انتهى

আল-জামে লি আহকামিল কুরআন, ১৬/৩২১-৩২২।

১০৩. *আকিদাতুত তহাবি*, ৮১।

অমুসলিম বা সেক্যুলার লেখকদের লেখায় সমস্যা কোথায়

অমুসলিম লেখকদের ইসলাম নিয়ে লেখা বইপত্র পড়তে সাধারণ মানুষকে আলেমরা নিষেধ করেন। তারা বলেন, অমুসলিমদের লেখা বইপত্র গবেষকদের টেবিলে থাকবে। তারা এগুলো পড়বেন, পর্যালোচনা করবেন। সাধারণ মানুষের জন্য এসব নাড়াচাড়া করা বিপজ্জনক। আলেমদের এই নিষেধাজ্ঞার পেছনে মোটাদাগে দুটি কারণ থাকে।

১। অমুসলিম লেখকদের লেখায় ইসলামের মূল আবেদন ও ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়। ভাষার চমক দিয়ে সূক্ষ্মভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয় বিষ। পাঠকের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয়। এই বিষয়গুলো এতটাই স্পষ্ট যা বিস্তারিত আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের লেখা পড়লে যে-কেউ এর সত্যতা পাবেন।

২। প্রথম বিষয়টি সহজে বুঝে আসে। কিন্তু আরেকটি বিষয় আছে, যা সহজে আমরা ধরতে পারি না। অনেক সময় আমরা বলি, অমুক বইতে তথ্যগত কোনো সমস্যা নেই। তিনি অমুসলিম লেখক হলেও লেখায় সততা বজায় রেখেছেন। ভুল কোনো তথ্য দেননি।

অমুসলিম লেখকদের লিখিত বইয়ের বিশাল ভান্ডারে এমন বইয়ের সংখ্যা যে খুবই কম, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই অল্পকিছু বইও সাধারণ মানুষের পড়া উচিত নয়। বিষয়টি অযৌক্তিক মনে হতে পারে, কিংবা মনে হতে পারে বাড়াবাড়ি। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বিষয়টির যৌক্তিকতা বুঝে আসবে।

৩। একজন মুসলিম লেখক যে দৃষ্টিতে ইসলামকে ব্যাখ্যা করেন, ইসলামের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করেন, একজন অমুসলিম লেখক কখনোই তা করবেন না। একজন মুসলিম লেখক তার লেখায় আকিদাকে প্রাধান্য দেবেন, লেখার ছত্রে ছত্রে নিখাদ ইসলামি চেতনা ফুটিয়ে তুলবেন, প্রকারান্তরে একজন অমুসলিম লেখক কখনোই তা করবেন না। অমুসলিম লেখক তার লেখায় প্রাধান্য দেবেন বস্তুবাদী চিন্তাধারা ও বিশ্লেষণকে। একটা উদাহরণ দিই—

বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ তার লিখিত গ্রন্থে ক্রুসেডের সময়কার একটি ঘটনা লিখেছেন। একবার বাইতুল মাকদিসের দিকে ক্রুসেডারদের বিশাল একটি বাহিনী এগিয়ে আসছিল। বাহ্যিকভাবে মুসলিম বাহিনীর শক্তিসামর্থ্য ছিল

তাদের চেয়ে কম। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি খুব পেরেশান ছিলেন। বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ যখন ফজরের সময় মসজিদে গেলেন, তিনি দেখলেন সুলতান সেজদায় পড়ে আছেন। সুলতান যখন মাথা তুললেন, বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ দেখলেন সুলতানের দাড়ি ভিজে গেছে চোখের পানিতে, জায়নামাজের ওপর টপটপ করে ঝরছে চোখের পানি। এরপর সুলতান আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। সেদিনই সংবাদ এলো ক্রুসেডার বাহিনীতে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। তাদের সেনারা বিভিন্ন গ্রুপ হয়ে একেকদিকে চলে যেতে থাকে। কয়েকদিনের মধ্যে পুরো ময়দান ক্রুসেডারশূন্য হয়ে যায়।

মূল ঘটনা এটুকুই। কিন্তু একজন মুসলিম লেখক যখন এই বিষয়টি লিখবেন, তখন তিনি দেখাবেন, ক্রুসেডারদের এই দ্বন্দ্ব ছিল মুসলমানদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা নুসরত। এটি ছিল সুলতানের দোয়ার প্রভাব। পাঠক এই লেখা পড়ে আল্লাহর সাহায্যের ব্যাপারে আশাবাদী হবেন। তিনি বুঝতে পারবেন, যত বড় সমস্যাই আসুক, আল্লাহর কাছে দোয়া করলে তিনি সমাধান করে দেবেন। এভাবে পাঠক ইতিহাসের একটি ঘটনা পড়ে সেখান থেকে অর্জন করবেন জীবনের পাথেয়। এই শিক্ষা তিনি কাজে লাগাবেন জীবনের বাঁকে বাঁকে।

অপরদিকে একজন অমুসলিম লেখক যখন এই ঘটনা লিখবেন, তিনি দেখাবেন ক্রুসেডারদের সরে যাওয়ার কারণ ছিল তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব। এরপর তিনি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টি আলোচনা করবেন। দোয়ার ফলাফল, কার্যকারিতা ও আল্লাহর নুসরতের বিষয়টি কিন্তু তার লেখায় আসবে না। আসবেই-বা কেন, তিনি তো এতে বিশ্বাসই করেন না। তার লেখার এই অংশ পড়ে পাঠক কিছু তথ্য জানবেন, কিন্তু এখান থেকে তিনি নিজের জীবনের জন্য কোনো শিক্ষা বের করতে পারবেন না।

আলোচনা দীর্ঘ করা উদ্দেশ্য নয়। এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে। মূলকথা হলো, অমুসলিম লেখকদের সেইসব রচনা, যাতে বাহ্যিকভাবে তথ্য-উপাত্তে কোনো ভুল নেই, সেসব বই পড়েও সাধারণ মানুষের তেমন উপকার নেই। এখান থেকে তিনি শিক্ষা অর্জন করতে পারবেন না, বরং সবকিছুকে মাপবেন বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। অথচ একজন মুসলিমের পঠনপাঠনের মূল উদ্দেশ্য নিজের জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করা।

দুটি জিনিস দেখা গেল। অমুসলিম লেখকদের বইয়ে হয়তো তথ্যবিকৃতি থাকবে, আর তথ্যবিকৃতি না থাকলে তাতে লেখকের এমন দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠবে যার সাথে ইসলামি চিন্তা ও চেতনার কোনো সম্পর্ক নেই, এমনকি

ক্ষেত্রবিশেষে তা সাংঘর্ষিক। অমুসলিম লেখকদের বইয়ে হয়তো ক্ষতি থাকবে, আর ক্ষতি না থাকলেও লাভশূন্য থাকবে।

অথচ এর বিপরীতে রয়েছে মুসলিম লেখকদের বিশাল ইলমি ভান্ডার, যা থেকে নিরাপদে উপকৃত হওয়ার সুযোগ খোলা থাকছে। তাহলে একজন সাধারণ পাঠক কেন নিরাপদ পথ ছেড়ে বিপৎসংকুল পথে হাঁটা শুরু করবেন কোনোপ্রকার সুরক্ষাব্যবস্থা ছাড়া।

মনে রাখবেন, ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রগুলো এতটা ইয়াতিম হয়ে যায়নি যে, কাফেরদের লেখা পড়ে আমাদের ইসলাম শিখতে হবে, উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের জীবনী জানতে হবে।

এই কথাগুলো সে সকল মুসলিম লেখকদের জন্যও প্রযোজ্য যারা প্রাচ্যবিদদের দ্বারা প্রভাবিত, কিংবা সেক্যুলার মানস দ্বারা পরিচালিত।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গবেষক ডক্টর আকরাম জিয়া উমারির একটি কথা উদ্ধৃত করেই আলোচনার সমাপ্তি টানছি। তিনি লিখেছেন, মুসলিমবিশ্বে ইতিহাস গবেষণায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বৃহত্তর অংশ সাধারণত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিরা মনে-প্রাণে তাদের ইসলামি উত্তরাধিকারকে ঘৃণা করেন। তারা মনে করেন ইসলামি উত্তরাধিকারের কারণেই মুসলিম সমাজ সাংস্কৃতিকভাবে পিছিয়ে পড়েছে। এই শ্রেণির ঐতিহাসিকদের মতে অতীত ও বর্তমানের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করা জরুরি এবং নতুন প্রজন্মকে ইসলামের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে এর ঐতিহ্য ও প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। দ্বিতীয় শ্রেণিতে আছে পেশাজীবী ঐতিহাসিক ও নিবন্ধকারগণ। তারা সাধারণত প্রাচ্যবিদদের অনূদিত গ্রন্থের ওপর ভর করে লেখালেখি করেন। এসব বইয়ে তাদের নেই কোনো বিশ্লেষণ কিংবা মূলনীতির আলোকে যাচাইয়ের প্রচেষ্টা। প্রাচ্যবিদরা তাদের লেখার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে কোনো ক্ষতিকর ধ্যানধারণা প্রবেশ করাচ্ছে কি না সে সম্পর্কেও তারা বেখবর।

তাই ইসলামের ইতিহাস রচনার গুরুদায়িত্ব নিতে হবে ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারীদেরকেই। কারণ, তারা ঈমানের স্বাদ অনুভব করেছেন এবং নিজেদের জীবনে এর প্রভাব উপলব্ধি করেছেন। তারা ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামি সমাজের সঠিক চিত্রটি ধারণ করতে সক্ষম।

মহাবিশ্ব, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে ইসলামের যে ব্যাখ্যা তা দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ তাআলা, তার কিতাবসমূহ, রাসুলগণ, পরকাল ও তাকদিরের বিশ্বাসের ওপর। এটি মোটেও ইসলামের আকিদার বাইরের কিছু নয়। ইসলামি ইতিহাস

বিশ্লেষণ মোটেও বস্তুবাদী কোনো বিশ্লেষণ নয়, যেখানে উৎপাদনের উপকরণ মানব ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির একমাত্র প্রভাবক ও নিয়ন্ত্রণের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে, যেমনটা মার্কসবাদী ইতিহাসের গবেষকরা মনে করে থাকেন। ভৌত পরিবেশ, জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, অর্থনীতি ইত্যাদির মতো বাহ্য উপাদানের প্রভাবের ফলে ইতিহাসের গতি পরিবর্তনের ব্যাখ্যাও ইসলামি ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এসবই পশ্চিমা বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। ইসলামি ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়, আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত বিধিবিধানের সীমারেখায় মানুষের দায়িত্ব এবং সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিবর্তনে তার কার্যকর ভূমিকার কথা।[১০৪]

* * *

---

[১০৪]. *আল-মুজতামাউল মাদানি ফি আহদিন নবুওয়াহ*, ১৪-১৬।

ঐতিহাসিক উপন্যাস : রঙিন বোতলে বিষাক্ত বিষ

এখনো এ অঞ্চলের মানুষদের একটি বড় অংশ মনে করেন, ইতিহাস জানার একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হলো ঐতিহাসিক উপন্যাস। বাংলাদেশে এখনো ইতিহাসের বইপত্রের চেয়ে আলতামাশ ও নসিম হিজাজি রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস বেশি চলে। লোকজন এসব বইয়ের রেফারেন্স টেনে কথা বলে। সাধারণ পাঠক এখনো বুঝতে চায় না, ঐতিহাসিক উপন্যাস হলো সাহিত্যের একটি জনরা, যাতে কল্পনার উপস্থিতি প্রবল। অপরদিকে ইতিহাস হলো যা ঘটেছে তার বিবরণ।

ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে আমাদের সমাজে মোটাদাগে দুটি ধারণা আছে। **এক.** এসব উপন্যাস পড়লে বিশুদ্ধ ইতিহাস জানা যায়। **দুই.** এসব উপন্যাস পড়লে জিহাদি চেতনা জাগ্রত হয়। দুটি ধারণাই শতভাগ ভুল। কারণ—

১। এসব বইয়ে বিশুদ্ধ তথ্যের পরিমাণ এতই সামান্য, যা কিনা খড়ের গাদায় করোনা ভাইরাস খোঁজার মতোই কঠিন একটি বিষয়। আর কোন তথ্য বিশুদ্ধ কোনটা অশুদ্ধ এটা বুঝতে হলেও দীর্ঘ অধ্যয়ন ও জানাশোনা দরকার। আলতামাশ ও নসিম হিজাজির বইয়ে সামান্য ইতিহাসের সাথে এত বেশি কল্পনা মেশানো হয়েছে এটি আলাদা করাও সহজসাধ্য নয়। মহাসাগর থেকে একটি মুক্তো উদ্ধার করা যেমন কঠিন কাজ, ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়ে ইতিহাস শেখাও তেমনই কঠিন।

২। এসব বইয়ে জিহাদ ও মুজাহিদদের যে চিত্রায়ণ করা হয়, তা ইতিহাস বিকৃতির নামান্তর। মুসলিম মুজাহিদরা কখনো এমন প্রেমিক পুরুষ ছিলেন না। জিহাদের ফাঁকে ফাঁকে প্রেম করার যে চিত্রায়ণ করা হয়, মুজাহিদদের আঁচল এই কালিমা থেকে মুক্ত। এসব বইয়ে দেখানো হয় মুজাহিদরা অভিযানের ফাঁকে কারও প্রেমে পড়ে যান, কদিন দ্বীনি কথাবার্তা বলেন, পরে বিয়ে করে ফেলেন। রিজালের কিতাবে আমরা মুজাহিদদের যে জীবনের কথা পাই, তা মোটেও এমন নয়। আলতামাশ ও নসিম হিজাজির বই এসব প্রেমের বিবরণে ভরপুর। এ ক্ষেত্রে এই লেখকরা কোনো নীতি-নৈতিকতার ধার ধারেননি। যেমন, আলতামাশ তার শমসিরে বেনিয়াম গ্রন্থে হজরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-এর সাথে এক মেয়ের পাশাপাশি বসার কাল্পনিক ঘটনা খুব রসালোভাবে উপস্থাপন করেছেন। নাউজুবিল্লাহ। এমন শত শত উদাহরণ দেওয়া যাবে।

মোটাদাগে বলতে গেলে, ইতিহাস জানতে আমাদের ইতিহাসের বই-ই পড়তে হবে। জিহাদের ফজিলত জানতে, জিহাদের প্রেরণা জাগাতে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের 'কিতাবুল জিহাদ' কিংবা ইবনুন নাহহাসের 'মাশারিউল আশওয়াক' তো আছেই। এর বাইরে কেউ উপন্যাস পড়তে চাইলে সেটা তার নিজের সিদ্ধান্ত। তিনি উপন্যাস মনে করে পড়বেন। কিন্তু ব্যক্তিগত এই কাজের বৈধতা দিতে গিয়ে উপন্যাসকে ইতিহাসের বই বলে প্রচার করা কিংবা এখান থেকে জিহাদি প্রেরণা পাওয়া যায়, এটা বলা তো অন্যায়।

আলতামাশের বইকে আমাদের এ অঞ্চলে মনে করা হয় বিশুদ্ধ ইতিহাসের বই। কারণ আলতামাশ তার লেখায় প্রচুর রেফারেন্স দিয়েছেন। আলতামাশের লেখা 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান' পড়েনি এমন পাঠক কমই আছে। ধারণা করা হয়, এই বইয়ে ক্রুসেডের সবচেয়ে বিশুদ্ধ ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। বাদ দেওয়া হয়নি কিছুই। কিন্তু সম্প্রতি মাওলানা ইসমাইল রেহান বিস্তারিত গবেষণা করে দেখিয়েছেন, আলতামাশের এই বই ভুলে ভরা। তিনি রেফারেন্সের নামে করেছেন জালিয়াতি। নিজের মনগড়া কথা লিখে চালিয়ে দিয়েছেন ইতিহাসবিদদের নামে।

গুরুত্ব বিবেচনা করে এখানে মাওলানা ইসমাইল রেহানের সে গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ অংশ পাঠকদের সাথে শেয়ার করছি।

* * *

আলতামাশ রচিত ঈমানদীপ্ত দাস্তান : মাওলানা ইসমাইল রেহানের পর্যালোচনা

'ঈমানদীপ্ত দাস্তান' বইটি বিস্তারিত অধ্যয়ন ও তত্ত্বতালাশ শেষে আমরা নিম্নের বিষয়গুলো নিশ্চিত হয়েছি।

১। ঈমানদীপ্ত দাস্তানে বর্ণিত বেশিরভাগ ঘটনাই হয় বানোয়াট নয়তো ঐতিহাসিক বর্ণনার বিপরীত।

২। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ও নুরুদ্দিন জেংগির পক্ষ থেকে আমিরদের কাছে পাঠানো যেসব পত্রের কথা বইতে বর্ণনা করা হয়েছে সবগুলোই বানোয়াট।

৩। বইয়ে উল্লেখিত সুলতান আইয়ুবি ও তার আমিরদের সকল বক্তৃতা বানোয়াট।

৪। অনেক ক্ষেত্রে লেখক ঐতিহাসিকদের মতবিরোধ বর্ণনা করে নিজের মত উপস্থাপন করেছেন। বাস্তবতা হলো এসব ঘটনার বেশিরভাগই কাল্পনিক। এসব ঘটনা ঐতিহাসিকরা উল্লেখই করেননি, মতবিরোধ তো পরের কথা।

৫। সর্বশেষ খণ্ডের শেষ ৫০/৬০ পৃষ্ঠা ব্যতীত সকল যুদ্ধের বর্ণনা, সেনাবিন্যাস, আহত-নিহতদের সংখ্যা সবই কাল্পনিক।

৬। ইহুদি ও খ্রিষ্টান তরুণী গোয়েন্দাদের ঘটনা, মুসলিম প্রশাসক ও সেনাদের ফাঁদে ফেলার গল্প সবই বানোয়াট ও কাল্পনিক।

৭। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির গোয়েন্দাবাহিনী ও এর প্রধান আলি বিন সুফিয়ানের সকল ঘটনা কাল্পনিক। আলি বিন সুফিয়ানও কাল্পনিক চরিত্র। বাস্তবে এমন কারও অস্তিত্ব ইতিহাসে ছিল না।

৮। সুলতানের সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ সেনাপতির নাম কাল্পনিক।

৯। বেশিরভাগ জায়গায় লেখক যেসব ইতিহাসগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে এমন কোনো তথ্যই নেই। লেখক এখানে পাঠকের সাথে স্পষ্ট প্রতারণা করেছেন। তিনি নিজের মত একটি বানোয়াট ঘটনা লিখে ঐতিহাসিকদের নামে চালিয়ে দিয়েছেন।

১০। অনেক ক্ষেত্রে তিনি বানোয়াট সব গ্রন্থ ও ঐতিহাসিকের নাম লিখেছেন। এসব নামের কোনো ঐতিহাসিকের অস্তিত্বই ছিল না কখনো। আবার কখনো এমন বইয়ের নাম লিখেছেন যা কখনো লেখাই হয়নি।

১১। পুরো ১৫০০ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসে শুধু শেষ ৮ পৃষ্ঠাতেই তিনি সঠিক রেফারেন্স দিয়েছেন এবং আমানতদারির সাথে তথ্য উদ্ধৃত করেছেন।

১২। লেখক পুরো বইয়ের ঘটনা বর্ণনা করেছেন বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করা পর্যন্ত সময়কাল নিয়ে। এ সময় বড় যুদ্ধ খুব বেশি হয়নি। তবু তিনি নানা কাল্পনিক ঘটনা বানিয়েছেন। অপরদিকে তৃতীয় ক্রুসেডের মতো বিশাল ঘটনা নিয়ে মাত্র ৩০ পৃষ্ঠা লিখেছেন।

১৩। রজব, ফইজুল ফাতেমি, জেনারেল নাজি, হাতিম আল-আকবর, ফখরুল মিসরি, সিপাহসালার নাসির, আল-বারাক, হাসান বিন আবদুল্লাহ, আহমাদ কামাল, হাদিদ, ইমাদ শামি, হাবিবুল কুদস, মুবি, আসিফা, বালিয়ান এই চরিত্রগুলো সবই কাল্পনিক।

১৪। বইয়ে বর্ণিত কথোপকথনগুলোর ৯৯ ভাগই মিথ্যা।

১৫। ক্রুসেডারদের বক্তৃতা ও পত্রগুলোও কাল্পনিক।

১৬। মুসলিম সেনা ও সেনাপতিদের একাংশের যে চিত্রায়ণ (মদ ও নারী নিয়ে ব্যস্ত থাকা) করা হয়েছে বইতে ইতিহাসের সাথেও এর কোনো সম্পর্ক নেই। এটিও কাল্পনিক।

* * *

এবার দেখা যাক বইয়ের কোন অংশগুলো সত্য ও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত

১। সিরিয়ার শাসক নুরুদ্দিন জেংগি ও মিশরের ফাতেমি শাসক আল-আযিদ ঐতিহাসিক চরিত্র। তবে তাদেরকে ঘিরে যেসব গল্প বর্ণনা করা হয়েছে বইতে তার ৯৯ ভাগই মিথ্যা।

২। আল-মালিকুল আদিল, তকিউদ্দিন উমর, ইবনু শাদ্দাদ, ফকিহ ঈসা আল-হাকারি, নুরুদ্দিন জেংগির স্ত্রী রাজিয়া খাতুন এরা প্রত্যেকে বাস্তব চরিত্র। তবে তাদেরকে নিয়ে লেখা ঘটনাগুলো বেশিরভাগই কাল্পনিক।

৩। ইমারাতুল ইয়ামানি ও মুজাফফর উদ্দিন বিন যাইনুদ্দিন এই দুজনের অস্তিত্ব ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। দুঃখের বিষয়, মুজাফফর উদ্দিন ছিলেন একজন মুজাহিদ কিন্তু লেখক তাকে বানিয়ে দিয়েছেন গাদ্দার। অথচ এটি সম্পূর্ণ বাস্তবতা-বিবর্জিত।

৪। চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে বাহাউদ্দিন ইবনু শাদ্দাদের বরাত দিয়ে যেসব তথ্য দেওয়া হয়েছে তার কিছু অংশ সঠিক।

এরপর মাওলানা ইসমাইল রেহান এই বইয়ের প্রতিটি খণ্ড ধরে ধরে পর্যালোচনা করেছেন। আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় আমরা এখানে সে পর্যালোচনার পুরোটা উদ্ধৃত করা থেকে বিরত থাকব। কারও আগ্রহ হলে মাওলানা ইসমাইল রেহান রচিত 'দাস্তান ঈমান ফারুশোকি এক তাহকিকি জায়েযা' বইটি পড়ে নিতে পারেন।

'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'-এর প্রথম খণ্ডে মাওলানা ইসমাইল রেহান যে অনুসন্ধান করেছেন তার সামান্য একটু নমুনা দেখা যাক।

১। ঈমানদীপ্ত দাস্তানের প্রথম খণ্ডের শুরুতে লেখক সাইফুদ্দিন গাজির কাছে প্রেরিত সুলতানের একটি চিঠি তুলে দিয়েছেন। এরপর সিরিয়া ও মিশরের পরিস্থিতি, আলি বিন সুফিয়ানের তৎপরতা, এক সেনা অফিসার নাজির সাথে আলি বিন সুফিয়ানের কৌশল, নাজিকে হত্যা, ক্রুসেডারদের আক্রমণ ও তাদের পরাজয়ের কথা লিখেছেন।[১০৫]

---

[১০৫]. দেখুন, *ঈমানদীপ্ত দাস্তান*, ১/৭-৮।

সাইফুদ্দিন গাজির নামে সুলতানের যে পত্রের কথা এসেছে তা পুরোটাই বানোয়াট। সুলতান এমন কোনো পত্র কাউকে লেখেননি। তবে একবার তিনি একজন আমির মুজাফফর আকরাকে একটি বাক্য বলেছিলেন, যা এই বানোয়াট পত্রের একটি বাক্যের সাথে মিলে যায়। সুলতান ওই আমিরকে বলেছিলেন, তুমি এই পাখিদের সাথে খেলা করতে থাকো, সামনে যে বিপদ আসছে, তার চেয়ে এটা নিরাপদ তোমার জন্য।[১০৬]

স্ট্যানলি লেনপুলের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক যা লিখেছেন তার পুরোটাই বানোয়াট।[১০৭] গনিমতের মাল তিন ভাগ করার কথা লেনপুল লেখেননি, জামিয়া নিজামিয়ায় গনিমতের মাল পাঠানোর কথাও লেখকের মনগড়া। লেখকের সবচেয়ে বড় অপরাধ তিনি স্ট্যানলি লেনপুলের উদ্ধৃতি দিয়ে পাঠককে বিশুদ্ধ ইতিহাস পাঠের অনুভূতি দিচ্ছেন অথচ পুরোটাই তার বানোয়াট কথা, যার সাথে লেনপুলের কোনো সম্পর্ক নেই। সুলতান জামিয়া নিজামিয়ায় পড়েছেন এটাও বানোয়াট। তিনি জীবনে কখনো বাগদাদ যাননি।

নাজি নামের যে সেনা অফিসারের কথা লেখক লিখেছেন এমন কারও অস্তিত্ব ইতিহাসে নেই। তবে সে সময় সুলতানের প্রাসাদের দায়িত্বে একজন সুদানি অফিসার ছিল। আল্লামা নুয়াইরি তার নাম লিখেছেন জাওহার।[১০৮] স্ট্যানলি লেনপুল তার নাম লিখেছেন নাজাহ। সম্ভবত একেই লেখক নাজি নাম দিয়ে বিশাল বানোয়াট গল্প ফেঁদে বসেছেন। অথচ লেনপুল কর্তৃক নাজাহ লেখাটাই বড় ধরনের ভুল। এই নাম আরব ইতিহাসবিদদের কেউ লেখেননি। ইতিহাসে নাজাহ ছিলেন আরেকজন ব্যক্তি, যিনি ৫৬৯ হিজরিতে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ধরা পড়েন এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এই ব্যক্তি বড় কোনো সেনা অফিসারও ছিল না।[১০৯]

সুলতানের সময়কার আরেকজন নাজাহ ছিলেন আব্বাসি খলিফার সভাসদ।[১১০] সুলতান সালাহুদ্দিনের একশ বছর আগে আরেকজন শাসক ছিলেন নাজাহ নামে।[১১১] তিনি ৪২১ হিজরিতে ইয়ামান দখল করেন।[১১২]

---

[১০৬]. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭/৫৭১; *আর-রওযাতাইন*, ২/৪০০।

[১০৭]. বাংলা অনুবাদে অনুবাদক স্ট্যানলি লেনপুলের উদ্ধৃতি আনেননি। তবে মূল উর্দুর ১২ নম্বর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতিটি আছে।

[১০৮]. *নিহায়াতুল আরব*, ৮/১২; *মুফাররিজুল কুরুব*, ১/১৭৪, টীকা দ্রষ্টব্য।

[১০৯]. *আর-রওযাতাইন*, ২/২৮৪।

[১১০]. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২২/২১৩।

[১১১]. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৮/১৩১।

[১১২]. *আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার*, ১/২৫৩।

ইতিহাসে আরেকজন নাজাহর সন্ধান পাওয়া যায়, তিনি ছিলেন আব্বাসি খলিফা মুতাযিদের পুলিশ অফিসার।[১১৩] ফলত দেখা যাচ্ছে, স্ট্যানলি লেনপুল কর্তৃক এই নাম উল্লেখ করাটাই ভুল। তার আসল নাম জাওহার। সমস্যা হলো স্ট্যানলি লেনপুল শুধু নাজাহ নাম উদ্ধৃত করেছেন, আর লেখক একে নাজি বানিয়ে এক বিশাল গল্প বানিয়ে ফেলেছেন, যেখানে একে একে উপস্থিত হয়েছে জেংগির মতো নর্তকী ও গোয়েন্দা অফিসার আলি বিন সুফিয়ান। বলাবাহুল্য প্রতিটি চরিত্র কাল্পনিক, পুরো ঘটনাটি কাল্পনিক।[১১৪]

২। আলতামাশ লিখেছেন, একজন ইতিহাসবিদ সিরাজুদ্দিন লিখেছেন, সুদানিরা ক্রুসেডারদের আগমনের আগেই বিদ্রোহ করে বসে।[১১৫]

আফসোসের বিষয় হলো, সিরাজুদ্দিন নিজেই একটি কাল্পনিক চরিত্র, যার নাম নিয়ে আলতামাশ ইতিহাস লেখার ভান করেছেন মাত্র। এই নামে কোনো আরব ইতিহাসবিদের সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। হ্যাঁ, এ সময় মিশরে সুদানিদের একটি বিদ্রোহের পরিকল্পনা ফাঁস হয়েছিল তবে তাতে কাল্পনিক চরিত্র আলি বিন সুফিয়ান কিংবা জেংগির হাত ছিল না, বরং এটি ছিল সুলতানের সেনাবাহিনীর কিছু সদস্যের কাজ।[১১৬]

৩। লেখক ১১৬৯ সালে ক্রুসেডারদের একটি হামলার বিবরণ দিয়েছেন। তার ভাষ্যমতে, এই যুদ্ধে সুলতান সরাসরি অংশ নেন এবং নেতৃত্ব নিজের হাতে রাখেন।[১১৭]

এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৫৬৫ হিজরির সফর মাসে। খ্রিষ্টীয় হিসেবে সময়টা ছিল ২৩ অক্টোবর ১১৬৯ খ্রিষ্টাব্দ। দিময়াতের উপকূলে ৫০ দিন পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে সুলতান অংশ নেননি বরং তিনি এ সময় কায়রো ছিলেন। সে সময় তিনি সুলতান নুরুদ্দিন জেংগিকে লেখা এক পত্রে বলেন, এ মুহূর্তে আমি কায়রো ত্যাগ করলে এখানে বিদ্রোহের সম্ভাবনা আছে।[১১৮]

---

১১৩. *মুরুজুয যাহাব*, ২৩৯।

১১৪. নাজি-সংক্রান্ত বানোয়াট গল্প বাংলা অনুবাদে ১৪ থেকে ৬০ নম্বর পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিবৃত হয়েছে, যার পুরোটাই মিথ্যা।

১১৫. সিরাজুদ্দিনের এই উদ্ধৃতি উর্দু সংস্করণের ৫৫ নম্বর পৃষ্ঠায় আছে। তবে বাংলা অনুবাদে অনুবাদক এখানে কিছু আলোচনা বাদ দিয়েছেন ফলে উদ্ধৃতিটি বাদ গেছে।

১১৬. *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, ১০/১৯।

১১৭. *ঈমানদীপ্ত দাস্তান*, ১/৬০।

১১৮. *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, ১০/২২; *আর-রওযাতাইন*, ২/১৩৯।

৪। আলতামাশ লিখেছেন, জেংগি ও আলি বিন সুফিয়ানের ঘটনা মারাকেশের একজন ইতিহাসবিদ আসাদুল আসাদি লিখেছেন।[১১৯]

মজার ব্যাপার হলো জেংগি আর আলি বিন সুফিয়ান তো পরের কথা, খোদ আসাদুল আসাদিরই কোনো অস্তিত্ব ইতিহাসে নেই।

৫। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক যে রূপসি নারীদের গল্প বলেছেন তাও বানোয়াট। 'আল-কামিল ফিত-তারিখ' বা অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে সে সময়কালের ইতিহাস পাঠ করলে যে-কেউ নিশ্চিত হবে লেখক এখানে কত বড় প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন।

৬। সুদানিদের হামলার বিবরণ দেওয়ার পর আলতামাশ লিখেছেন, তিন-চারজন ঐতিহাসিক যাদের মধ্যে লেনপুল ও উইলিয়াম অন্যতম, তারা লিখেছেন, এটি ছিল সুলতান আইয়ুবির নিপুণ কৌশল।[১২০]

লেনপুল এমন কিছুই লেখেননি। উইলিয়াম দ্বারা কে উদ্দেশ্য তাও স্পষ্ট নয়। যদি উইলিয়াম অব টায়ার হয় তাহলে তার লেখাতেও এমন কিছুর উল্লেখ নেই।

৭। সুদানিদের বিদ্রোহের ইস্যুতে আলতামাশ লিখেছেন, সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে আরব থেকে বিশাল একটি বাহিনী আসছে। সত্যি সত্যি নুরুদ্দিন জেংগির একটি বাহিনী আসে। ঐতিহাসিকদের কারও মতে এই বাহিনীর সংখ্যা ৪ হাজার, কারও মতে আরও বেশি।

সেনা আসার এই সংবাদ কেউই ছড়ায়নি, বরং লেখক নিজেই ছড়িয়েছেন। সে সময় আরব থেকে কোনো বাহিনী আসেওনি। সুলতান নুরুদ্দিন জেংগির একটি বাহিনী এসেছিল তাও এই বিদ্রোহ দমন করতে নয় বরং বিদ্রোহের কয়েক মাস পর। এই বাহিনী কায়রো আসেনি বরং তাদের গন্তব্য ছিল দিময়াত। লেখক সেনাসংখ্যা নিয়ে ইতিহাসবিদদের যে মতবিরোধ বর্ণনা করেছেন তাও মনগড়া।[১২১]

৮। প্রথম খণ্ডের শেষ অংশে লেখক ম্যাগনামা মারইউসের এক বিশাল গল্প এনেছেন। এই বিশাল গল্পের শেষে তিনি লিখেছেন, ম্যাগনামা মারইউস মুসলমান হয়ে যায়। সুলতানের ইনতিকালের পরেও ১৭ বছর বেঁচে ছিল সে। সে ছিল সুলতানের কবরের খাদেম। তার ইসলামি নাম রাখা হয় সাইফুল্লাহ।

---

[১১৯]. উর্দু সংস্করণ, ৫৭। বাংলা অনুবাদে অনুবাদক এই অংশ বাদ দিয়েছেন।
[১২০]. *ঈমানদীপ্ত দাস্তান*, ১০৫।
[১২১]. *আন-নুজুমুয যাহিরা*, ৬/৭।

বাহাউদ্দিন শাদ্দাদের ডায়েরিতে তার সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা আছে। আরবি ভাষায় লেখা এই ডায়েরি আজও অক্ষত আছে।[১২২]

আরবি ভাষায় লেখা বাহাউদ্দিন ইবনে শাদ্দাদের বইটি আজও অক্ষত আছে, কিন্তু তাতে অক্ষত নেই ম্যাগনামা মারইউসের ইতিহাস। শুধু বাহাউদ্দিন ইবনু শাদ্দাদ কেন, অন্য কোনো ইতিহাসবিদের বইতেই তার সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। লেখক এখানেও প্রতারণা করেছেন পাঠকের সাথে। নিজের কল্পনাকে তিনি বাহাউদ্দিন ইবনু শাদ্দাদের লেখা বলে চালিয়েছেন। ফলে পাঠক এই অংশ পড়ে ভাবতে বাধ্য হয় সে আসলে সত্য ইতিহাস পড়ছে।

মাওলানা ইসমাইল রেহানের আলোচনা থেকে স্পষ্ট আলতামাশ কীভাবে তার পাঠকদের সাথে রেফারেন্স দেওয়ার ভান করে প্রতারণা করেন। একই অপরাধ তিনি করেছেন তার লেখা সকল বইতেই। বারবার রেফারেন্স এনেছেন তাবারির কিন্তু বেশিরভাগই ভুয়া, তাবারি এমন কিছুই লেখেননি।

এই ধরনের একজন লেখককে ইতিহাসবিদ ও তার লেখা উপন্যাসকে ইতিহাসের বই ভাবার মাধ্যমে আমরা মূলত বিশুদ্ধ ইতিহাস থেকেই দূরে সরছি। এই বিষয়ে নিজেরা যেমন সচেতন হওয়া দরকার, তেমনই অন্যদের সচেতন করা দরকার।

---

[১২২]. উর্দু সংস্করণ, ১০৫। পরশমনী থেকে প্রকাশিত বাংলা অনুবাদে বাহাউদ্দিন শাদ্দাদের উদ্ধৃতিটি নেই। তবে আসাদ বিন হাফিয তার 'ক্রুসেড সিরিজ'-এ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। দেখুন, *ক্রুসেড*, ১/১৬০।

তুর্কি সিরিয়াল : আপদের নতুন নাম

সম্প্রতি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত বিভিন্ন সিরিয়াল নিয়ে বেশ আলাপ হচ্ছে। দ্বীনি ঘরানার অনেকে এগুলো বেশ উৎসাহের সাথে প্রমোট করছেন। এর পক্ষে নানা যুক্তিও দাঁড় করানো হচ্ছে। এখানেও দেওয়া হচ্ছে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতো সেই পুরোনো যুক্তি। কখনো বলা হচ্ছে এসব সিরিয়াল দেখে লোকে ইতিহাস শিখছে, কখনো বলা হচ্ছে এসব সিরিয়াল দেখে জিহাদি চেতনা ও ঈমানি গায়রত জাগছে। এসব সিরিয়াল দেখার বিধান কী হবে তা বিজ্ঞ মুফতিরাই ফতোয়া দেবেন ইনশাআল্লাহ। এ সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই। তবে কিছু পর্যবেক্ষণ ও প্রশ্ন আছে। সেগুলো তুলে ধরি।

১। যারা এসব সিরিয়াল দেখেন তাদের সাথে আলাপে জেনেছি, এসব সিরিয়ালে মিউজিক থাকে। নারীদের উপস্থিতিও থাকে বেশ। এই দুইটি বিষয় কোন কোন শর্তে বৈধ? এক ভাই যুক্তি দিয়েছেন হিন্দি সিরিয়ালে নারীদের কূটনামি দেখানো হয়। তুর্কি সিরিয়ালে এসব কূটনামি নাই। এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। নারী কুটনি হোক কিংবা সরল, এতে দৃষ্টি হেফাজতের মাসআলায় কোনো পরিবর্তন আসে না। অর্থাৎ প্রথম ধাপেই এসব সিরিয়ালে বেপর্দা ও মিউজিক থাকছে। এই দুটির কোনোটিই শরিয়ত অনুমোদিত নয়। প্রথমেই শরিয়াহ লঙ্ঘন করে যে কাজ শুরু তা থেকে কী করে ভালো কিছু আশা করা যায়?

২। অনেকে বলছেন যারা হলিউড মুভিতে অভ্যস্ত তারা এটা দেখতে পারে সমস্যা নাই। তাহলে দুই ক্ষতির অপেক্ষাকৃত কমটা বেছে নেওয়া হলো। এখানে প্রশ্ন হলো, এই সমাধান কি কোনো বিজ্ঞ ফকিহ ও মুফতি দিয়েছেন না নিজে নিজে বানানো হয়েছে। আজকাল এক সমস্যা হচ্ছে, সবাই সব বিষয়ে 'আমার মনে হয় ব্যাপারটা এমন' বলে মতামত দিচ্ছে। অথচ, বাস্তবতা হলো সবার মনে হওয়ার লেভেল এক না। সবার মনে হওয়া গুরুত্বপূর্ণও না।

হাদিসশাস্ত্রের ওপর পূর্ণ দখল আছে এমন হাফেজে হাদিস যদি কোনো হাদিস সম্পর্কে বলেন, আমি এই হাদিসটি চিনি না, বা শুনিনি তাহলে সেই বর্ণনা মুহাদ্দিসদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। কিন্তু আমি-আপনি যদি কোনো হাদিস সম্পর্কে এ কথা বলি? তাহলে এতে আমাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতাই প্রকাশ পাবে। হাফেজে হাদিস কোনো হাদিস না জানা মানে ওই হাদিসের অস্তিত্ব প্রশ্নবিদ্ধ, আর আমরা কোনো হাদিস না জানা মানে, আমাদের জানার পরিধি কত কম সেটা স্পষ্ট হওয়া। তফাতটা এখানে।

দিরিলিস বা এ জাতীয় সিরিয়াল সম্পর্কে যারা এমন সমাধান বলে দিচ্ছেন, প্রশ্ন হলো তারা এই বিষয়ে এভাবে সমাধান দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন কি না। বা তারা যাদের থেকে কপি করেছেন, তারাই এই সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার রাখেন কি না। কিছু মানুষ আছে মাইডিয়ার টাইপ। এদের কাছে দুনিয়ার সব গ্লাস অর্ধেক ভরা। কোনো কোনো গ্লাস যে পুরো খালি থাকে, এটা তারা মানতে চান না। এমন লোকদের বক্তব্য নেওয়ার ক্ষেত্রেও সতর্কতা দরকার।

যদিও বলা হচ্ছে, হলিউড মুভির পরিবর্তে এসব সিরিয়াল দেখা হবে, কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণে দেখছি, এসব সিরিয়ালের প্রতি মুভি এডিক্টদের ঝোঁক কমই, এগুলোর প্রতি মূল আকর্ষণ দ্বীনদার ঘরানার, যারা এতদিন মুভি-সিরিয়াল এসব কিছুই দেখতেন না। তো এমন দ্বীনদার, যারা এতদিন এগুলো দেখতেন না, এখন দেখা শুরু করেছেন এই ব্যাপারটা আমরা কীভাবে দেখব? এ সম্পর্কে করণীয়ই-বা কী হবে?

এমন বহু মানুষ দেখেছি যারা দ্বীনের পথে এসে সাথে সাথে মুভি দেখা ছেড়ে দিয়েছেন। কোনো সমস্যা হয়নি। এখন যে নতুন উসুল বানানো হচ্ছে, হলিউড মুভি ছাড়ার জন্য কম ক্ষতিকর তুর্কি সিরিয়াল দেখা উচিত, এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? এই কম ক্ষতিকর তুর্কি সিরিয়াল দেখার সময়সীমা কতদূর? কী পরিমাণ তুর্কি সিরিয়াল দেখলে এই মুভি-নেশা একেবারেই কেটে যাবে? মুভি-নেশা কাটার পর এই তুর্কি সিরিয়ালের নেশা কাটাবে কীভাবে? এর জন্য কি আবার তুলনামূলক কম ক্ষতিকর কিছু নিয়ে আসতে হবে? এত ধাপ অতিক্রম না করে এক ধাপেই কি মুভি দেখা ছাড়ার সুযোগ নেই? ব্যাপারটা কি এতই অসম্ভব?

৩। এসব সিরিয়ালে যে ইতিহাস বলা-দেখানো হচ্ছে, চরিত্রগুলো যেভাবে সত্যায়ন করা হচ্ছে এই বিষয়টি কি কেউ নিজে যাচাই করেছে? বা ইতিহাসে পারদর্শী কাউকে জিজ্ঞেস করেছে? নাকি নিজ থেকেই বলে দিচ্ছে 'এখানে ইতিহাস খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে'।

৪। এসব সিরিয়ালে বরেণ্য মুসলিম ব্যক্তিত্বদের চরিত্রে যারা অভিনয় করছে তারা এ যুগের মানুষ। এরা স্রেফ অভিনেতা। টাকার জন্য যে-কিছুতে অভিনয় করে। নানাভাবে এদের ফিসকও স্পষ্ট। এমনকি এদের কেউ কেউ আছে পাঁড় সেক্যুলার। কোনো ভিডিয়ো দেখলে সাধারণত এর দৃশ্য আমাদের মাথায় গেঁথে যায়। এখন কেউ একজন এমন সিরিয়াল দেখল। ধরা যাক, মুহাম্মাদ আল-ফাতিহকে নিয়েই। এরপর যখনই মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের আলোচনা আসবে

তার মাথায় ঘুরবে ওই সেক্যুলার নায়কের চেহারা। তার মনে হবে মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের চেহারা, গঠন সবই ছিল ওই নায়কের মতো।

এই বিষয়টি কেমন? কোনো অস্বস্তি লাগে কি না? না লাগলে কেন লাগে না?

৫। এসব সিরিয়ালে অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা ও নাজায়েজ সম্পর্ককে যেভাবে হালকা করে দেখানো হয়, এটা আমরা কীভাবে নিই? এই হারাম বিষয়টা কি সিরিয়ালের প্রভাবে আমাদের কাছে হালকা হয়ে ওঠে?

৬। সর্বশেষ কথা, এই বিষয়ে যারা ধুমধাম ফয়সালা শুনিয়ে দিচ্ছি, একশ একটা শক্ত যুক্তি হাজির করছি, তারা কি এই বিষয়ে কথা বলার অথরিটি? যদি না হই, তাহলে আমরা কি এই বিষয়ে কোনো প্রাজ্ঞ আলেমের সাথে কথা বলেছি? না বললে কেন বলিনি?

এই প্রশ্ন ও পর্যবেক্ষণগুলো তুলে ধরলাম। কোনো কিছু প্রমোট করার আগে এবং অন্যকে উৎসাহ দেওয়ার আগে আমরা এই বিষয়ে আরেকটু চিন্তাভাবনা করতে পারি। শেষ করার আগে প্রিয় ভাই ওমর আলি আশরাফের একটা কথা উদ্ধৃত করব, যা তিনি এক লেখায় লিখেছেন, যে জাতিকে জাগাতে কুরআনের আদেশ পারে না, রাসুলের হাদিস পারে না, সিরিয়া, ইরাকসহ বিধ্বস্ত জনপদগুলোতে মুসলমানের লাশ আর কান্না পারে না, পারে শুধু কিছু সিরিয়াল, তাদের ইনসাফের প্রতি আল্লাহ রহম করুন।

* * *

যে ইতিহাসবিদদের লেখা থেকে থাকতে হবে সতর্ক

আমরা প্রাচীন ইতিহাসবিদদের সংকলনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি। ইমাম তাবারির মতো ইতিহাসবিদরা তাদের সংকলনে সকল ধরনের বর্ণনা একত্র করে দিতেন। যেহেতু তারা সনদসহ উল্লেখ করেছেন ফলে তাদের রচনা থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলো পৃথক করা সহজ। তবে ইতিহাসবিদদের সবাই-ই এমন ছিলেন না। কেউ কেউ ছিলেন যারা নিজেদের ঘরানা ও মতবাদের কারণে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ইতিহাস লিখেছেন। তারা খুঁজে খুঁজে জাল-বানোয়াট বর্ণনা দিয়েই নিজেদের গ্রন্থ পরিপূর্ণ করেছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা এমনটা করেছেন নিজেদের মতবাদ ও চিন্তাকে প্রাধান্য দিতে। ফলে তাদের এসব গ্রন্থ পাঠে একজন পাঠক সত্য থেকে বিচ্যুত হবে। তাদের উপস্থাপিত মিথ্যাকেই মনে হবে সত্য ইতিহাস। এসব গ্রন্থ থেকেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে আমরা এমন কজন ইতিহাসবিদ সম্পর্কে আলোচনা করব।

মাসউদি ও মুরুজুয যাহাব

মাসউদির পুরো নাম আলি বিন হুসাইন বিন আলি বিন আবদুল্লাহ আল-মাসউদি। তার জন্ম বাগদাদে। জন্মসাল নির্দিষ্ট করে জানা যায় না। তবে তার মৃত্যু হয় ৩৪৬ হিজরিতে।[১২৩] বিভিন্ন এলাকা সফর করে তার প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়। ইতিহাস বিষয়ে তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দুটি গ্রন্থ হলো 'মুরুজুয যাহাব' ও 'আত-তানবিহ ওয়াল-ইশরাফ'। প্রাচ্যবিদদের কাছে মাসউদি ও তার ইতিহাসগ্রন্থ বেশ জনপ্রিয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা মাসউদির বই থেকে রেফারেন্স টানার ক্ষেত্রে কার্পণ্য করেন না। এর একটি বড় কারণ হলো, মাসউদির বই সামনে রাখলে ইসলামের ইতিহাসের বিকৃত চিত্র উপস্থাপনের কাজটি সহজ হয়ে যায়।

মাসউদি সম্পর্কে আলেমদের বক্তব্য

১। ইমাম যাহাবি বলেন, সে ছিল মুতাযিলি।[১২৪]

---

[১২৩]. মাসউদির জীবনী জানতে দেখুন, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৫/৫৬৯; *আল-ফিহরিসত*, ২১৯; *মুজামুল উদাবা*, ১৩/৯০; *আল ইবার*, ২/২৬৯; *ফাওয়াতুল ওফায়াত*, ২/৯৪; *তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ*, ৩/৪৫৬; *লিসানুল মিযান*, ৪/২২৪; *আন নুজুমুয যাহিরা*, ৩/৩১৫; *শাজারাতুয যাহাব*, ২/৩৭১।

[১২৪]. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৫/৫৬৯।

২। ইবনু হাজার আসকালানি বলেন, সে ছিল শিয়া ও মুতাযিলি।[১২৫]

৩। ইমাম ইবনু তাইমিয়া বলেন, মাসউদির ইতিহাসগ্রন্থে এত বেশি মিথ্যা আছে যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষে গণনা করাও সম্ভব নয়।[১২৬]

৪। কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি লিখেছেন, মাসউদি হলো কৌশলী বিদআতি।[১২৭]

৫। আল্লামা তাজউদ্দিন সুবকি লিখেছেন, সে ছিল মুতাযিলি।[১২৮]

মুরুজুয যাহাবের পর্যালোচনা

১। মাসউদির সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার। এই গ্রন্থের শুরুতেই মাসউদি তার আকিদা-বিশ্বাস প্রচার করেছেন। গ্রন্থের শুরুতে হজরত আলি রা. সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে শিয়াদের ইমামতের আকিদা তুলে আনা হয়েছে, মাসউদি স্পষ্ট লিখেছেন, শিয়াদের ইমামরা হলো আসমানের আলো। তাদের কাছেই ইলম লুক্কায়িত আছে। সকল বিষয় তাদের কাছেই সমর্পণ করতে হবে।[১২৯]

২। মুরুজুয যাহাব গ্রন্থে মাসউদি ইতিহাস, ঘটনা, গল্প, উপকথা ইত্যাদি নানা বিষয় একত্রে এনেছেন। মাসউদি একের পর এক ঘটনা নির্দ্বিধায় বর্ণনা করে গিয়েছেন শিয়া রাবিদের কাছ থেকে, কিন্তু কোথাও উল্লেখ করেননি সনদ কিংবা পাঠককেও করেননি সতর্ক।

৩। মাসউদির রচনায় বিশেষভাবে এসেছে সাহাবায়ে কেরামের যুগে সংঘটিত ফিতনার বিবরণ। এই অংশে প্রায় ৪৮ পৃষ্ঠা আলোচনা করা হয়েছে। অথচ হজরত আবু বকর রা.-এর শাসনকালের আলোচনা এসেছে মাত্র ৭ পৃষ্ঠা। হজরত উসমান রা.-এর আলোচনা এসেছে মাত্র ১৮ পৃষ্ঠা। মুশাজারাতে সাহাবার অংশটি নিয়ে মাসউদি দীর্ঘ আলোচনা এনেছেন এবং সাহাবিদের ওপর নানা ধরনের অন্যায় অপবাদও দিয়েছেন (নাউজুবিল্লাহ)। পরের গবেষকদের অনেকে মাসউদির এসব মিথ্যাচার চোখ বুজে অনুসরণ করতে গিয়ে বিপদে পড়েছেন।

---

[১২৫]. *লিসানুল মিযান*, ৪/২২৫।
[১২৬]. *মিনহাজুস সুন্নাহ*, ৪/৮৪।
[১২৭]. *আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম*, ১৯২।
[১২৮]. *তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ*, ২/৩০৭।
[১২৯]. দেখুন, মুরুজুয যাহাবের ভূমিকা।

৪। ডক্টর সুলাইমান আবদুল্লাহ মাসউদির 'মুরুজুয যাহাব' নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা শেষে লিখেছেন, মাসউদি ছিলেন শিয়াঘেঁষা। তার এই পক্ষপাতের প্রকাশ তিনি ঘটিয়েছেন খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া ও আব্বাসি শাসনামলের ইতিহাস আলোচনার সময়।[১৩০]

আবুল ফারাজ ইস্ফাহানি ও কিতাবুল আগানি

আবুল ফারাজ ইস্ফাহানির জন্ম ২৮৪ হিজরিতে। বাগদাদ ও কুফা এই দুই শহরে সে বেড়ে ওঠে। সাহিত্যের প্রতি তার অনুরাগ ছিল, নিজেও ছিল একজন কবি। তবে তার কবিতায় অশ্লীলতার খুব ব্যাপকতা ছিল। তার সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-আগানি'। এই গ্রন্থে কবি-সাহিত্যিকদের নানা অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে আছে নানা গালগপ্পো ও প্রচুর অশ্লীল বর্ণনা। গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে এই বইয়ের কোনো গ্রহণযোগ্যতাই নাই। কিন্তু ওরিয়েন্টালিস্ট ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত বুদ্ধিজীবীরা প্রায়ই এই বইকে অথেনটিক সোর্স হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা চালায়। সম্প্রতি বাংলা ভাষায়ও কেউ কেউ এই গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে মুসলমানদের সংগীত চর্চা শিরোনামে প্রবন্ধ ও বইপত্র লেখার চেষ্টা চালাচ্ছেন।[১৩১]

আবুল ফারাজ ইস্ফাহানি সম্পর্কে আলেমদের মূল্যায়ন

১। হেলাল বিন মুহাসসিন সবি বলেন, আবুল ফারাজ ইস্ফাহানি ছিল চরম নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন একজন মানুষ। দিনের পর দিন সে গোসল করত না, কাপড় বদলাত না। লোকেরা তাকে এড়িয়ে চলত, তার মজলিসকেও এড়িয়ে যেত কারণ সে ছিল নিজের চরিত্র, পোশাক ও কর্ম সকল দিক থেকেই নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন।[১৩২]

২। আবু মুহাম্মাদ হাসান বিন হুসাইন বলেন, সে ছিল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী।[১৩৩]

৩। ইবনুল জাওযি বলেন, তিনি তার গ্রন্থে পাপাচার উসকে দিয়েছেন। মদ্যপানকে হালকা করে দেখিয়েছেন। যে-কেউই গভীরভাবে তার 'আল-

---

[১৩০]. বিস্তারিত জানতে পড়ুন, *মানহাজুল মাসউদি ফি কিতাবাতিত তারিখ*।

[১৩১]. তার জীবনী জানতে দেখুন, *আল-ফিহরিসত*, ১৬৬; *তারিখু বাগদাদ*, ১১/৩৯৮; *আল-মুনতাজাম*, ৭/৪; *মুজামুল উদাবা*, ১৩/৯৩; *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, ৮/৫৮১; *ওফায়াতুল আয়ান*, ৩/৩০৭; *মিযানুল ইতিদাল*, ৩/১২৩; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৬/২০১; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১১/২৬৩; *লিসানুল মিযান*, ৪/২২১; *শাজারাতুয যাহাব*, ৩/১৯; *আল-আলাম*, ৪/২৭৮;

[১৩২]. *মুজামুল উদাবা*, ১৩/১০০।

[১৩৩]. *তারিখু বাগদাদ*, ১১/৩৯৮।

আগানি' গ্রন্থ পর্যবেক্ষণ করলে সেখানে শুধু ঘৃণ্য আর খারাপ কাজের বর্ণনাই পাবেন।[১৩৪]

৪। ইমাম ইবনু তাইমিয়া সবসময় আবুল ফারাজ ইস্ফাহানির বর্ণনা ও লেখার ব্যাপারে আপত্তি করতেন।[১৩৫]

৫। ইমাম যাহাবি বলেন, সে আজিব আজিব সব ঘটনা ও বর্ণনা নিয়ে এসেছে।[১৩৬]

আল-আগানি সম্পর্কে পর্যালোচনা

১। আবুল ফারাজ ইস্ফাহানির এই গ্রন্থ নানা কারণে প্রশ্নবিদ্ধ। এই গ্রন্থে সে চরম পর্যায়ের মিথ্যুক ব্যক্তিদের থেকে বর্ণনা এনেছে। যেমন হাইসাম বিন আদি আল-কুফি। এই ব্যক্তিকে ইমাম বুখারি, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাইন, ইমাম আবু দাউদ, আহমাদ আল-ইজলি প্রমুখ মিথ্যুক বলেছেন। ইমাম নাসায়ি ও আবু হাতেম বলেছেন মাতরুকুল হাদিস। আবু যুরআ বলেছেন, সে কিছুই না।[১৩৭] এই ব্যক্তি থেকে আবুল ফারাজ তার বইতে ৫০টির বেশি বর্ণনা এনেছে। হিশাম বিন মুহাম্মাদ বিন সায়েব কালবি থেকেও এনেছে অনেক বর্ণনা।[১৩৮] এই ধরনের মোট ২৩ জন চরম মিথ্যুক রাবি থেকে আবুল ফারাজ ইস্ফাহানি তার বইতে শত শত বর্ণনা এনেছে।[১৩৯]

২। এই বইতে সালাফে সালেহিনের মদ্যপানের এমন সব বর্ণনা আছে যার কোনো সত্যতা ইতিহাসে নেই। বিশেষ করে ইমাম হুসাইন সম্পর্কে এমন বেশ কিছু অতিরঞ্জিত বর্ণনা এনেছে সে। তার এসব বর্ণনা এতটাই উৎকট যা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনারও অবকাশ নেই।

৩। 'আল-আগানি' গ্রন্থে হাজারের বেশি কবিতা এনেছে আবুল ফারাজ ইস্ফাহানি। এসব কবিতায় আছে মদ, অবৈধ প্রেম ও অশ্লীল সব বিষয়ে বর্ণনা। তার এই বইতে অনুপস্থিত সচেতন ইতিহাসবিদের লেখার ধারা। বরং আজগুবি সব ঘটনা আর গল্পেই পরিপূর্ণ পুরো বই।

---

[১৩৪]. *আল-মুনতাজাম*, ৭/৪০।

[১৩৫]. *তাসদিরুল আগানি*, ১/১৯।

[১৩৬]. *মিযানুল ইতিদাল*, ৩/১২৩।

[১৩৭]. দেখুন, *মিযানুল ইতিদাল*, ৪/৩২৪; *লিসানুল মিযান*, ৬/২০৯।

[১৩৮]. তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 'তারিখে তাবারি'র অধ্যায়ে এসেছে।

[১৩৯]. বিস্তারিত জানতে দেখুন, ওয়ালিদ আল-আযমি রচিত 'আস-সাইফুল ইয়ামানি ফি নাহরিল আসফাহানি'।

ইয়াকুবি ও তারিখে ইয়াকুবি

ইয়াকুবির পূর্ণ নাম আহমাদ বিন আবি ইয়াকুব ইসহাক বিন জাফর বিন ওয়াহাব বিন ওয়াজিহ আল-ইয়াকুবি। তার শুরুর জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। তবে জীবনের বেশিরভাগ সময় সে ছিল আব্বাসি খিলাফাহর দিওয়ান বিভাগের কর্মচারী। এজন্য কাতেব আব্বাসি নামেও সে বেশ প্রসিদ্ধ। জীবনের বেশিরভাগ সময় সরকারি নথিপত্রের সাথে থাকার কারণে তার কাছে অনেক তথ্য জমা হয়। এ ছাড়া কিছুদিন সে বিভিন্ন এলাকা সফর করে। ফলে মানুষের মুখ থেকেও অনেক তথ্য জানতে পারে। ভূগোলে তার বেশ ভালো দক্ষতা থাকায় সে এই বিষয়ে একটি বই রচনা করে যার নাম 'আল-বুলদান'। ভূগোল বিষয়ে এটি মুসলমানদের শুরুর দিকের রচনা। তবে তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তারিখুল ইয়াকুবি'। এই গ্রন্থে সৃষ্টির শুরু থেকে ২৫৯ হিজরি পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। ২৮৪ বা ২৯২ হিজরিতে সে মারা যায়।[১৪০]

তারিখুল ইয়াকুবি সম্পর্কে পর্যালোচনা

১। ইয়াকুবি ছিল ইমামিয়া শিয়া। তার এই বিশ্বাসের প্রতিফলন সে ঘটিয়েছে তার বইয়ের ছত্রে ছত্রে। সে হজরত আলি রা.-কে খলিফা স্বীকার করলেও প্রথম তিন খলিফা আবু বকর, উমর ও উসমান রা.-কে খলিফা বলে স্বীকৃতি দেয়নি। তাদের জীবনী আলোচনার সময় সে শুধু লিখেছে, তারপর ক্ষমতায় বসলেন।

২। প্রসিদ্ধ সকল সাহাবিকেই সে নানা অপবাদ দিয়েছে, গালাগালি করেছে। তার এই আক্রমণের শিকার হয়েছেন যারা তারা হলেন, হজরত আয়েশা রা.[১৪১], খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ[১৪২], আমর ইবনুল আস[১৪৩], মুয়াবিয়া[১৪৪]। এই গ্রন্থে সে নানা মিথ্যাচার ও অপব্যাখ্যা করেছে যেমন সে লিখেছে, হজরত আলি রা. ছিলেন খেলাফতের যোগ্য, কিন্তু তাকে হটিয়ে বঞ্চিত করে অন্যরা খিলাফত নেয়। ইয়াকুবির মতে কুরআনের এই আয়াত—

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾

---

১৪০. *মুজামুল উদাবা*, ৫/১৪৫; *আল-আলাম*, ১/৯৫।
১৪১. *তারিখুল ইয়াকুবি*, ২/১৮০।
১৪২. *তারিখুল ইয়াকুবি*, ২/১৩১।
১৪৩. *তারিখুল ইয়াকুবি*, ২/২২২।
১৪৪. *তারিখুল ইয়াকুবি*, ২/২৩২।

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম। [সুরা মায়িদাহ : ৩]

অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আলি রা. সম্পর্কে।[১৪৫]

৩। ইয়াকুবির আলোচনায় ভারসাম্য নেই, আছে অন্যায় পক্ষপাত যার কোনো মাপকাঠি তার নিজের কাছেই স্থির ছিল না। যেমন উমাইয়াদের আলোচনার সময় সে তাদেরকে মুলুক বলে অভিহিত করলেও আব্বাসিদের বেলায় এসে তাদেরকে খলিফা সম্বোধন করেছে। এমনকি 'আল-বুলদান' গ্রন্থে সে আব্বাসি আমলকে আদ-দাওলাতুল মুবারাকাহও বলেছে।[১৪৬] মূলত আব্বাসি খলিফাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্যই সে এমনটা করেছে।

৪। ইয়াকুবির বইয়ের প্রথম অংশে এসেছে সৃষ্টির শুরু থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সময়কালের আলোচনা। বিভিন্ন নবি-রাসুলদের জীবনী। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো এই ক্ষেত্রে ইয়াকুবি কুরআন ও হাদিস থেকে তথ্য নেওয়ার পরিবর্তে তথ্য নিয়েছে বিভিন্ন লোককথা ও ইসরাইলি বর্ণনা থেকে। এমনকি সে তাওরাত থেকেও অনেক তথ্য নিয়েছে।[১৪৭] তার সময়কার খ্রিষ্টানদের হাতে যে বিকৃত বাইবেল ছিল সেখান থেকেও অনেক তথ্য উদ্ধৃত করেছে। এভাবে সে ইসলামের ইতিহাস লিখেছে অনির্ভরযোগ্য সব সূত্র থেকে। এড়িয়ে গেছে কুরআন ও হাদিস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান।

তারিখুল ইয়াকুবি সম্পর্কে ডক্টর মুহাম্মাদ বিন সালেহ আস-সালামির মূল্যায়ন উল্লেখ করে এই আলোচনার সমাপ্তি টানছি। তিনি লিখেছেন, ওরিয়েন্টালিস্ট ও তাদের মানসপুত্রদের যারা ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামের রিজালদের ব্যাপারে অপবাদ দিতে চায় তাদের কাছে 'তারিখুল ইয়াকুবি'ই নির্ভরযোগ্য উৎস। অথচ বাস্তবতা হলো ইলমি দৃষ্টিকোণ থেকে এই বইয়ের কোনো মূল্যই নেই।[১৪৮]

নাহজুল বালাগাহ ও বিভ্রান্তি নিরসন

'নাহজুল বালাগাহ'। শিয়াদের খুব প্রিয় গ্রন্থ। তারা প্রচার করে থাকে এই গ্রন্থটি সরাসরি হজরত আলি রা. লিখেছেন। যেমন অন্যধারা থেকে অনূদিত 'নাহজুল বালাগাহ'র প্রচ্ছদে লেখক হিসেবে হজরত আলি রা.-কেই উপস্থাপন

---

[১৪৫]. *তারিখুল ইয়াকুবি*, ২/৪৩।

[১৪৬]. *আল-বুলদান*, ৩০৩।

[১৪৭]. *তারিখুল ইয়াকুবি*, ১/৩৯।

[১৪৮]. *মানহাজু কিতাবাতিত তারিখিল ইসলামি*, ৪৭৪।

করা হয়েছে। তবে শিয়াদের মধ্যে যারা কিছুটা পড়ুয়া তারা অবশ্য বলে, এই বইয়ের লেখক হজরত আলি রা. নন। এই বইয়ের সংকলক হলেন সাইয়েদ শরিফ মুরতাযা[১৪৯]। তবে আলি রা. রচিত না হলেও এই গ্রন্থের সকল ভাষণ, দোয়া, অসিয়ত, পত্র ও সংক্ষিপ্ত বাণীসমূহ আলি রা. থেকে প্রমাণিত। মোটাদাগে শিয়া এবং শিয়া প্রভাবিত লেখকরা 'নাহজুল বালাগাহ' সম্পর্কে এমন দাবিই করে থাকে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন বইপত্রেও দেখা যায় নির্দ্বিধায় 'নাহজুল বালাগাহ' থেকে হজরত আলি রা.-এর বিভিন্ন বাণী উদ্ধৃত করা হচ্ছে। তাই এই বইটি সম্পর্কেও কিছুটা আলোকপাত করা দরকার।

'নাহজুল বালাগাহ' গ্রন্থের লেখক শরিফ মুরতাযা ছিল কট্টরপন্থি শিয়া। তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবি লিখেছেন, সে ছিল রাফেজি ও মুতাযিলি। সে অনেক বই রচনা করেছে। 'নাহজুল বালাগাহ' গ্রন্থটিও তার রচনা বলে ধরা হয়। যদি কেউ এই গ্রন্থ পড়ে তাহলে সে নিশ্চিত হবে এখানে হজরত আলি রা.-এর ওপর অনেক মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে।[১৫০]

দেখা গেল 'নাহজুল বালাগাহ' গ্রন্থটিই একজন শিয়ার লেখা যার মৃত্যুসাল ৪৩৬ হিজরিতে। সুতরাং একে হজরত আলি রা.-এর রচনা বলে চালানো সুস্পষ্ট মিথ্যাচার।

নাহজুল বালাগাহ সম্পর্কে আলেমদের মূল্যায়ন

১। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন, এই গ্রন্থের লেখক অন্য মানুষদের কথাকে হজরত আলি রা.-এর কথা বলে চালিয়ে দিয়েছে। এই গ্রন্থে সে হজরত আলি রা.-এর খুতবা বলে অনেকগুলো খুতবা উল্লেখ করেছে। এগুলো যদি সত্য হতো তাহলে অবশ্যই এই গ্রন্থের আগে অন্য গ্রন্থেও এর উল্লেখ থাকত (যেহেতু হজরত আলি রা. ও সংকলকের মাঝে প্রায় সাড়ে তিন শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছিল), কিন্তু কোথাও এসবের কোনো উল্লেখ নেই। তাহলে প্রশ্ন জাগে, এসব খুতবা সে কোনো গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছে? এসবের সনদই-বা কী?[১৫১]

---

১৪৯. এই বইয়ের সংকলক কে তা নিয়ে শিয়াদের মধ্যেই তিনটি মত আছে। কারও মতে সাইয়েদ শরিফ মুরতাযা, কারও মতে তার ভাই শরিফ রেজা, আবার কারও মতে দুই ভাই মিলেই কাজটি করেছেন।

১৫০. *মিযানুল ইতিদাল*, ৩/১২৪।

১৫১. *মিনহাজুস সুন্নাহ*, ৮/৫৫।

২। খতিব বাগদাদিও আলি রা.-এর নামে প্রচলিত এসব খুতবাকে বানোয়াট বলেছেন।[১৫২]

৩। কাজি ইবনু খাল্লিকানও লিখেছেন, 'নাহজুল বালাগাহ' গ্রন্থটি হজরত আলি রা.-এর রচনা নয় বরং মুরতাযার ভাই রাজির সৃষ্টি।[১৫৩]

৪। ইমাম যাহাবি লিখেছেন, 'নাহজুল বালাগাহ' গ্রন্থটি মুরতাযার সৃষ্টি নাকি তার ভাই রাজির তা নিয়ে মতভেদ আছে।[১৫৪]

৫। ইমাম ইয়াফেয়িও লিখেছেন, এই গ্রন্থ হজরত আলি রা.-এর রচনা নয়।[১৫৫]

৬। শাইখ আলি সাল্লাবি লিখেছেন, যেসব গ্রন্থ সাহাবায়ে কেরামের সময়কালকে সবচেয়ে বেশি বিকৃত করেছে তার মধ্যে রয়েছে 'নাহজুল বালাগাহ' নামক গ্রন্থটি। সনদ এবং মতন উভয় বিচারেই এই গ্রন্থ পরিত্যাজ্য। এই গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে আলি রা.-এর ইনতিকালের তিন শতাব্দী পরে, তাও কোনো সনদ ছাড়া। এই গ্রন্থের লেখক শরিফ রেজা মুহাদ্দিসদের কাছে অগ্রহণযোগ্য। এই কিতাব থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক, বিশেষ করে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কিত কিছু গ্রহণ করার ক্ষেত্রে।[১৫৬]

এবার দেখা যাক নাহজুল বালাগাহ গ্রন্থে কী কী সমস্যা আছে

১। এই গ্রন্থের শুরুতে যে খুতবা দেওয়া আছে তাতে প্রথম তিন খলিফাকে নানা অপবাদ দেওয়া আছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় হজরত আলি রা. দূরে থাক, আহলুস সুন্নাহর কোনো অনুসারীও এমন কথা লিখতে পারে না।

২। এই বইয়ের ভাষারীতি সাহাবিদের যুগের ভাষারীতি ও অলংকারের সাথে মেলে না।

৩। এই বইতে মুতাযিলাদের অনেক পরিভাষার ব্যবহার আছে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে যেগুলো ব্যবহৃতই হয়নি কোনোদিন। এ থেকেও বোঝা যায় এই বইয়ের মূল আলোচনা সাহাবিদের যুগের অনেক পরে অন্য কেউ লিখেছে, আলি রা. নন।

---

[১৫২]. *আল-জামি লি আখলাকির রাবি ওয়া আদাবিস সামি*, ২/১৬১।
[১৫৩]. *ওফায়াতুল আয়ান*, ৩/৩১৩।
[১৫৪]. *তারিখুল ইসলাম*, ৯/৫৫৮।
[১৫৫]. *মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকজান*, ৩/৪৩।
[১৫৬]. *আমিরুল মুমিনিন আল-হাসান বিন আলি বিন আবি তালিব*, ৯

৪। এই বইতে সরাসরি আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করা হয়েছে।[১৫৭] এই কথাকে আবার সম্পৃক্ত করা হয়েছে হজরত আলি রা.-এর দিকে। অথচ মুতাযিলা ছাড়া অন্য কেউই এমন কথা বলার কথা নয়।

৫। এই বইতে প্রচুর হাদিসকে হজরত আলি রা.-এর কথা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। গর্হিত এই অপরাধটি করেছে এর সংকলক। যেসব হাদিসকে এই গ্রন্থে হজরত আলি রা.-এর কথা বলে চালানো হয়েছে এমন কিছু হাদিস হলো—

মুসলিম, ২৬৯৯, *ইবনে মাজাহ*, ২২৫, *তিরমিজি*, ২৯৪৫, *আবু দাউদ*, ৩৬৪৩, *মুসনাদে আহমাদ*, ৭৪২৭, *আল-মুজামুল কাবির*, ৫৮৯, *শুয়াবুল ঈমান*, ৭২৫৬।

৬। এই বইতে সাহাবি ও তাবেয়িদের অনেক বক্তব্যকে হজরত আলি রা.-এর বক্তব্য বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন—

মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, ২৬১১৮, *সুনানুদ দারেমি*, ৩৪৩, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন*, ৩১২, *আল-মুজামুল কাবির*, ১০৩৮৮।

* * *

---

[১৫৭]. *নাহজুল বালাগাহ*, ১/১৫।

ওরিয়েন্টালিস্টদের ইতিহাসচর্চা : বিষে ভরা মধু

ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবাদ মানে প্রাচ্য সংক্রান্ত বিদ্যা। যে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা করে তাকে বলা হয় প্রাচ্যবিদ। আরবিতে প্রাচ্যবাদকে বলা হয় استشراق বা ইসতিশরাক। এ শব্দটি এসেছে شرق থেকে। এর অর্থ প্রাচ্য। استفعال باب থেকে এসে অর্থ হয়েছে প্রাচ্যকে কামনা করা বা প্রাচ্যকে জানতে চাওয়া। যারা প্রাচ্য নিয়ে গবেষণা করেন তাদের বলা হয় মুসতাশরিকুন। ইংরেজিতে বলা হয় ওরিয়েন্টালিস্ট।

প্রাচ্যবাদের সূচনা হয়েছিল মুসলমানদের হাতে আন্দালুস জয়ের পরে। আন্দালুস জয়ের পর মুসলমানরা এখানে গড়ে তুলেছিলেন এক সমৃদ্ধ শাসনব্যবস্থা। ইনসাফ, নাগরিক অধিকার, সাম্য, শিক্ষা, জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে অল্পদিনেই আন্দালুস হয়ে ওঠে পরিচিত। এখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অমুসলিমদের শিক্ষা নেওয়ারও সুযোগ ছিল। এই সংবাদ জেনে কিছু পাদরি কুরআন ও আরবি সাহিত্য পড়াশোনা শুরু করে। তারা মুসলিম বিজ্ঞানীদের ছাত্রত্ব গ্রহণ করে বিভিন্ন শাস্ত্র বিশেষ করে দর্শন, চিকিৎসা এবং গণিত বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করে এবং আরবি গ্রন্থাবলি তাদের ভাষায় অনুবাদ করে। ফলে ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রগুলোর সাথে ইউরোপিয়ানরা পরিচিত হয়ে ওঠে।

আন্দালুস থেকে নিজ দেশে ফেরার পর এই ইউরোপিয়ান শিক্ষার্থীরা আরব সংস্কৃতি ও প্রসিদ্ধ জ্ঞানীদের গ্রন্থাবলি ছড়িয়ে দিলো। তারা আরবি ভাষা চর্চার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে সেগুলোতে তা চর্চা করত এবং লাতিন ভাষায় অনুবাদ করত। তখন পুরো ইউরোপজুড়ে আরবির কোনো বিকল্প ছিল না। জ্ঞানের একমাত্র ভাষা ছিল আরবি। এভাবে ছয়শ বছর আরবি গ্রন্থাবলির ওপর তারা নির্ভরশীল ছিল এবং প্রতি যুগেই কিছুসংখ্যক লোক শুধু আরবি ভাষা ও ইসলামচর্চায় মগ্ন থাকত। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এভাবেই চলল। অতঃপর যখন তারা ইসলামি বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করল আর মুসলমানদের শক্তি ক্রমশ দুর্বল হতে লাগল তখন তারা বিশৃঙ্খলাকে কাজে লাগিয়ে মূর্খ মালিকদের কাছ থেকে স্বল্পমূল্যে আরবি জ্ঞানের পাণ্ডুলিপিসমূহ ক্রয় করে অথবা চুরি করে তাদের দেশে স্থানান্তরিত করে। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর সময়ে যা আড়াই লক্ষ খণ্ডে গিয়ে পৌঁছে। ১৮৭৩ সালে প্যারিসে প্রাচ্যবিদদের প্রথম সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেখানে তারা প্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা উপস্থাপন করে। এ ধারা আজও চলমান।

প্রাচ্যবাদের কারণসমূহ

১। ধর্মীয় কারণ: প্রাচ্যবাদের প্রধান কারণ হলো ধর্মীয়। এর মধ্যে মোট তিনটি বিষয় রয়েছে।

একটি হলো পাশ্চাত্যজগৎ। মানুষ তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের দুর্বল দিকগুলো এবং পাদরিদের অপকর্ম সম্পর্কে যেন অবগতি লাভ না করে সেজন্য তাদের দৃষ্টিকে এদিক থেকে ফেরাতে ইসলামের ব্যাপারে মন্দ ধারণা পাশ্চাত্যের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া।

দ্বিতীয়টি হলো ইসলামের শক্তিমত্তা ও আধ্যাত্মিকতার ভয়ে এবং ইসলাম যাতে বিজয়ীরূপে টিকে থাকতে না পারে সেজন্য ইসলামের বিকৃতি সাধন এবং ভ্রান্তিসমূহ অনুপ্রবেশ ঘটানো।

তৃতীয়টি হলো খ্রিষ্টবাদ ও ইহুদিবাদ প্রচার এবং মিশনারি তৎপরতা জোরদার করা। সাথে সাথে পরবর্তী মুসলিম প্রজন্মের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেওয়া যাতে তারা খ্রিষ্টবাদ গ্রহণ করে এবং ইসলাম ও মুসলমানবিদ্বেষী হয়ে যায়।

২। সাম্রাজ্যবাদী কারণ: এর মধ্যে দুটি বিষয়

একটি হলো ক্রুসেডের যুদ্ধে পরাজয়ের পর পশ্চিমা বিশ্ব আরব রাষ্ট্রগুলো দখল করার আশা ছেড়ে দেয়নি বরং তারা এ রাষ্ট্রগুলোর ধর্ম, সভ্যতা ও ঐতিহ্য স্টাডি করার প্রতি মনোযোগী হয়, যেন তা দুর্বল করে দিতে পারে এবং দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে যেন সহযোগিতা করতে পারে। যখন তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাব সেগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন জাতিসমূহের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে দুর্বল করার প্রয়াস চালায়, তারা তাদের চিন্তা-চেতনার মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়। তাদের মূল্যবোধ, নিজস্ব আকিদা-বিশ্বাস নষ্ট করে দেয়। ফলে তারা আর নিজস্ব শক্তিতে দাঁড়াতে পারে না। সর্বক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে মানদণ্ড গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো প্রাচ্যের দেশগুলোতে যে ঐতিহাসিক জাতিসত্তাসমূহ রয়েছে, ইসলাম আসার কারণে তাদের ভাষা, চিন্তা-চেতনা ও আকিদা-বিশ্বাস একাকার হয়ে গিয়েছিল। এবং ইসলামের ছোঁয়া পেয়ে উন্নত জাতিতে পরিণত হয়েছিল। তাদের মাঝে আবার পূর্বের জাতীয়তা জাগ্রত করার চেষ্টা চালায়,

যেমন মিশরে ফিরাউনি মতবাদ; সিরিয়া, লেবানন এবং ফিলিস্তিনে ফিনিসীয়, ইরাকে অ্যাসিরীয় ইত্যাদি। যেন উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ শক্তি বিনষ্ট হয়, স্বাধীনতা ও নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

৩। বাণিজ্যিক কারণ: পাশ্চাত্যের দেশগুলো প্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এর মাধ্যমে তারা তাদের পণ্য প্রাচ্যে বাজারজাত করে এবং প্রাচ্যের খনিজসম্পদ স্বল্পমূল্যে ক্রয় করে। আর প্রাচ্যের নিজস্ব কলকারখানা ও উৎপাদনশক্তি ধ্বংস করে দেয়।

৪। রাজনৈতিক কারণ: বিভিন্ন ইসলামি রাষ্ট্র স্বাধীন হওয়ার পর সেসব দেশে তাদের দূতাবাসের অধীনে সাংস্কৃতিক এটাচি প্রতিষ্টা করে এবং এর মাধ্যমে সেসব দেশের বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক লোকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের আদর্শ-চেতনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে এবং পশ্চিমা আদর্শ ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। আরব ও প্রাচ্যের দেশগুলোকে পারস্পরিক দ্বন্দে জড়িয়ে রাখার জন্য ষড়যন্তের জাল বিস্তার করে। আরব রাষ্ট্রগুলোকে পরামর্শ ও সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। নেতৃস্থানীয় লোকজন ও সাধারণ মানুষের দুর্বলতাকে চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী কাজ করে। যেন ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবাদের জন্য হুমকি না হয়ে দাঁড়ায়।

৫। জ্ঞানগত কারণ: প্রাচ্যবিদদের খুবই অল্পসংখ্যক একটা শ্রেণি রয়েছে যারা ইসলাম ও আরবি ভাষা চর্চা করে নিছক জ্ঞানচর্চা হিসেবে। কোনো ধরনের ষড়যন্ত্রের মানসিকতা তাদের থাকে না। এ কারণে তাদের গবেষণা অনেক সময় সত্যকে উন্মোচন করে দেয়। অনেকে আবার ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়। তাই তারা সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সামাজিক কোনো ধরনের সহযোগিতা পায় না। তখন তাদের গবেষণাও কারও কাছে গ্রহণীয় হয় না। আবার মৌলিক ইসলামী জ্ঞান না থাকার কারণে ত্রুটি থেকেও মুক্ত নয়।[১৫৮]

প্রাচ্যবাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্প

প্রাচ্যবাদ সাধারণত দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রগুলো নিয়ে গবেষণা করে।

১। ইসলাম সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল দিক থেকে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করা।

২। ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্র থেকে উপকৃত হওয়া।

---

[১৫৮]. প্রাচ্যবাদ: পরিচয় ও প্রকৃতি, আবদুর রাজ্জাক নদভি। ইসলামটাইমস টুয়েন্টিফোর, ২০ অক্টোবর ২০২০।

প্রথম ক্ষেত্রে তারা নানা মাধ্যম অবলম্বন করে। কখনো তারা প্রচার করে কুরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মস্তিষ্কপ্রসূত। কখনো বলে, সিরিয়া গমনকালে পাদরির কাছ থেকে ইশারা পেয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে নবি দাবি করতে উদ্বুদ্ধ হন। কখনো তারা প্রচার করে হাদিসশাস্ত্র সংকলিত হয়েছে নবিজির ইনতিকালের দুইশ বছর পর, সুতরাং এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কখনো তারা রজম বা কিসাসের বিধান নিয়ে সংশয় তৈরি করে দেয়। তারা প্রচার করে জ্ঞানেবিজ্ঞানে মুসলমানদের কোনো অবদান নেই। তারা শুধু গ্রিক জ্ঞানকে আরবিতে অনুবাদ করেছে মাত্র। এভাবে নানা দিক থেকে তারা ইসলামের ওপর আক্রমণ চালায়। মুসলমানদের মনে তৈরি করে সংশয়, সন্দেহ ও হীনম্মন্যতা।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে এমন লোকের সংখ্যা মূলত খুবই কম। যারা করে তারা আবার সেক্যুলারিজম, বস্তুবাদ, ডারউইনিজমসহ নানা উদ্ভট মতবাদে বিশ্বাসী। ফলে তাদের রচনা থেকে একজন মুসলমান পাঠকের উপকৃত হওয়ার সুযোগ থাকে না।

নিজেদের মতবাদ প্রচার করার জন্য প্রাচ্যবাদ সাধারণত নিম্নে বর্ণিত কাজগুলো করে থাকে।

১। তারা প্রচুর গ্রন্থ রচনা করে। এসব গ্রন্থে সূক্ষ্মভাবে ছড়িয়ে দেয় সংশয় ও সন্দেহ। আঘাত করে ইসলামি তামাদ্দুন ও তুরাসের ওপর।

২। বিশেষ গবেষণামূলক ম্যাগাজিন ও পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। এসবের মাধ্যমে কোনো অঞ্চলের মেধাবী তরুণ ও পড়ুয়া লোকদের মগজ ধোলাই করা হয় যেন সে এলাকায় সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা সহজ হয়। এসব পত্রপত্রিকার মাধ্যমে তারা কৌশলে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি মানুষের মনকে বিষিয়ে তোলে। মানুষের মনে শরিয়াহ সম্পর্কে দেওয়া হয় নেতিবাচক ধারণা যেন মুসলিম সমাজের বাসিন্দারাই শরিয়াহব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে। নানাভাবে তারা সমাজের মানুষের মনে পশ্চিমের প্রতি সমীহ ও প্রীতি জাগিয়ে তোলে।

৩। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও একাডেমিতে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন করে তারা নিজেদের বার্তা পৌঁছে দেয়। এসব সেমিনারে তারা নিজেদের অনুগত বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আসে। তাদেরকে হাইলাইট করে। তাদের সকল কাজ ও কথাকে জ্ঞানগত বৈধতা দেয়।[১৫৯]

---

[১৫৯]. *আত-তাবশির ওয়াল-ইসতিমার*, ২১৩।

এবার আমরা প্রসিদ্ধ কয়েকজন ওরিয়েন্টালিস্ট ও ওরিয়েন্টালিস্ট প্রভাবিত ব্যক্তিদের রচিত ইতিহাস-বই নিয়ে পর্যালোচনা করব যেন তাদের লেখা থেকে সাধারণ পাঠক সতর্ক থাকতে পারে।

পি কে হিট্টির আরব জাতির ইতিহাস

পি কে হিট্টির এই বইটি আমাদের দেশে বেশ জনপ্রিয়। এক মলাটে ইসলামের ইতিহাসের জন্য এই বইকে খুবই নির্ভরযোগ্য মনে করেন অনেকে। ফিলিপ কুরি হিট্টির জন্ম ১৮৮৬ সালে লেবাননে। শিক্ষাজীবনের বড় অংশ কেটেছে আমেরিকায়। পিএইচডি শেষ করেছেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ১৯১৫ সালে। ১৯১৯ সালে বৈরুতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটির আরবের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন হিট্টি। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় তার লেখা 'হিস্ট্রি অফ দ্য আরবস' বইটি। এই বইয়ে হিট্টি নবিজির যুগ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। পুরো বইতে হিট্টি প্রচুর তথ্য এনেছেন। প্রায় সকল তথ্যের সাথেই দিয়েছেন রেফারেন্স। বইটি রচনায় তার পরিশ্রমের ছাপ সুস্পষ্ট।

হিট্টির বইটি ইংরেজিতে রচিত হলেও পরে এটি আরবিসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। এই বইতে হিট্টি সুকৌশলে এমন কিছু বিষয় প্রবেশ করিয়েছেন যাতে মানুষের মনে সন্দেহ-সংশয় জন্ম নেয়।

১। হিট্টি তার লেখায় অনেক স্থানে সম্ভবত, হয়তো, শোনা যায় এ ধরনের শব্দ লিখে বানোয়াট কথাবার্তা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে তিনি কোনো রেফারেন্সও দেননি। একটু অসচেতন হলেই এসব ক্ষেত্রে হিট্টির লেখার বিষে বিষাক্ত হতে হবে। যেমন হজরত আবু বকরের খিলাফত সম্পর্কে হিট্টি লিখেছেন, আবু বকর, উমর ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহর মধ্যে সম্ভবত পূর্বনির্ধারিত কোনো পরিকল্পনা অনুযায়ী এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।[১৬০] হিট্টি এখানে বলতে চাচ্ছেন আবু বকর, উমর ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ আগে থেকে ক্ষমতার ব্যাপারে পরিকল্পনা করেছিলেন যা জনগণের সামনে এসে বাস্তবায়ন করেছেন মাত্র। এটি চরম অসত্য। ইতিহাসে এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। হিট্টি নিজেও কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি, এমনকি দুর্বল কোনো বর্ণনাও না। বরং সম্ভবত শব্দ বলে বিষয়টি বর্ণনা করে গেছেন যা অসতর্ক সাধারণ পাঠকের মনে সন্দেহ জাগাতে যথেষ্ট।[১৬১]

---

[১৬০]. *History of The Arabs*, ১৪০।

[১৬১]. হজরত আবু বকর রা.-এর ক্ষমতাগ্রহণ নিয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে আবদুস সাত্তার শাইখ ও আলি সাল্লাবি রচিত হজরত আবু বকরের জীবনীটি পড়া যেতে পারে।

২। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে হিট্টি লিখেছেন, ভালোবাসা ও রাজনৈতিক কারণে তিনি মোট ১২ জনকে বিবাহ করেন।[১৬২] স্পষ্টতই হিট্টি এখানে ভালোবাসার কথা বলে উম্মুল মুমিনিন যাইনাব রা.-এর ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছেন। ওরিয়েন্টালিস্টদের একটি পুরোনো অভিযোগ হলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাইনাব রা.-এর প্রেমে পড়ে হজরত যাইদকে বাধ্য করেন তাকে যেন তালাক দেওয়া হয়। হিট্টি এখানে ওরিয়েন্টালিস্টদের সেই পুরোনো চালই চেলেছেন। সামান্য একটি শব্দে মুসলমানদের আকিদার জায়গায় ফাটল ধরিয়ে ফেলেছেন তিনি।

৩। হিট্টির মতে সাহাবায়ে কেরামের যুগে যে অভিযান পরিচালিত হয়েছিল তাতে ধর্মীয় কারণের চেয়ে অর্থনৈতিক লোভের ব্যাপারটিই ছিল বেশি এগিয়ে। বেদুইনরা নতুন শহর ও অর্থের লোভে এসব অভিযানে এসেছিল।[১৬৩] এভাবে হিট্টি খাইরুল কুরুনের মকবুল জামাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাঠককে ভুল বার্তা দেন।

৪। ইবনে খালদুনের রেফারেন্স টেনে হিট্টি হজরত মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কে লিখেছেন, মুয়াবিয়া ইসলামকে পার্থিব এবং খিলাফতকে একটি মুলক বা পার্থিব সার্বভৌম সত্তায় পরিণত করেছেন।[১৬৪] হিট্টি যদিও ইবনে খালদুনকে এখানে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন কিন্তু বাস্তবতা হলো ইবনে খালদুনের অবস্থান মোটেই হিট্টির মতো নয়। ইবনে খালদুন স্পষ্ট লিখেছেন, এভাবেই বিষয়টি পরিণত হলো মুলুকিয়তে, কিন্তু টিকে রইল খিলাফাহর অর্থ ও মর্ম।

৫। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান সম্পর্কে হিট্টি লিখেছেন, তিনি কুব্বাতুস সাখরা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন যেন হজযাত্রীরা আর কাবা শরিফে না যায়। কারণ, সেখানে তখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ছিলেন।[১৬৫] অভিযোগ গুরুতর। যে কুব্বাতুস সাখরা নির্মাণকে ধরা হয় আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম, সেই বিষয়টিকেই হিট্টি করে দিলেন নেতিবাচক। বিকৃতভাবে বর্ণনা করলেন আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের উদ্দেশ্য। বিষয়টি নিয়ে আলোচনার আগে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে দুয়েকটি বিষয় জেনে নিই। ইবনে উমরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনার পরে আমরা কার কাছে মাসআলা

---

১৬২. *History of The Arabs*, ১২০।
১৬৩. *History of The Arabs*, ১৪৪।
১৬৪. *History of The Arabs*, ১৯৭।
১৬৫. *History of The Arabs*, ২২০।

জিজ্ঞেস করব? তিনি বলেছিলেন, মারওয়ানের ছেলে ফকিহ, তাকে তোমরা মাসআলা জিজ্ঞেস করো।[১৬৬] আবুয যিয়াদ একবার বলেছিলেন, মদিনার চারজন ফকিহর একজন হলেন আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান।[১৬৭] হিট্টি তার সম্পর্কে যে কথা লিখেছেন তাতে তার একমাত্র সূত্র ইয়াকুবি। ইয়াকুবি ছাড়া আর কেউই কুব্বাতুস সাখরা নির্মাণের এমন উদ্দেশ্যের কথা লেখেনি। ইয়াকুবি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। একজন কট্টর শিয়া ইতিহাসবিদ হিসেবে সে প্রচুর মিথ্যাচার করেছে তার গ্রন্থে। বিশেষ করে বনু উমাইয়ার ইতিহাস বিকৃত করার কোনো সুযোগই ছাড়েনি সে। আর হিট্টি খুঁজে খুঁজে ইয়াকুবির সেই বর্ণনাই এনেছেন যা আনলে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের চরিত্রে কালিমা লেপন করা যায়।

৬। একটু সামনে এগিয়ে হিট্টি আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান সম্পর্কে লিখেছেন তিনি মাসে একবার মদ্যপান করতেন। হিট্টি আরও লিখেছেন খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ মদের নদীতে সাঁতার কাটতেন। একবার তিনি কুরআন খুলে দেখেন সেখানে লেখা আছে প্রত্যেক স্বেচ্ছাচারী রাজার ধ্বংস অনিবার্য। তখন তিনি তিরধনুক দিয়ে কুরআন শরিফ টুকরো টুকরো করে ফেলেন।[১৬৮] নাউজুবিল্লাহ।

কী ভয়ানক তথ্য। মজার ব্যাপার হলো এসব তথ্যের ক্ষেত্রে হিট্টি শুধু একটি বইয়ের রেফারেন্স এনেছে। আবুল ফারাজ ইস্ফাহানির 'কিতাবুল আগানি'। ইসলামের ইতিহাসের এত এত নির্ভরযোগ্য বই থাকতেও কোনো বই থেকেই হিট্টি কোনো রেফারেন্স আনতে পারেননি। তাই তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে খুঁজে নিয়েছেন 'কিতাবুল আগানি'-কে। কারণ এই বইয়ের তথ্য নিলে খলিফাদের চরিত্রকে কলঙ্কিত করা যায়।

পেছনে আমরা বলেছি ওরিয়েন্টালিস্টরা মাসউদি, ইয়াকুবি আর আবুল ফারাজ ইস্ফাহানির প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখায় নিজেদের স্বার্থে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

৭। 'কিতাবুল আগানি'র বরাতে হিট্টি উমাইয়া যুগে মুসলিম নারীদের প্রেম নিবেদনের ঘটনা এনেছেন এবং তার মতে তখনকার সমাজে প্রকাশ্যে প্রেম নিবেদন দোষের ছিল না। বলাবাহুল্য তার আনীত এসব বর্ণনার একটিও

---

[১৬৬]. *তাহজিবুত তাহজিব*, ৬/৪২২।
[১৬৭]. *ফাওয়াতুল ওফায়াত*, ২/৩১।
[১৬৮]. *History of The Arabs*, ২২৭।

গ্রহণযোগ্য নয়। 'কিতাবুল আগানি' ছাড়া আর কোনো গ্রন্থে এসবের পক্ষে কোনো সমর্থন নেই। আর 'কিতাবুল আগানি'র অবস্থান কী তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

৮। বারমাকিদের পতনের কারণ লিখতে গিয়ে হিট্টি এনেছেন[১৬৯] 'তারিখে তাবারি'র এক দুর্বল বর্ণনা যাকে সচেতন ইতিহাসবিদরা বরাবরই অস্বীকার করেছেন। ইবনুল জাওযি ও অন্য ইতিহাসবিদরা এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ বর্ণনা আনলেও হিট্টি সে পথে আগাননি। তিনি তথ্য নিয়েছেন 'তারিখে তাবারি'র দুর্বল বর্ণনা থেকে, মাসউদির চরম অগ্রহণযোগ্য বই 'মুরুজুয যাহাব' থেকে, এবং শিয়া লেখকের বই 'আল-ফাখরি' থেকে। যা তার লেখাকে বায়াসড বা প্রভাবিত করেছে।

কার্ল ব্রোকেলম্যান ও হিস্ট্রি অফ দ্য ইসলামিক পিপল

কার্ল ব্রোকেলম্যানের জন্ম জার্মানিতে ১৮৬৮ সালে। স্ট্রাসবার্গ থেকে ১৮৯০ সালে তিনি তার পিএইচডি সমাপ্ত করেন। কর্মজীবনের শুরু থেকে তিনি ইসলামি সাহিত্য ও ইসলামের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তিনি ছিলেন তার সময়কার প্রথম সারির একজন ওরিয়েন্টালিস্ট। ১৯৫৬ সালে তিনি মারা যান। তার সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিস্ট্রি অফ দ্য ইসলামিক পিপল'। এই বইতে তিনি ইসলামের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত মানুষের বড় অংশ এই বইয়ের প্রতি মুগ্ধ। তারা এই বইয়ের বক্তব্যকেই চূড়ান্ত মনে করেন।

এবার দেখা যাক এই বইতে কার্ল ব্রোকেলম্যান কী কী বিষ ঢুকিয়েছেন—

১। হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে কার্ল ব্রোকেলম্যান লিখেছেন এটি একটি পূজনীয় প্রতিমা।[১৭০] কার্ল ব্রোকেলম্যান এখানে নির্লজ্জ মিথ্যাচার করেছেন। হাজরে আসওয়াদকে কখনোই পূজা বা উপাসনা করা হয় না। কাবা শরিফে ৩৬০টি প্রতিমা ছিল। মক্কা বিজয়ের দিনই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল মূর্তি নিজ হাতে ভেঙেছিলেন।[১৭১] যদি হাজরে আসওয়াদও কোনো মূর্তি বা পূজনীয় কিছু হতো তাহলে নবিজি এটিকেও ভেঙে ফেলতেন। হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে হজরত উমর রা. যা বলেছিলেন তা থেকেই এই

---

১৬৯. *History of The Arabs*, ২৯৬।

১৭০. *History of The Islamic People*, ১১।

১৭১. দেখুন, *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, ২/২৫২; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৪/৩১০; *তারিখে ইবনে খালদুন*, ২/৪৪।

পাথর সম্পর্কে মুসলমানদের অবস্থান পরিষ্কার হয়। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর কসম, আমি জানি তুমি একটি পাথরমাত্র। তুমি কোনো ক্ষতি বা উপকার কিছুই করতে পারো না। যদি আমি নবিজিকে তোমাকে চুমু খেতে না দেখতাম তাহলে আমি কখনোই তোমাকে চুমু দিতাম না।[১৭২]

২। কার্ল ব্রোকেলম্যানের মতে ওহির বিষয়টি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবচেতন মনের খেয়ালমাত্র। সমাজের অবস্থা দেখে তিনি ভাবিত ছিলেন, সেই জায়গা থেকে তিনি চিন্তা করেন তিনি একজন প্রেরিত পুরুষ এবং তার কাছে অহি এসেছে (নাউজুবিল্লাহ)।[১৭৩] কার্ল ব্রোকেলম্যানের বইয়ের এই অংশ যদি কোনো মুসলমান বিশ্বাস করে তাহলে তার তো ঈমানই থাকবে না। ডক্টর উমর ফাররুখ কার্ল ব্রোকেলম্যানের এই বক্তব্য সম্পর্কে লিখেছেন, তার এই বক্তব্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিদ্বেষপ্রসূত।[১৭৪]

৩। কার্ল ব্রোকেলম্যানের মতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামি শরিয়তে রোজার প্রবর্তন করেছিলেন ইহুদিদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য।[১৭৫]

৪। বিখ্যাত সাহাবি মুগিরা ইবনে শোবা সম্পর্কে কার্ল ব্রোকেলম্যান লিখেছেন, তিনি ছিলেন একজন সুবিধাবাদী মানুষ। তার কোনো সততা-আমানতদারি ছিল না। বসরার গভর্নরের পদ থেকে তাকে অপসারণ করা হয়েছিল জিনার অভিযোগে।[১৭৬]

নাউজুবিল্লাহ। আবারও নির্মম মিথ্যাচার। এই অভিযোগের প্রতিটিই এমন মিথ্যা যার পক্ষে ইতিহাসের বইতে কোনো দলিলই নেই। জিনার অভিযোগের কথাটিও মিথ্যা কারণ উমর রা. তাকে বসরা থেকে সরিয়ে কুফার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।[১৭৭] যদি ব্রোকেলম্যানের কথা সত্যিই হতো তাহলে হজরত উমর রা. তাকে বসরা থেকে সরিয়ে কুফার দায়িত্ব দিলেন কেন?

আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে অল্প কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেই ক্ষান্ত দিলাম। কিন্তু এ থেকেই আশা করি অনুমান করা যাবে কার্ল ব্রোকেলম্যান তার বইতে ইসলামের ইতিহাসকে কীভাবে বিকৃত করেছেন।

---

[১৭২]. *সহিহ মুসলিম*, ২৩৫৪।
[১৭৩]. *History of The Islamic People*, ১৩।
[১৭৪]. *ব্রোকলম্যান*, ৩৬।
[১৭৫]. *History of The Islamic People*, ২০।
[১৭৬]. *History of The Islamic People*, ৬৪।
[১৭৭]. *তাহযিবুত তাহযিব*, ১/২৯৬।

বেঞ্জামিন ওয়াকারের ফাউন্ডেশন অফ ইসলাম

সত্য বলতে বেঞ্জামিন ওয়াকারের এই বইটি আলোচনায় আসার যোগ্যই নয়। পি কে হিট্টি যেমন পরিশ্রম করে কাজ করেছেন, মূল আরবি মাসাদির ঘেঁটে তথ্য নিয়েছেন, বেঞ্জামিন ওয়াকার এর বিন্দুমাত্র কাজও করেনি। হিট্টির বই আর ওরিয়েন্টালিস্টদের কিছু বই সামনে রেখে নিজের কল্পনা মিশিয়ে যা তা কথা লিখে ইসলামের ইতিহাস বলে চালিয়ে দিয়েছে। এ ধরনের গার্বেজ নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সময় প্রকাশন থেকে সা'দ উল্লাহ নামে এক ভদ্রলোক এই বইটি অনুবাদ করে প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন সাইটে বইটির বাংলা অনুবাদের পিডিএফ আছে। নীলক্ষেতে প্রায়ই এই বই প্রিন্ট করে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের কাছে পাঠানো হয়। এই বইটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা না করে শুধু লেখকের বিকৃতির দুয়েকটা নমুনা দেখাচ্ছি।

১। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বেঞ্জামিন ওয়াকার লিখেছে, তিনি একবার উজ্জা দেবীর থানে একটি ভেড়া বলি দেন এবং তার মাংস গ্রহণ করেন। এর পরেও তিনি পরিবারের নিয়ম অনুযায়ী বলির মাংস খেয়েছেন।[১৭৮]

২। উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রা. সম্পর্কে বেঞ্জামিন ওয়াকার লিখেছে, তিনি নিশ্চয়ই প্রফেটকে খ্রিষ্টীয় রীতিমতো একজন স্ত্রী গ্রহণ করার কথা বলে থাকবেন এবং এ কথা বলার মতো অবস্থা তার ছিল। প্রফেট মুহাম্মাদকে একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করানোর জন্য খাদিজাই দায়ী ছিলেন।[১৭৯]

৩। সে আরও লিখেছে, বাল্যকাল থেকে মুহাম্মাদ ঘূর্ণিরোগে আক্রান্ত হতেন, ফলে তিনি অচেতন অবস্থায় মাটিতে পড়ে যেতেন। এই মৃগী বা ঘূর্ণিরোগ তার সারা জীবনের বেশিরভাগ জুড়ে চলছিল।[১৮০]

৪। কুরাইশদের সম্পর্কে সে লিখেছে, যদিও মুসলমানদের ওপর কুরাইশদের নির্মম অত্যাচারের কথা সম্বন্ধে অনেক দলিল পাওয়া যায় কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা আসলে মৃদু ছিল এবং এর মাত্রাকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে।[১৮১]

---

[১৭৮]. বাংলা সংস্করণ, পৃ. ৯২।
[১৭৯]. বাংলা সংস্করণ, পৃ. ৯৭।
[১৮০]. বাংলা সংস্করণ, পৃ. ১০৩।
[১৮১]. বাংলা সংস্করণ, পৃ. ১১০।

৫। আবু সুফিয়ান রা. সম্পর্কে লেখা হয়েছে, ইসলাম গ্রহণ করলেও প্রফেট ও ইসলামের প্রতি তার প্রতিবাদী মনোভাব বজায় রেখেছিলেন।[১৮২]

৬। মেরাজের ঘটনাকে সে লিখেছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বানানো। লেখকের মতে আগের রাসুলদের ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নবিজি এই দাবি করেছিলেন।[১৮৩]

৭। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা. সম্পর্কে লেখা হয়েছে, আয়েশা তার প্রতি প্রফেটের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রফেটের মতামতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতেন। প্রফেটের হেরেমের মধ্যে দুটি দল ছিল যাদের একে অপরের সাথে তিক্ত শত্রুতা বিরাজ করত।[১৮৪]

এ ধরনের শত শত মিথ্যাচার ও বিকৃতি দিয়ে পূর্ণ বেঞ্জামিন ওয়াকারের বই ‘ফাউন্ডেশন অফ ইসলাম’।

জুর্জি যায়দান

সম্প্রতি জুর্জি যায়দান আমাদের দেশে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছেন। ইতিমধ্যে তার ৪টি বই বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। ইতিহাসের বই মনে করে সেগুলোকে গিলছে সাধারণ পাঠক। অথচ জুর্জি যায়দান একজন ঔপন্যাসিকমাত্র। কল্পনা মিশিয়ে ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করাই যার কাজ। জুর্জি যায়দান ছিল লেবানিজ খ্রিষ্টান। জন্ম ১৮৬১ সালে। বাল্যকাল বৈরুতে কাটলেও পরে মিশর চলে যান। ১৮৯৬ সালে প্রকাশ করেন ‘আল-হেলাল’ পত্রিকা। ইসলামের ইতিহাস উপজীব্য করে বিশের অধিক উপন্যাস লিখেছেন যার প্রতিটিতেই ইতিহাসকে করেছেন বিকৃত। তার এই বিকৃতির বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন সচেতন ইতিহাসবিদরা।

১। ডক্টর শাওকি আবু খলিল জুরজি যায়দানের সকল বই পর্যালোচনা করে রচনা করেছেন সুবিশাল গ্রন্থ। নাম ‘জুর্জি যায়দান ফিল-মিযান’। এই বইতে তিনি ধরে ধরে দেখিয়েছেন জুর্জি যায়দান কীভাবে ইতিহাস বিকৃত করেছে।

২। জুরজি যায়দানের এসব বিকৃতির জবাবে তার জীবদ্দশাতেই আল্লামা শিবলি নোমানি রচনা করেন, ‘আল-ইনতিকাদ আলা কিতাবিত তামাদ্দুনিল ইসলামি’। এই গ্রন্থেও তিনি জুরজি যায়দানের বিকৃতি নিয়ে শক্ত সমালোচনা করেন।

---

[১৮২]. বাংলা সংস্করণ, পৃ. ১১১।

[১৮৩]. বাংলা সংস্করণ, পৃ. ১২০।

[১৮৪]. বাংলা সংস্করণ, পৃ. ১৩৪।

জুর্জি যায়দান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দরকার নেই। সে একজন ঔপন্যাসিক। যে কল্পনা দিয়ে ইতিহাস নির্মাণ করেছে। তার বইকে গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই।

আহমাদ আমিন ও তার বইপত্র

আহমাদ আমিনের জন্ম ১৮৭৮ সালে মিশরে। আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে তিনি সাহিত্যচর্চায় মন দেন। ইসলামের ইতিহাস নিয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি যার মধ্যে 'দুহাল ইসলাম', 'ফাজরুল ইসলাম', 'হারুনুর রশিদ' উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন মুক্তচিন্তার অধিকারী এবং প্রচণ্ড ওরিয়েন্টালিজম প্রভাবিত। তার লেখা কখনোই ভারসাম্যপূর্ণ ছিল না। তিনি ইসলামের ইতিহাস বিকৃত করতেন ইচ্ছাকৃতভাবেই।

ওরিয়েন্টালিজমের প্রভাবের কারণে 'ফাজরুল ইসলাম' গ্রন্থে তিনি অনেক হাদিস অস্বীকার করেছেন, হাদিস সংকলনের পদ্ধতি সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করেছেন, হাদিসের রাবিদের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন, এমনকি সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছেন মুহাদ্দিসদের ব্যাপারেও।

তার সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. লিখেছেন, ১৯৩৮/৩৯ খ্রিষ্টাব্দে মিশরীয় লেখক আহমাদ আমিনের 'ফাজরুল ইসলাম' ও 'দুহাল ইসলাম' পড়ার সুযোগ হয়। বইদুটি নববি, উমাইয়া ও আব্বাসি যুগের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ইতিহাস নিয়ে লেখা। বইদুটি লেখকের গভীর পর্যবেক্ষণ ও সুন্দর সিদ্ধান্তে পৌঁছার উৎকৃষ্ট নমুনা। তবে এই বই পাঠে হাদিসশাস্ত্রের প্রতি ভরসা অনেকটাই বিনষ্ট হয়, এমনকি এই শাস্ত্রের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বদের প্রতিও শ্রদ্ধা ও ভক্তি নষ্ট হয়, যা একজন মুসলমানের অন্তরে থাকা আবশ্যক। সে সময় আমার অনভিজ্ঞতা ও সমালোচকসুলভ মানসিকতার অভাবে তার লেখার এইসব সীমাবদ্ধতার অনুভূতি আমার হয়নি। এর সঠিক অনুভূতি ও জ্ঞান আমার তখন হয়েছে যখন আমি শাইখ মুস্তফা আস-সিবায়ির কিতাব 'আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত-তাশরিয়িল ইসলামি' অধ্যয়ন করি।[১৮৫]

ড. মুস্তফা আস-সিবায়ি তার অমর গ্রন্থ 'আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত-তাশরিয়িল ইসলামি'-তে আহমাদ আমিনের বিভ্রান্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হাদিসশাস্ত্রের ওপর তার আরোপিত অভিযোগের জবাব

---

[১৮৫]. *মেরি ইলমি ও মুতালাআতি জিন্দেগি*, ২৩/২৪।

দিয়েছেন। আহমাদ আমিন গবেষক হিসেবে শতভাগ সৎ ছিলেন না, তার বিবরণ পাওয়া যায় শাইখ মুস্তফা আস-সিবায়ির লেখায়। তিনি লিখেছেন, ১৩৬০ হিজরিতে জামিয়া আজহারে ডক্টর আলি হাসান আবদুল কাদেরের ইমাম যুহরি সংক্রান্ত গবেষণা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। তখন আহমাদ আমিন তাকে বলেন, আজহারে স্বাধীন গবেষণা ও মুক্তচিন্তার সুযোগ নেই। এজন্য আপনি ওরিয়েন্টালিস্টদের যেকোনো বক্তব্য গ্রহণ করুন এবং এসব বক্তব্য তাদের দিকে সম্পৃক্ত না করে নিজের গবেষণার ফলাফল বলে চালিয়ে দিন। উপস্থাপনে সূক্ষ্ম পদ্ধতি অবলম্বন করুন যেন কেউ বুঝতে না পারে। আমার গ্রন্থ 'দুহাল ইসলাম' ও 'ফাজরুল ইসলাম'-এ আমি এমনটাই করেছি।[১৮৬]

আহমাদ আমিনের বিভ্রান্তিগুলোর বিশদ বর্ণনা দেওয়া এখানে উদ্দেশ্য নয়। কেউ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে মুস্তফা আস-সিবায়ির 'আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত-তাশরিয়িল ইসলামি' বইটি পড়ে দেখতে পারেন। এখানে আহমাদ আমিনের চিন্তাধারা ও তার বইপত্রের মান সম্পর্কে আলোচনা করছি।

আহমাদ আমিন সম্পর্কে আলোচনা শেষ করছি তার সম্পর্কে ডক্টর শাওকি আবু খলিলের মূল্যায়ন উদ্ধৃত করে। তিনি লিখেছেন, আহমাদ আমিন ঐতিহাসিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাহিত্যিক। তথ্যের পরিশোধন, মূল উৎসের পাঠ, উদ্ধৃত তথ্যের সত্যতা এসব থেকে অনেক দূরে ছিল তার অবস্থান। তিনি ছিলেন ওরিয়েন্টালিজম প্রভাবিত।

আহমাদ আমিনের অসততার কথা উল্লেখ করেছেন শাওকি আবু খলিলও। তিনি লিখেছেন, আহমাদ আমিন জামিয়া আজহারের ইতিহাস বিভাগের একজন অধ্যাপককে বলেছিলেন, ওরিয়েন্টালিস্টদের যেকোনো চিন্তা ও বক্তব্যকে নিজের কথা বলে ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন করুন। সরাসরি ওরিয়েন্টালিস্টদের নাম নিলে ছাত্ররা তা অপছন্দ করবে। কিন্তু এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে আপনি প্রজন্মের মগজে যা গেঁথে দিতে চাইবেন তা সহজে পারবেন।[১৮৭]

আহমাদ আমিনের কয়েকটি বই বাংলায় অনূদিত হয়েছে। প্রতিটি বই-ই সমস্যাযুক্ত। আফসোসের বিষয় হলো এসব বইয়ের অনুবাদক বা প্রকাশক কেউই আহমাদ আমিনের চিন্তাধারা ও লেখনীর সমস্যা সম্পর্কে পাঠককে সতর্ক

---

[১৮৬]. *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত-তাশরিয়িল ইসলামি*, ২৬৬।

[১৮৭]. শাওকি আবু খলিল কৃত 'হারুনুর রশিদ', ২১৩।

করেননি। বরং তারা উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করেছেন। ফলে সাধারণ পাঠকের জন্য বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই বিষয়ে সতর্কতা কাম্য।

তহা হুসাইন ও তার রচনাবলি

তহা হুসাইনের জন্ম মিশরে, ১৮৮৯ সালে। আল-আজহারে ভর্তি হয়েছিলেন তবে সেখান থেকে লেখাপড়া সমাপ্ত করেননি। পরে পিএইচডি করেছেন প্যারিস থেকে। তিনি ইসলামের ইতিহাস নিয়ে লেখালেখি করেছেন। আহমাদ আমিনের মতো তিনিও ছিলেন প্রচণ্ড ওরিয়েন্টালিজম প্রভাবিত। তার কিছু বইপত্র ইতিমধ্যে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। সেখানে আছে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে তার লেখার দুর্বল দিক।

১। তহা হুসাইনের লেখার মূল সমস্যা হলো তিনি ইসলামের ইতিহাসের ব্যাপারে পাঠকের মনে সন্দেহ ও সংশয় জাগিয়ে তোলেন। তিনি মুসলিম ইতিহাসবিদদের অযোগ্য ও পক্ষপাতদুষ্ট বলে প্রমাণ করার চেষ্টা চালান। সালাফে সালেহিনের ব্যাপারে মনে অশ্রদ্ধা জাগানোর চেষ্টা তার লেখায় প্রবল। তিনি ছিলেন মুক্তচিন্তার মানুষ। ফলে তিনি ইসলামের ইতিহাসকেও দেখেন সেই দৃষ্টিকোণ থেকে। তার লেখায় ইসলামের ইতিহাস এর মূল আবেদন হারিয়ে ফেলে। হয়ে ওঠে বিকৃত ও শুষ্ক-নীরস উপাদান।

২। যত ধরনের বানোয়াট কাহিনি, উপকথা ও কাল্পনিক গালগপ্পো আছে সবগুলো তহা হুসাইন তার লেখায় নিয়ে আসেন। এরপর একেই সত্য ইতিহাস বলে চালিয়ে দেন। তার লেখার এই সমস্যা সাধারণ পাঠক অনেক সময় ধরতে পারে না, ফলে তহা হুসাইনের লেখা পড়ে বিশুদ্ধ ইতিহাস জানার বদলে ভুল ইতিহাস জানা হয়।

৩। তহা হুসাইনের লেখার একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো তিনি সম্ভবত, হয়তো, মনে হয়, বলা হয়, প্রচলিত আছে, শোনা যায় এ ধরনের শব্দ দিয়ে লেখা শুরু করেন। এরপর ইতিহাসের বিশুদ্ধ বইপত্র বাদ দিয়ে মনগড়া ইতিহাস লেখা শুরু করেন। ইতিহাসে যে বিষয়ের অস্তিত্বই নেই, সেই বিষয়কেও তিনি মনে হয় আর সম্ভবত দিয়ে চালিয়ে দেন।

৪। তিনি ইতিহাসের প্রাইমারি সোর্সের বদলে সেকেন্ডারি সোর্স থেকে তথ্য নিতে অভ্যস্ত। ফলে তার উপস্থাপিত তথ্যে দেখা যায় প্রচুর সমস্যা ও দুর্বলতা।

৫। নিজের চিন্তাধারা থেকে প্রভাবিত হয়ে তিনি ইতিহাসের অনেক বিষয়কে অস্বীকার করে বসেন অথচ বিষয়টি প্রমাণিত।

৬। তার লেখা খুবই ভাসাভাসা। লেখায় তাড়াহুড়ার ছাপ সুস্পষ্ট। একটি বিষয়কে প্রমাণ করতে হলে যে পরিমাণ দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করতে হয় তা করতে তার খুবই অনীহা।[১৮৮]

আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ ও তার রচনাবলি

আব্বাস মাহমুদ আক্কাদের প্রতিও মুগ্ধ হতে দেখা যায় কাউকে কাউকে। তার 'আবকারিয়্যাত সিরিজ' পড়ে অনেকে একে ইতিহাসের বিশুদ্ধ গ্রন্থ মনে করে থাকেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। আক্কাদ সম্পর্কে তরুণ আলেম মাহমুদ সিদ্দিকির মূল্যায়নটিই যথার্থ। তিনি লিখেছেন, আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ একজন স্বশিক্ষিত সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক ও আরবি ভাষাবিদ; ইতিহাসবিদ নন। সে কারণে ইতিহাসের বইপত্র লিখলেও তিনি বারবার পদস্খলনের শিকার হয়েছেন। আরও স্পষ্ট করে বললে, ইতিহাসের অঙ্গনে তিনি পদস্খলিত ও বিকৃত চিন্তার প্রচারক।

আক্কাদের লেখার ধরন বিশ্লেষণমুখী, সাধারণ বিবরণমূলক নয়। সাধারণ পাঠক বিবরণমূলক ইতিহাস পড়তে পছন্দ করলেও অপ্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ পছন্দ করেন না। বিশ্লেষণ তখনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন তা হয় প্রয়োজনীয় এবং সত্য-আশ্রিত। কিন্তু আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ সবকিছু বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বড় ধরনের বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন। ইতিহাসের শাস্ত্রীয় লোক না হওয়ায় সঠিক ইতিহাসের বদলে জাল, জইফ, বাতিল ও বানোয়াট ঘটনাগুলোক বানিয়ে ফেলেন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস। ব্যাপারটা এতটুকু হলেও মানা যেত। তিনি বরং আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছেন। বাতিল, বানোয়াট ও মিথ্যাচারপূর্ণ বর্ণনাগুলোকেই তিনি ইতিহাস মনে করেন। এসবকে যখন একজন শাস্ত্রজ্ঞ ইতিহাসবিদ রিফিউট করেন, তখনও তিনি গোঁ ধরে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

বিশেষ করে হজরত মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুমার প্রসঙ্গে জঘন্য চিন্তা লালন করেন তিনি। ইতিহাসের জাল, বাতিল ও দুর্বল বর্ণনা এনে এই দুজন সাহাবি সম্পর্কে ক্ষমতালোভী ও ব্যক্তিগত ক্ষমতার জন্য আলি রা.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন বলে এক জঘন্য চিত্র দাঁড় করিয়েছেন। এমনকি ঐতিহাসিক ও গবেষকদের সনদি বিশ্লেষণও মানেন না।

---

[১৮৮]. এই আলোচনাটি ডক্টর মুহাম্মাদ সালেম সালামি রচিত 'আল-মাদখাল ইলা ইলমিত তারিখ' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

'আমর ইবনুল আস' নামে তিনি বিখ্যাত সাহাবি আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী লিখেছেন। উক্ত বইয়ে মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে স্বার্থান্বেষী প্রমাণ করতে একাধিক জঘন্য বাতিল ঘটনা ও নবিজির ভবিষ্যদ্বাণী-সংক্রান্ত মউজু হাদিস এনেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, একটি জঘন্য ঘটনা উল্লেখ করার পর তার বক্তব্য হলো, এই ঘটনা ও কথোপকথনের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে ঐতিহাসিক বিশ্লেষকেরা অপ্রমাণিত, সনদ ও মূল ভাষ্য প্রমাণিত নয় ইত্যাদি যা-খুশি বলুক। সকল ঐতিহাসিক বর্ণনা এক হয়েও যদি এসব বলে, তবুও সন্দেহ নেই যে, মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আস একে অপরকে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে সহযোগিতা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।[১৮৯]

এই বইয়ে উক্ত ঘটনার আশেপাশে কয়েক পৃষ্ঠাজুড়ে জঘন্য মিথ্যাচার ও কাল্পনিক ঘটনা বর্ণনায় মেতে উঠেছেন তিনি। আবার সেসব যারা সনদ-মতনসহ তাহকিকিভাবে রদ করেছেন, তাদেরকে এভাবে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন।

এই বইয়ে তো করেছেনই। 'মুয়াবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান : মুয়াসসিসুদ দাওলাতিল উমাবিয়্যাহ ফিল-মিযান' বইয়ে আরও জঘন্য সব অপবাদ দিয়েছেন। এইসব বস্তাপচা বাতিল বর্ণনার পসরা সাজিয়ে বিশ শতকে এসে এই স্বশিক্ষিত সাংবাদিক কাতিবে ওহি মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিচার করতে বসেছেন। আল্লাহ হেফাজত করুন। ডক্টর সাল্লাবি 'মুয়াবিয়া' বইতে প্রসঙ্গক্রমে দুয়েক জায়গায় আক্কাদের এসব অভিযোগের জবাব দিয়েছেন।

আব্বাস মাহমুদ আক্কাদের এই সমস্যাগুলো সামনে রেখে নিরাপদ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় তা হলো, তার বই সাধারণ পাঠকের পড়ার উপযোগী নয়। তার এসব গলদের গোড়া হলো উসুলুত তারিখ বা ইতিহাস যাচাইয়ের মূলনীতিকে না মানা। এই মৌলিক সমস্যার কারণে অন্য বইগুলোও যে নিরাপদ হবে না তা সহজে অনুমেয়।[১৯০]

* * *

[১৮৯]. *আমর ইবনুল আস*, পৃ. ১৬৪।

[১৯০]. মাওলানা মাহমুদ সিদ্দিকির অনুমতিক্রমে এই লেখাটি এখানে সংযুক্ত করা হলো।

সমকালীন কয়েকজন ইতিহাস লেখক

আলি সাল্লাবি

১৯৬৩ সালে লিবিয়ার বেনগাজিতে জন্মগ্রহণ করেন আলি সাল্লাবি। মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে উসুলে দ্বীন ও দাওয়াহ বিভাগে পড়াশোনা করেছেন তিনি। পিএইচডি করেছেন সুদানের উম্মে দারমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ইতিহাস বিষয়ে তিনি একাধিক বই রচনা করেছেন। বিশেষ করে তার রচিত 'সিরাতুন নবি' ও 'চার খলিফার জীবনী' তাকে এনে দিয়েছে তুমুল খ্যাতি। ইতিমধ্যে বাংলা ভাষায় তার অনেকগুলো বই অনুবাদ হয়েছে। সবগুলো বই পেয়েছে পাঠকপ্রিয়তা।

আলি সাল্লাবির লেখার বৈশিষ্ট্য

১। ইতিহাস বর্ণনার সাথে তিনি ফিকহ ও আকিদার দিকেও খেয়াল রাখেন। যেখানে প্রয়োজন মনে করেন ব্যাখ্যা করে দেন। যেমন সাইফুদ্দিন কুতুজ কর্তৃক তাতার দূত হত্যার ঘটনায় তিনি ফিকহ টেনে দেখিয়েছেন হত্যার সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল না। সাল্লাবির লেখার এ বৈশিষ্ট্যের কারণে পাঠক বুঝতে পারেন ইতিহাসের কোন ঘটনাটি দলিল হতে পারে, আর কোনটি নয়।

২। সাল্লাবি ইতিহাস বর্ণনার সাথে সাথে তা থেকে অর্জিত শিক্ষাও বলে দেন। শুধু ঘটনার বিবরণে তিনি আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন না। ফলে ইতিহাস পাঠের মূল যে উদ্দেশ্য, অর্থাৎ শিক্ষা নেওয়া তা অর্জন করা সহজ হয়।

৩। তথ্যের ক্ষেত্রে তিনি বেশিরভাগ সময় মূল উৎসের পরিবর্তে সেকেন্ডারি উৎসের ওপর নির্ভর করেন যা তার লেখার একাডেমিক মানকে কিছুটা ক্ষুণ্ন করে।

৪। সাল্লাবি ইংরেজি জানেন না, ফলে তিনি ইংরেজি কোনো বই থেকেও তথ্য নেওয়ার ক্ষেত্রে এর আরবি অনুবাদের ওপর নির্ভর করেন।

সুহাইল তাক্কুশ

ডক্টর সুহাইল তাক্কুশের জন্ম ১৯৬৬ সালে লেবাননে। পড়াশোনা শেষে তিনি বৈরুতের জামিয়াতুল ইমাম আল-আওযায়িতে ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। ইতিহাস বিষয়ে এ পর্যন্ত তিনি ২৮টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার সকল বই-ই বিভিন্ন অঞ্চল ও শাসনব্যবস্থাকেন্দ্রিক ইতিহাস।

সুহাইল তাক্কুশের লেখার বৈশিষ্ট্য

১। সুহাইল তাক্কুশের লেখার ধরন বর্ণনামূলক। তিনি শুধু ঘটনা বিবৃত করে যান। এ থেকে কোনো শিক্ষার কথা বলেন না। তিনি মনে করেন ইতিহাসকে তার আপন গতিতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। তার মতে ইতিহাসের কোনো উত্থান কিংবা পতনের কারণ নির্দেশ করা যাবে না যেহেতু সেই সময় ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আমরা শতভাগ অবগত নই। তার এই অবস্থানের সাথে অবশ্যই দ্বিমতের সুযোগ আছে। কারণ ইতিহাসকে যদি বিশ্লেষণ করা না হয় তাহলে তা থেকে শিক্ষা অর্জনের পথটি সহজ হবে না। নিছক কিছু ঘটনা জানার মধ্যে বিশেষ ফায়দা নেই।

২। সাল্লাবির মতো সমকালীন গ্রন্থ থেকে নয় বরং সুহাইল তাক্কুশ তথ্য নেন ইতিহাসের প্রাচীন উৎস থেকে। ইংরেজি ভালো জানার কারণে তিনি ইংরেজিতে রচিত প্রচুর নথিপত্র থেকেও সাহায্য নেন। যেমনটা তিনি করেছেন 'ক্রুসেডের ইতিহাস' লেখার সময়।

৩। সুহাইল তাক্কুশ কিছু জায়গায় এমন অবস্থান গ্রহণ করেন যা ইসলামি আকিদা ও ফিকহের সাথে মানানসই নয়। যদিও তিনি ইতিহাস বিশ্লেষণ করে কোনো পক্ষ নেওয়ার পক্ষে নন, তবু কিছু ক্ষেত্রে তিনি নিজের মতামত দিয়ে বসেন। তার এসব মতামত অনেক সময় বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত করে।

৪। তিনি সাম্রাজ্যভিত্তিক ইতিহাস লেখেন, ফলে ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস জানার জন্য তার বই বেশ উপকারী।

রাগেব সিরজানি

তার জন্ম ১৯৬৪ সালে মিশরে। তিনি পেশায় একজন ডাক্তার। তবে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে তার আগ্রহের কারণে রচনা করেছেন বেশ কিছু গ্রন্থ। তার মধ্যে বিশেষভাবে 'কিসসাতুত তাতার' ও 'কিসসাতুল হুরুবিস সলিবিয়্যা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাগেব সিরজানির লেখার বৈশিষ্ট্য

১। তার গদ্য গতিশীল ফলে পাঠকের ক্লান্তি আসে না। ইতিহাসের নীরস অংশও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তার উপস্থাপনার গুণে।

২। তার বইগুলো অনেকটা দাওয়াতি আন্দাজে লেখা। ইতিহাসের বই হলেও ইতিহাস বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি উম্মাহকে বিজয়ের চেতনায় উজ্জীবিত হতে বলেন। পরাজয়ের কারণ বলে তা থেকে সমাধান খুঁজে নিতে

বলেন। তার বই পড়লে একজন পাঠক নিরেট ইসলামি চেতনায় উজ্জীবিত হবেন।

৩। সিরজানি সিরাত সম্পর্কে যে বইগুলো লিখেছেন সেখানে মাঝে মাঝে কিছু ভুল চিন্তার প্রতিফলন হয়েছে। যেমন কোথাও তিনি জিহাদের বিষয়টি হালকা করে দেখিয়েছেন। আবার কোথাও অমুসলিমদের অধিকার প্রমাণ করতে গিয়ে ফিকহের অবস্থান থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছেন। ফলে সিরাত সম্পর্কিত তার বইগুলো পাঠের সময় সতর্কতা প্রয়োজন।

৪। রাগেব সিরজানির লেখা মূলত বিশ্লেষণধর্মী। ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে তিনি বিস্তৃত পরিসরে বিশ্লেষণ করেন। এতে করে পাঠক ইতিহাস বিশ্লেষণের তরিকা বুঝতে পারেন।

মাওলানা ইসমাইল রেহান

মাওলানা ইসমাইল রেহানের জন্ম পাকিস্তানের করাচিতে ১৯৭১ সালে। বিখ্যাত হাদিস বিশারদ আবদুর রশিদ নুমানি সাহেবের সান্নিধ্যে তিনি পড়াশোনা করেন। কর্মজীবনে ব্যস্ত আছেন জামিয়াতুর রশিদে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে। ইতিহাস বিষয়ে তার বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত হচ্ছে 'তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ'। ৭ খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থের ইতিমধ্যে ৪ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং শীর্ষ আলেম ও গবেষকদের সুনাম কুড়িয়েছে।

মাওলানা ইসমাইল রেহানের বইয়ের বৈশিষ্ট্য

১। মাওলানার গদ্য সাবলীল ও গতিশীল। তার লেখায় ইতিহাস জীবন্ত হয়ে ওঠে পাঠকের সামনে।

২। তিনি শুধু বিশুদ্ধ ইতিহাস বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হন না, বরং প্রাসঙ্গিক যে-সকল প্রশ্ন ও সংশয় আছে সেগুলোরও সমাধান দেন।

৩। ইতিহাস বর্ণনার পাশাপাশি ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা বয়ানের ক্ষেত্রে তিনি সচেষ্ট।

৪। তার লেখার সবচেয়ে ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হলো ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো সম্পর্কে আকিদা ও ফিকহের ইমামদের বক্তব্য তিনি উপস্থাপন করেন। ফলে কোনো একটি ঘটনা সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের অবস্থান কী তা স্পষ্ট হয়।

৫। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি প্রাইমারি সোর্সের সাহায্য নেন। একাধিক সোর্সের সাহায্য নিয়ে বিক্ষিপ্ত ইতিহাসকে সুবিন্যস্ত রূপ দেন।

যেভাবে নির্বাচন করব সঠিক বই

প্রতিদিন প্রকাশিত হচ্ছে একের পর এক বই। বাহারি রঙে, বাহারি সাজে সাজছে প্রতিটি বই। দেখলেই হাতে তুলে নিতে ইচ্ছে করে। বইয়ের ফ্ল্যাপ পড়লেও মনে হয় কাঙ্ক্ষিত সকল জ্ঞান মিলবে এই এক বইতেই। সবচেয়ে বিশুদ্ধ তথ্য দেওয়া হয়েছে দুই মলাটের ভেতর। কিন্তু সকলেই জানেন বাস্তবতা এমন নয়। যত গর্জে তত বর্ষে না। সকল বইয়ের মান এক নয়। সকল লেখকের জানার পরিধিও এক নয়। তফাত আছে প্রত্যেকের চিন্তা-চেতনা ও আকিদার জায়গাতেও। শুধু সঠিক তথ্য নয়, অনেক বইতে দেওয়া হচ্ছে ভুল ও বিকৃত তথ্যও। সংশয় সৃষ্টি করা হচ্ছে আকিদা ও বিশ্বাসে। বদলে দেওয়া হচ্ছে শরিয়াহর বিধান।

আমাদের জীবনে অর্থ ও সময় দুটিই সীমিত। এ দুটি অযথা ব্যয়ের কোনো সুযোগ নেই আমাদের। ফলে বই নির্বাচনে দরকার সতর্কতা। বাহারি প্রচ্ছদ ও আকর্ষণীয় নাম দেখেই বই কেনার বদলে যাচাই করে নিতে হবে লেখকের চিন্তাধারা ও যোগ্যতা। খোঁজ নিতে হবে বইয়ের ভেতর যে কন্টেন্ট আছে তার বিশুদ্ধতাই-বা কদ্দূর।

যেহেতু ইতিহাস নিয়ে কথা চলছে তাই ইতিহাসকেন্দ্রিক বইপত্র আমরা কীভাবে নির্বাচন করব তা নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা দিচ্ছি।

১। প্রথমেই লেখক সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে। তিনি যে বিষয়ে কলম ধরেছেন সেই বিষয়ে তিনি লেখার যোগ্যতা রাখেন কি না তা জানতে হবে। তার এই বই সম্পর্কে অন্য গবেষক ও আলেমদের কোনো সমালোচনা আছে কি না তা জেনে নিতে হবে। একাডেমিক মহলে তার বইয়ের গ্রহণযোগ্যতা কেমন তা জেনে নিতে হবে। সাধারণত কোনো বইতে সমস্যা থাকলে গবেষকরা তা নিয়ে আলোচনা করেন, অন্যদের সতর্ক করে দেন।

বিশেষ করে সেক্যুলার, পশ্চিমা প্রভাবিত, শিয়া, বিদআতি আকিদার অনুসারীদের লেখা থেকে সতর্ক থাকতে হবে এবং গবেষক ছাড়া অন্য কেউ তাদের বই পড়া উচিত নয়।

২। লেখকের যোগ্যতা নিশ্চিত হলে তার আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে খবর নিতে হবে। অনেক সময় যোগ্য ব্যক্তিরাও নিজের চিন্তাধারার কারণে অনেক বিষয় ভুল ব্যাখ্যা করেন বা প্রভাবিত আলোচনা করেন। যেমন

একজন সেক্যুলার লেখক যতই যোগ্য হন না কেন তিনি ইসলামের ইতিহাস আলোচনা করবেন বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই।

৩। বইটির কন্টেন্ট সম্পর্কে জানা এবং এর প্রয়োজনীয়তা চিন্তা করা। যেহেতু জীবন ছোট এবং কাজ অনেক তাই জ্ঞানের কোন কোন অংশ আমার আগে জানা দরকার তা ঠিক করে এগোতে হবে। মনে রাখতে হবে সব বই সবার জন্য নয়, তাই ভালো বই হলেই কিনে ফেলা যাবে না। আগে দেখতে হবে আমার জন্য এই বই দরকারি কি না। ধরুন, আব্বাসি আমলে বাগদাদ শহরের স্থাপত্যকলা নিয়ে একটি বই আছে। এখন একজন সাধারণ পাঠক যিনি এখনো সিরাত পড়েননি, খোলাফায়ে রাশেদিনের জীবনী পড়েননি, তিনিও যদি এই বই সংগ্রহ করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন তাহলে তা হবে অনুচিত। তাকে প্রথমে সিরাত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। পরে চাইলে এই বিষয়ে অধ্যয়ন করবেন।

৪। বই ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আলেম ও গবেষকদের সাথে পরামর্শ করা। তাদের গাইডলাইন নিলে এ ক্ষেত্রে অনেক কাজ সহজ হয়ে যাবে।

৫। কিছু ক্ষেত্রে লেখক ও বই থাকে নতুন। এ ক্ষেত্রে বইয়ের ফ্ল্যাপ পড়লে কিছুটা ধারণা মিলে। সূচিপত্র দেখেও ধারণা নেওয়া যেতে পারে।

* * *

পরিশিষ্ট—১

সাহাবায়ে কেরাম কি বিজিত এলাকার মূর্তি অক্ষত রেখেছিলেন?

সদ্যপ্রয়াত হাল-জামানার মিশরীয় আলিম শাইখ মুহাম্মাদ ইমারাহ প্রতিকৃতির বিষয়ে বলেন, সাহাবায়ে কেরাম বিজিত দেশগুলোর উপাস্য নয়, এমন প্রতিকৃতিকে রেখে দিতেন। আমর ইবনুল আস রা. মিশর জয় করেন। কিছু মূর্তি ভেঙে কিছু রেখে দেন। কারণ, ওগুলো উপাস্য ছিল না। এবং মিশরের খ্রিষ্টানরা এগুলোর উপাসনা করত না। এটা মুসলিম সৈন্যবাহিনীর বিশ্বাসের জন্য হুমকি হওয়ার আশঙ্কা ছিল না।[১৯১]

মুহাম্মাদ ইমারাহর এই উদ্ধৃতিটি শরয়ি ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমে আমরা মূর্তির বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা দেখে আসি—

১। আবুল হাইয়াজ আল-আসাদি বলেন, একদিন আলি ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটা কাজে পাঠাব না, যে কাজে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তুমি কোনো প্রতিকৃতি পেলে তা ধ্বংস করে ফেলবে এবং কোনো উঁচু কবর দেখতে পেলে সমান করে দেবে।[১৯২]

২। আমর ইবনে আবাসা রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ আপনাকে কোন কোন নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন? নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন। ১. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, ২. মূর্তি ভাঙা এবং ৩. আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে নেওয়া, যার সাথে কোনোকিছু শরিক করা হবে না।[১৯৩]

এই হাদিস দুটিতে দুটি শব্দ এসেছে। তিমসাল ও আওসান। তিমসাল শব্দটির বেশ কয়েকটি অর্থ রয়েছে। ইবনু মানযুর রহিমাহুল্লাহ তিমসাল শব্দটির তিনটি অর্থ লিখেছেন—

ক. তিমসাল অর্থ চিত্র, প্রতিকৃতি।

---

[১৯১]. *আল-ইসলাম ওয়াল ফুনুনুল জামিলাহ,* ৩৭।

[১৯২]. সহিহ মুসলিম, হাদিস ৯৬৯।

[১৯৩]. সহিহ মুসলিম, হাদিস ৮৩২।

খ. ছায়া, প্রতিচ্ছবি।

গ. আল্লাহ তাআলার কোনোপ্রকার মাখলুকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে বানানো কোনো বস্তু।[১৯৪] শেষের অর্থটিকে এক কথায় মূর্তি ও ভাস্কর্য বলে প্রকাশ করা যেতে পারে। হাদিসে 'তিমসাল' ধ্বংস করার জন্য ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে 'তামাসা' অর্থাৎ মুছে ফেলা। তামাসার আরেকটি অর্থ হলো 'হাদামা' বা ধ্বংস করা।

তাহলে প্রথম হাদিসটির সর্বনিম্ন যে অর্থ দাঁড়াচ্ছে তা হলো, খোদাইকৃত যেকোনো মূর্তি বা প্রতিকৃতি পেলে সেটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। এটা শব্দের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অর্থটি ধরে নিয়ে বলা। তিমসাল শব্দ যে স্পষ্ট মূর্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, সেই অর্থে ধরা হলে যেকোনো মূর্তি ধ্বংসের অর্থ হবে। উদ্দেশ্য যে মূলত দ্বিতীয়টি, তা পরবর্তী হাদিস দ্বারা স্পষ্ট হয়।

এবার দ্বিতীয় হাদিসটিতে ব্যবহৃত শব্দটি দেখা যাক। সেখানে ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে 'আওসান', শব্দটি বহুবচন। একবচনে 'ওয়াসানুন'। ওয়াসানুনের প্রথম অর্থ হচ্ছে, সর্বদা কোথাও স্থির দাঁড়িয়ে থাকা বস্তু। এর দ্বিতীয় অর্থটি হলো, যেকোনো ধরনের মূর্তি। মূর্তির জন্য ব্যবহৃত আরবি আরেকটি শব্দ হলো সানামুন। ইবনুল আসির বলেছেন, ওয়াসানুন এবং সানামুনের মাঝে পার্থক্য হলো, ওয়াসানুন মানে মাটি, কাঠ বা পাথর ইত্যাদি দিয়ে তৈরি দেহবিশিষ্ট মূর্তি। আর সানামুন হলো, শুধু প্রতিকৃতি।[১৯৫] দ্বিতীয়ত, এখানে মূর্তি ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত শব্দ হলো, কাসারা অর্থাৎ ভেঙে ফেলা।

তাহলে এই হাদিসে স্পষ্টভাবেই দেহবিশিষ্ট মূর্তি ও ভাস্কর্য ভাঙার নববি নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। কুরআনে সানামুন শব্দ দিয়ে মূর্তির নিষেধাজ্ঞার কথা আছে। সুতরাং আয়াত ও হাদিসের ভাষাগত সমন্বয়ে যে বিষয়টি স্পষ্ট হলো তা হচ্ছে, শুধু ছবি বা প্রতিকৃতি, দেয়ালে বা পাথরে খোদাই করে বানানো মূর্তি এবং স্বতন্ত্র দেহবিশিষ্ট মূর্তি ও ভাস্কর্য, সবগুলোই স্পষ্ট নসের মাধ্যমে নিষিদ্ধ প্রমাণিত। হাদিসের ঘটনা দ্বারা সেগুলো ভাঙার জন্য নবিজির নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে।

৩। মক্কা বিজয়ের দিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উযযা মূর্তি ভাঙতে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন। মূর্তিটি নাখলায় একটি ঘরের ভেতর ছিল। কুরাইশ, কিনানা ও মুযার গোত্রের যেসব

---

[১৯৪]. লিসানুল আরব, ৬/১৫, ইবনু মানযুর। দারু সাদির, বৈরুত, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ।

[১৯৫]. প্রাগুক্ত, ৬/৩...।

লোক ওই এলাকায় বসবাস করত, তারা সেখানে এর পূজা করত। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সেটিকে ধ্বংস করে দেন।[১৯৬]

৪। আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের পর হুযাইল গোত্রে গমন করে নবিজির নির্দেশে 'সুওয়া' মূর্তি ধ্বংস করেন।[১৯৭]

আফসোস, যে আমর ইবনুল আস নিজে নবিজির নির্দেশে সুওয়া মূর্তি ধ্বংস করেছিলেন, তার ব্যাপারে বলা হচ্ছে তিনি কিছু মূর্তি অক্ষত রেখেছিলেন।

এবার চলুন দেখে নিই মূর্তির ব্যাপারে ফিকহের নির্দেশনা কী।

আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. লিখেছেন, মুসলমানদের শহর তিন প্রকার।

এক. যেসব শহর মুসলমানরা নির্মাণ করেছে। যেমন, কুফা, বসরা, বাগদাদ, ওয়াসেত ইত্যাদি। এসব শহরে নতুন করে মূর্তি কেনাবেচা শুরু করা, ভিন্নধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণ করা এবং তাদের উপাসনার জন্য জমায়েত করা জায়েজ নেই। এই ব্যাপারে আহলুল ইলমের ইজমা রয়েছে।

দুই. যেসব শহর মুসলমানরা যুদ্ধ করে বিজয় করেছে। সেখানেও সর্বসম্মতিক্রমে নতুন করে এসব করা জায়েজ নেই। এখন প্রশ্ন হলো, আগে যদি থাকে সেগুলো কি ভেঙে ফেলতে হবে? ইমাম মালেক, শাফেয়ি ও আহমাদ রহ.-এর একটি মত অনুযায়ী সেগুলো ভেঙে ফেলা আবশ্যক। আমাদের মতে সিদ্ধান্ত হলো, সেসব উপাসনালয় তাদের দায়িত্বে দিয়ে এগুলোকে ঘর বানিয়ে বসবাস করতে বলা হবে। ভেঙে ফেলবে না। ইমাম শাফেয়ি ও আহমদের একটি মতও আমাদের মতের অনুরূপ। কারণ হলো, সাহাবায়ে কেরাম অনেক শহর জয় করেছেন যুদ্ধের মাধ্যমে। কিন্তু সেখানকার উপাসনালয় ও আশ্রম ভাঙেননি।

তিন. যেসব শহর সন্ধির মাধ্যমে বিজয় করা হয়েছে। যদি সন্ধি হয় এভাবে যে, অঞ্চল তাদের কিন্তু জিজিয়া দেবে মুসলমানদেরকে, তাহলে সেখানে নতুন করেও কেনাবেচা করতে পারবে। আর যদি সন্ধি হয় এই শর্তে যে, জমিনের মালিকও মুসলমানরা এবং তারা জিজিয়াও দেবে, তাহলে উপাসনালয়ের ক্ষেত্রে হুকুম হবে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী। অর্থাৎ, শর্তে যদি উপাসনালয় নির্মাণের

১৯৬. *সিরাতে ইবনে ইসহাক*, পৃ. ৫৪৬-৫৪৭, ইবনু ইসহাক।
১৯৭. *মাগাযি*, পৃ. ৭, ওয়াকিদি। কলকাতা সংস্করণ।

অনুমতি থাকে তাহলে নির্মাণ করতে পারবে। তবে উত্তম হলো, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো অনুমতির শর্ত না রাখা।[১৯৮]

এবার আসুন মুহাম্মাদ ইমারাহর বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করা যাক। তার বক্তব্যের সারকথা হলো, সাহাবায়ে কেরাম বিজিত দেশগুলোর উপাস্য নয় এমন মূর্তি রেখে দিতেন। শুধু যেগুলো উপাস্য সেগুলো ভাঙতেন।

প্রথমত, এটি তো একেবারেই বাস্তবতা-বিবর্জিত কথা। ফিকহ এবং ইতিহাস থেকে আমরা যেটা দেখি শর্তসাপেক্ষে উপাসনালয়ের মূর্তিগুলো রাখা হবে। যেন মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমরা তাদের উপাসনা চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু অন্য মূর্তি কোনোভাবেই রাখা হবে না। অথচ মুহাম্মাদ ইমারাহ বলতে চাচ্ছেন সাহাবিরা যেগুলো উপাস্য মূর্তি সেগুলো ভেঙেছেন, অন্যগুলো রেখেছেন। যা একেবারেই অবাস্তব।

দ্বিতীয়ত, এখানে কথা বলা হচ্ছে সেই মুবারক জামাত সম্পর্কে, যারা মক্কা বিজয়ের সময় নবিজির সাথে ছিলেন। নবিজিকে তারা স্বচক্ষে মূর্তি ভাঙতে দেখেছেন। মূর্তি সম্পর্কে নবিজির নির্দেশনা তারা জানতেন। এরপরও এটা কী করে সম্ভব যে তারা কোনো মূর্তি দেখেছেন কিন্তু তা ভাঙেননি। এটি নিশ্চিতভাবে সাহাবায়ে কেরামের ওপর বড় ধরনের অপবাদ।

পরবর্তী আলোচনার আগে এখানে একটি মৌলিক বিষয় বলে রাখা যাক। পাশ্চাত্য-মানস প্রভাবিত আধুনিক গবেষকদের একটি বড় অংশ প্রায়ই ইসলামকে এমন এক রূপ দিতে চেষ্টা করেন, যেটি ইসলামের প্রকৃত রূপ নয়। পাশ্চাত্য ও আধুনিকতার সাথে তাল মিলানোর জন্য তারা ইসলামকে এর নিজস্ব অবস্থান থেকে টেনে অন্য দিকে নিয়ে যেতে চান। এই ধরনের গবেষকদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, কোনো বিষয়ের সমাধানের জন্য তারা ফিকহশাস্ত্রকে আলোচনায় রাখেন না। ফিকহকে এড়িয়ে তারা ইতিহাসের কোনো ঘটনা খুঁজে নেন, যেখানে কেউ বিচ্যুতির শিকার হয়েছিল। তারপর একেই দলিল বানান।

ধরা যাক, শাতিমে রাসুলের ইস্যু এলো। তারা এ ক্ষেত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল কিংবা ফিকহের নির্দেশনা আলোচনা করবেন না। তারা খুঁজে-টুজে ইতিহাসের কোনো বর্ণনা নিয়ে আসবেন, যেখানে দেখা যাবে কোনো শাসক শাতেমে রাসুলকে শাস্তি না দিয়ে খাতির করেছিল। এখন এই শাসকের কাজটি শরিয়াসম্মত হয়েছিল কি না সেই আলোচনা না করেই

---

[১৯৮]. *ফাতহুল কাদির*, ৬/৫৪, *দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা*, ১৪২৪ হিজরি।

তারা বলে দেবে, দেখুন ইসলাম শাতিমে রাসুলের ওপর এত কঠোর হওয়ার আদেশ দেয় না। এভাবে এই ধরনের গবেষকরা ব্যক্তির বিচ্যুতিকে শরিয়াহর দলিল বানাতে উঠেপড়ে লাগে। তাদের কারও কারও লেখা পড়লে তো এমনও মনে হয় ঈমান ও কুফরের মাঝে সংঘাতের কিছু নেই। দুটি মূলত এক বৃন্তের দুই ফুল। মুমিন আর কাফের আখিরাতে পাশাপাশি দুই বাড়িতে থাকবে। এক বাড়ির নাম জান্নাত, আরেক বাড়ির নাম জাহান্নাম। দুনিয়ার মতো আখিরাতেও তারা প্রতিবেশী হিসেবেই থাকবে। জানালা দিয়ে খোশগল্প করবে।

মুহাম্মাদ ইমারাহ কিংবা তার মতো অন্য গবেষকরা যারা বলতে চান সাহাবায়ে কেরাম মিশর বা বিজিত এলাকার অনেক মূর্তি ভাঙেননি তাদের দলিল হলো, যদি সাহাবায়ে কেরাম মূর্তি ভাঙতেনই তাহলে মিশরে ফারাওদের মূর্তি কীভাবে রয়ে গেল। কীভাবে রয়ে গেল গ্রেট স্ফিংস অফ গিজা নামে পরিচিত সুবিশাল মূর্তিটি?

শাইখ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ এই প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন, সাহাবায়ে কেরামের মূর্তি না ভাঙার পেছনে তিনটি কারণ বিদ্যমান।

১। সাহাবায়ে কেরাম মিশর জয় করলেও তারা সকল অঞ্চলে পৌঁছতে পারেননি। এই মূর্তিগুলোর অবস্থান ছিল দূরবর্তী এলাকায় যেখানে সাহাবায়ে কেরাম পৌঁছেননি।

২। এসব মূর্তির অনেকগুলো বাইরে ছিল না, বরং ফারাওদের পরিত্যক্ত বাসস্থানের ভেতরে ছিল। নবিজির নির্দেশনা হলো জালেম ও আজাবপ্রাপ্তদের বাসস্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় তার ভেতরে প্রবেশ করা যাবে না। পাথরপূজারি সামুদ গোত্রের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদেরকে বলেছিলেন, তোমরা এইসব আযাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের এলাকায় যেয়ো না। যদি যেতেই হয় তবে ক্রন্দনরত অবস্থায় যাবে। এই আশঙ্কায় যে, তাদের মতো আজাব তোমাদেরকেও আক্রান্ত করতে পারে।[১৯৯] এই হাদিসের নির্দেশনা মেনে সাহাবায়ে কেরাম ফারাওদের পরিত্যক্ত বাসস্থানে প্রবেশ থেকে বিরত থাকতেন।

৩। বর্তমানে যেসব মূর্তি দেখা যাচ্ছে এর অনেকগুলোই সাহাবিদের সময়ে মাটি বা বালুর নিচে লুকানো ছিল। এগুলো পরে প্রাকৃতিক পরিবর্তন বা প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে আবিষ্কৃত হয়। গবেষক যিরিকলির মত হলো, এসব

---

১৯৯. সহিহ বুখারি, হাদিস ৪৪২০, ৪৭০২। সহিহ মুসলিম, হাদিস ২৯৮০।

মূর্তির বেশিরভাগই সাহাবিদের সময়ে বালুর নিচে ছিল, বিশেষ করে স্ফিংস অফ গিজা।[২০০]

এরপরও যদি ধরে নিই, সাহাবায়ে কেরাম মূর্তি না ভেঙে রেখে দিতেন, তাহলে প্রথমে এটা প্রমাণ করতে হবে যে, তারা এই মূর্তিগুলো দেখেছিলেন, এবং ভাঙতে সক্ষম ছিলেন; কিন্তু তারপরও ভাঙেননি।[২০১]

শাইখ সালিহ আল-মুনাজ্জিদের আলোচনা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা দেখি মিশরে যে-সকল মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে এর বেশিরভাগই আবিষ্কৃত হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের যুগের পরে। বেশ কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে ফারাওদের সমাধি আবিষ্কারের সময়, সমাধির ভেতরে। গত দুই শতাব্দীর মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে ফারাওদের এমন কিছু সমাধির তালিকা নিম্নরূপ—

১। আহতেপের সমাধি। আবিষ্কারের সময় ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দ।

২। আহমোসের সমাধি। আবিষ্কারের সময় ১৯০৩-৫ খ্রিষ্টাব্দ।

৩। আহমোসে মেরিতামুনের সমাধি। আবিষ্কারের সময় ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ।

৪। ইনহাপির সমাধি। আবিষ্কারের সময় ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দ।

৫। আমেনহোপের সমাধি। আবিষ্কারের সময় ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ।

এসব সমাধি থেকে অনেক মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এখনো মিশরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে নতুন নতুন মূর্তি আবিষ্কৃত হচ্ছে। ২০১৭ সালে কায়রোর কাছে মাটি খুঁড়ে প্রায় তিন হাজার বছর আগের একটি মূর্তি আবিষ্কার করা হয়। ২০১০ সালে 'টাপোসিরিস ম্যাগনা' মন্দির থেকে উদ্ধার করা হয় গ্রানাইট পাথরের একটি মূর্তি।

এবার আসা যাক স্ফিংস অফ গিজার বিষয়ে। স্ফিংস তৈরি করা হয়েছিল প্রায় চার হাজার বছর আগে। গোটা মূর্তিটি মাত্র একটি চুনাপাথর কেটে তৈরি করা হয়েছিল। যার দৈর্ঘ্য ছিল ৭৩ মিটার এবং উচ্চতা ছিল ২০ মিটার। পৃথিবীতে পাথর কেটে যত ভাস্কর্য তৈরি করা হয়েছে তার মধ্যে স্ফিংস বৃহত্তম। ১৯২৫ সালের আগ পর্যন্ত স্ফিংসের গোটা দেহটি দেখতে কেমন তা কেউ জানত না। মুখমণ্ডল ছাড়া সবটাই বালুতে ডুবে ছিল। ১৯২৫ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এমিল বারেজ নামক এক ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ চালিয়ে

---

২০০. শিবহু জাযিরাতিল আরব, ৪/১১৮৮।

২০১. শাইখের পুরো আলোচনা দেখুন—https://bit.ly/3b7NDe.

স্ফিংসকে বালুর নিচ থেকে বের করেন। অর্থাৎ স্ফিংসটির বেশিরভাগ অংশ ১৯২৫ সাল পর্যন্ত বালুর নিচে চাপা ছিল।

আরেকটু পেছনে যাওয়া যাক তাহলে। দেখা যাক, মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে কারা কারা স্ফিংসের আলোচনা করেছেন।

আবদুল লতিফ বাগদাদি মধ্যযুগের একজন বিখ্যাত পর্যটক। তিনি ৫৫৭ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিশর সফরকালে স্ফিংস দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, পিরামিডের কাছে একটি বিশাল মূর্তি রয়েছে যার ওপরের অংশ দৃশ্যমান, শরিরের বাকি অংশ মাটির নিচে।[(২০২)]

তাহলে দেখা যাচ্ছে হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীতেও স্ফিংসের বেশিরভাগ অংশ মাটির নিচেই চাপা ছিল। শুধু মাথার অংশ ওপরে ছিল। আরেকটু পেছনে ফেরা যাক এবার। বিখ্যাত ঐতিহাসিক হিরোডোটাস। ৪৮৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন বলে ধারণা করা হয়। ইতিহাসের তথ্য অনুসন্ধানে তিনি বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। তিনি মিশরও ভ্রমণ করেন। তার লিখিত 'দ্য হিস্টরিজ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে পুরোটাই এসেছে মিশরের আলোচনা। এখানে তিনি পিরামিড, দেব-দেবী, জীবনাচার, চিকিৎসাব্যবস্থা এমনকি নীলনদের নৌকার বিবরণ ইত্যাদি এনেছেন। তিনি যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখেছেন তার কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি স্ফিংসের কথা উল্লেখ করেননি।[(২০৩)]

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে হিরোডোটাসের সময় স্ফিংসের পুরোটাই সম্ভবত বালুর নিচে চাপা ছিল। হিরোডোটাসের সাথে আবদুল লতিফ বাগদাদির সময়ের ব্যবধান প্রায় ১৫০০ বছর। এ থেকে অনুমান করা যায়, স্ফিংস মাটির নিচে চাপা ছিল অন্তত হিরোডোটাসের সময় পর্যন্ত, পরে কোনোভাবে এর ওপরের অংশ দৃশ্যমান হয়। কিন্তু তা কখন দৃশ্যমান হয় তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।[(২০৪)]

এখন আমরা মূর্তির ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা দেখব, নবিজির আমল দেখব এরপর চিন্তা করব, এটি কী করে সম্ভব যে সাহাবায়ে কেরাম নবিজির আমল জানার পরেও এ ধরনের মূর্তিকে অক্ষত রেখে দেবেন। আমরা নবিজির

---

২০২. রিহলাতু আবদুল লতিফ বাগদাদি ফি মিসর, পৃ. ৯৬, আবদুল লতিফ বাগদাদি।

২০৩. দেখুন, Histories, volume ১, Books ১-২, Herodotus. Ed. A. D. Godley. Page ২৭৫-৪৯৮. বাংলায় পড়তে দেখুন শাহেদ আলি অনূদিত 'ইতিবৃত্ত'। প্রকাশক বাংলা একাডেমী।

২০৪. স্ফিংসের ইতিহাস জানতে দেখুন ডক্টর সালিম হাসান রচিত 'আবুল হুল'।

আমল এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে এই সিদ্ধান্তই নেব যে সাহাবায়ে কেরামের যুগে স্ফিংস মাটির নিচে লুক্কায়িত ছিল। এটি প্রকাশিত হয়েছে পরে কখনো। সম্ভবত, মুসলমানদের বিজয়ের পর থেকে আবদুল লতিফ বাগদাদির সময়কাল পর্যন্ত মাঝের কোনো সময়ে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে এর ওপরের অংশ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

এরপরের কথা হলো, যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে, সাহাবায়ে কেরামের সময় স্ফিংসের ওপরের অংশ দৃশ্যমান ছিল, তাহলে এটিও মেনে নিতে হবে যে, এ ধরনের বিশাল পাথুরে মূর্তি ভেঙে ফেলার মতো সরঞ্জাম সাহাবায়ে কেরামের হাতে ছিল না। সাহাবায়ে কেরামের মিশর জয়ের প্রায় ২০০ বছর পর খলিফা মামুন পিরামিড ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি শ্রমিক নিয়োগ দিয়ে অনেক দিন ব্যয় করেও এই শক্তিশালী স্থাপনা ভাঙতে পারেননি।[২০৫]

যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে সাহাবায়ে কেরাম স্ফিংস দেখেছিলেন তবুও এ কথা মানতে হবে যে এটি ধ্বংস করার মতো শক্তিশালী সরঞ্জাম তাদের হাতে ছিল না। আগেই বলেছি, সাহাবায়ে কেরাম স্ফিংস বা এ ধরনের কোনো মূর্তি দেখেছেন এবং ইচ্ছাকৃত তা অক্ষত রেখেছেন এমন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। মুহাম্মাদ ইমারাহ যে অনুমান করেছেন তা খুবই দুর্বল এবং নিছকই অনুমান। আর নিছক অনুমান দিয়ে কোনোকিছু প্রমাণ করা যায় না।

এবার ঐতিহাসিক মাকরেজির একটি বক্তব্য দেখা যাক।

তিনি লিখেছেন, তার সময়কালেও স্ফিংসের ওপরের অংশ দৃশ্যমান ছিল। এ সময় স্ফিংসকে ঘিরে মানুষের কিছু বিশ্বাস ও প্রথা গড়ে উঠেছিল। এ অবস্থা দেখে ৭৮০ হিজরিতে মুহাম্মাদ সাইম আদ-দাহর নামে একজন সুফিসাধক স্ফিংসের চেহারার কিছু অংশ ভেঙে ফেলেন।[২০৬]

দেখুন, মুকরিজি হিজরি অষ্টম শতাব্দীর কথা বলছেন। সে সময়ই একজন মুসলিম এটি ভেঙে ফেলার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাহলে সাহাবায়ে কেরামের সেই মুবারক জামাত, যারা খাইরুল কুরুনের প্রতিনিধি, তাদের ব্যাপারে কী করে এই সন্দেহ করা যায় যে, তারা স্ফিংস দেখেও এটিকে অক্ষত রেখেছেন;

---

২০৫. *আল-মুকাদ্দিমা*, ১/১৪, ইবনু খালদুন। দারুল বলখি, দিমাশক, ১৪২৫ হিজরি।

২০৬. *আল-মাওয়ায়েজ ওয়াল-ইতিবার বিজিকরিল খুতাতি ওয়াল-আসার*, ১/৩৪৮, আল্লামা মাকরেজি। মাকতাবাতু মাদবুলি, কায়রো, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ।

ভেঙে ফেলার কোনো চেষ্টা করেননি? যেখানে স্বয়ং নবিজি এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন।

পুরো আলোচনার সারকথা হলো, সাহাবায়ে কেরামের সময় কোনো অঞ্চল জয় করার পর সেখানকার উপাসনালয়ের মূর্তিগুলো অমুসলিম বাসিন্দাদের জন্য রেখে দেওয়া হতো। কিন্তু উপাসনালয়ের বাইরের যেসব মূর্তি সেগুলোতে কোনো ছাড় দেওয়া হতো না। যারা এই কথা বলেন যে, সাহাবায়ে কেরাম কিছু মূর্তি ভাঙেননি, তারা তাদের দাবির পক্ষে কোনো দলিল পেশ করতে পারেন না। তারা কোনোভাবেই প্রমাণ করতে পারেন না যে, সাহাবায়ে কেরাম এ ধরনের মূর্তি দেখেছেন, ভাঙতে সক্ষম ছিলেন, তবু তারা তা অক্ষত রেখে দিয়েছিলেন। এই সকল গবেষকরা নিছক অনুমান করেন। তাদের এই অনুমান নানা কারণে ভুল, যা সম্পর্কে ওপরে আলোকপাত করা হয়েছে।

শেষ কথায় আসি। ইসলামের ইতিহাস চর্চার উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের মূল চেতনা উজ্জীবিত করা। সালাফদের আদর্শে নিজেদের সাজানো। ইসলামের মূল আবেদন ও বার্তা রক্ষা করাই এখানে মূল কাজ। অন্যগুলো শাখা-প্রশাখা। এখন শাখা-প্রশাখা সুন্দর করার জন্য যদি গোড়া কেটে ফেলা হয় তাহলে সেটা বোকামি হবে। ইমাম কারাফি রোবট আবিষ্কার করেছিলেন কি করেননি, তার এই রোবট ভাস্কর্য ছিল না অন্য কিছু, এই আলাপ অতটা জরুরি নয়, যতটা জরুরি হলো মূর্তির ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান পরিষ্কার করা। মুসলিমরা এক সময় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা করেছেন এই কথা শক্তিশালী করার জন্য যদি সাহাবায়ে কেরামের ওপর মূর্তি না ভাঙার অপবাদ দিতে হয়, তাহলে আর থাকেইটা কী?

আল্লাহ আমাদের সকলকে সতর্ক থাকার তাওফিক দান করুক।

* * *

পরিশিষ্ট—২

বাতিল আকিদার লেখকদের লেখা পাঠ সম্পর্কে আলেমদের বক্তব্য[২০৭]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের প্রায় সকল আলেমই এ ব্যাপারে একমত যে, বাতিল ফিরকার কিতাব পড়া ও তাদের বাতিল মতবাদের দলিলাদি অধ্যয়ন করা থেকে বিরত থাকা একান্ত কাম্য। যাতে করে সাধারণ মুসলমান ও ঈমানদাররা তাদের ঈমান-আকিদাকে হিফাজত করতে পারে।

কেননা বাতিলপন্থিদের অসার যুক্তি ও প্রমাণাদি অনেক সময় বড় বড় আলেমদেরকেও সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত করে থাকে।

ইমাম ইবনু আবেদিন আশ-শামি রহ. শাইখ আবদুল গনি নাবলুসির হাওয়ালায় বলেন—

وَقَدْ نُهِينَا عَنْ النَّظَرِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ

আমাদের তাওরাত ও ইনজিল কোনোকিছু অধ্যয়ন করতে নিষেধ করা হয়েছে।[২০৮]

ইমাম নববি রহ. বলেন—

وكتب التوراة والإنجيل مما يحرم الانتفاع به، لأنهم بدلوا وغيروا،...

তাওরাত ও ইনজিল থেকেও ফায়দা নেওয়া হারাম। কেননা ইহুদি-খ্রিষ্টানরা এ দুটি কিতাবকে পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করেছে।[২০৯]

وسئل أحمد عن قراءة التوراة والإنجيل والزبور ونحو ذلك فغضب، وظاهره الإنكار .وذكره القاضي» ، واحتج بأن النبي ﷺ لما رأي في يد عمر قطعة من التوراة غضب وقال«:ألم آت بها بيضاء نقية؟ « الحديث.

---

২০৭. এই গ্রন্থের পাঠকদের জন্য মূল্যবান এই প্রবন্ধটি লিখেছেন শায়খ আবদুল্লাহ আল মামুন হাফিজাহুল্লাহ।

২০৮. *হাশিয়ায়ে ইবনু আবেদিন*, ১/১৭৫।

২০৯. *রওযাতুত তালেবিন*, নববি, ১০/২৫৯।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহকে (প্রচলিত) তাওরাত, ইনজিল ও যাবুরের মতো বিভিন্ন কিতাবাদি পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, প্রশ্ন শুনে তিনি প্রচণ্ড রাগান্বিত হলেন যার বাহ্যিক অবস্থায় বোঝা গেল যে, তিনি এ কাজকে অন্যায় হিসেবে পরিগণিত করেছেন। এরপর তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত ওই হাদিসটি দলিল হিসেবে বর্ণনা করেন যেখানে বলা আছে—

যখন উমর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওরাতের কিছু অংশ দেখা মাত্র রাগান্বিত হয়ে বললেন—

> আমি কি তোমাদের কাছে উজ্জ্বল, স্বচ্ছ ও নির্ভুল কিতাব ও শরিয়ত নিয়ে আসিনি!?[২১০]

(উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত হাদিসটির সনদ মুহাদ্দিসদের নিকট দুর্বল। তবে এই মর্মে বিভিন্ন সনদে হাদিস বর্ণিত হয়েছে যার মূলভাব সঠিক।)

> أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ ، فَقَرَأَهُ على النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ وَقَالَ :أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً ، لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا ، مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي

জাবের ইবনু আবদিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, উমর রা. একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটি কিতাব নিয়ে এলেন যাতে আহলে কিতাবদের কিছু উদ্ধৃতি ছিল যা হজরত উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পাঠ করছিলেন। এই অবস্থা দেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব রাগান্বিত হয়ে বললেন, হে খাত্তাবের বেটা! তোমার সুবুদ্ধির বিদায় হলো নাকি (যে, তুমি তাওরাত থেকে পাঠ করছ)! যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, আমি তোমাদের নিকট উজ্জ্বল, স্বচ্ছ ও নির্ভুল কিতাব ও শরিয়ত নিয়ে এসেছি। আহলে কিতাবদের কাছে কোনো প্রশ্ন করো না। কেননা (হতে পারে) তারা তোমাদের (তাদের কিতাব থেকে) কোনো হক কথা শোনাল আর তোমরা তা অস্বীকার করলে কিংবা এমন বাতিল কথা শোনাল

---

২১০. *কাশশাফুল কিনা*, বুহুতি, ১/৪৩৪; *আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যাহ*, ৩৪/১৮৫।

আর তোমরা তা সত্য প্রতিপন্ন করলে! ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, যদি নবি মুসা আলাইহিস সালামও (যার ওপর তাওরাত নাজিল হয়েছে) এখন জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ ছাড়া তার আর কোনো পথ থাকত না।[২১১]

وهذه جميع طرق هذا الحديث ، وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به ، لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلا.

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রহ. এই হাদিসের সকল সনদ উল্লেখ করে সার্বিক বিশ্লেষণে গ্রহণযোগ্য বলেছেন।[২১২]

ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب نصاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر صحيفة من التوراة، وقال» :أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ » الحديث، ولا النظر في كتب أهل البدع، ولا النظر في الكتب المشتملة على الحق والباطل، ولا روايتها، لما في ذلك من ضرر إفساد العقائد.

আল্লামা বুহুতি আল-হাম্বলি রহ. বলেন, আহলে কিতাবদের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করা জায়েজ নেই। কেননা এ ব্যাপারে হাদিসের নস রয়েছে যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে তাওরাত দেখলেন তখন বললেন, হে উমর, তুমি কি (ইসলাম ও কুরআনের ব্যাপারে) সন্দেহে লিপ্ত? এবং বিদআতিদের কিতাবাদি, হক-বাতিল সংমিশ্রিত কোনো কিতাব অধ্যয়ন করা ও বর্ণনা করাও জায়েজ নেই। কেননা এতে করে আকিদার সাংঘাতিক বিচ্যুতি ঘটার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।[২১৩]

ولما كان القرآن أحسن الكلام ، نُهوا عن اتباع ما سواه ، قال تعالى:

﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ العنكبوت٥١ -

وروى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد عمر بن الخطاب شيئا من التوراة ، فقال: لو كان موسى حيًا ثم اتبعتموه

---

২১১. *মুসনাদে আহমাদ*, ১৪৭৩৬, হাদিসটির মান হাসান।
২১২. *ফাতহুল বারি*, ১৩/৫২৫।
২১৩. *কাশশাফুল কিনা আন মাতানিল ইকনা*, বুহুতি, ১/৪৩৪।

وتركتموني : لضللتم . وفي رواية : ما وسعه إلا اتباعي ، وفي لفظ: » فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه عمر ذلك ، فقال له بعض الأنصار : يا ابن الخطاب ! ألا ترى إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيًا ولهذا كان الصحابة ينهون عن اتباع كتب غير القرآن . وعمر انتفع بهذا حتى إنه لما فتحت الإسكندرية وجد فيها كتب كثيرة من كتب الروم فكتبوا فيها إلى عمر فأمر بها أن تحرق، وقال :حسبنا كتاب الله.

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন, ...এজন্যই সাহাবিরা কুরআন ব্যতীত অন্য কিতাবের অনুসরণে নিষেধ করতেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু (রাসুলের ওই নিষেধাজ্ঞার ওপর আমল করত) এ নীতিতে নীতিমান ছিলেন। এমনকি যখন ইসকান্দারিয়া (আলেকজান্দ্রিয়া) জয় করলেন সেখানে তিনি রোমকদের বহু কিতাবাদি পেলেন। রোমানরা সেগুলো (অধ্যয়নের জন্য) উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ করে তার কাছে চিঠি লিখল। এতে করে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এগুলো পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়ে বললেন, আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব কুরআনই যথেষ্ট।[২১৪]

ইমাম ইবনুল মুফলিহ রহ.-ও এর পক্ষে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহর ক্রোধ ও নিন্দাবাদের ঘটনা উল্লেখ করেন।[২১৫]

سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن هذه المسألة في رواية إسحاق بن إبراهيم فغضب فقال :هذه مسألة مسلم؟ وغضب .وظاهره الإنكار، وذكره القاضي ثم احتج بأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى في يد عمر قطعة من التوراة غضب وقال» :ألم آت بها بيضاء نقية؟ «الحديث . وهو مشهور رواه أحمد وغيره .وهو من رواية مجالد وجابر الجعفي وهما ضعيفان، ولأنها كتب مبدلة مغيرة فلم تجز قراءتها والعمل عليها.

---

২১৪. *মাজমুউল ফাতাওয়া*, ইবনু তাইমিয়া, ১৭/৪১-৪২।

২১৫. *আদাবুশ শারিয়াহ*, ইবনুল মুফলিহ, ২/১০০, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।

শাইখ মুহাম্মাদ রশিদ রেজা বলেন, ছাত্রদের ও আওয়ামদের এসব কিতাবাদি পড়া থেকে নিষেধ করা উচিত যাতে করে তাদের আকিদা ও দ্বীনি আহকামসমূহে নিজেরা সন্দিহান না হয়।

নতুবা তাদের এমন অবস্থা (আরব দেশে প্রসিদ্ধ ওই কাহিনির মতো) হয়ে যাবে যেন, কাক ময়ূরের চলনভঙ্গি (নাচ) শিখতে গিয়ে নিজের চলনভঙ্গিই ভুলে যায়। এবং এভাবে (না সে নিজের চলনভঙ্গি মনে রাখে আর না সে) তিতির পক্ষীর হাঁটাও শিখতে পারে।[২১৬]

ينبغي منع التلامذة والعوام من قراءة هذه الكتب لئلا تشوش عليهم عقائدهم وأحكام دينهم ، فيكونوا كالغراب الذي حاول أن يتعلم مِشية الطاووس فنسي مشيته ولم يتعلم مشية الحجل

তবে যদি তাদের মতবাদ ও ফিতনা উম্মাহর মাঝে প্রকট আকারে ছড়িয়ে পড়ে তবে ফিতনার অবসান ঘটানোর জন্য কোনো বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ আলেম কর্তৃক তাদের মতবাদ সমুচিতভাবে খণ্ডনের জন্য তাদের কিতাবাদি ও দলিলসমূহ অধ্যয়ন করা যাবে। অথবা তাদের কিতাবাদি যাতে কেউ পড়ে বিভ্রান্ত না হয় সে ক্ষেত্রে তা ক্রয় করে নষ্ট করা যাবে।

আল্লামা বুহুতি বলেন, ...এবং পুড়িয়ে ফেলা ও নষ্ট করার উদ্দেশ্যে যিন্দিক ও তাদের মতো ভ্রান্ত ফিরকার কিতাবাদি ক্রয় করা বৈধ, যেমন বিদআতিদের কিতাবাদি।[২১৭]

ويصح شراء كتب الزندقة ونحوها ككتب المبتدعة ليتلفها.

ইমাম নববি রহ.-ও কুফরি ও অশ্লীল কিতাবাদি থেকে কোনোপ্রকার ফায়দা নেওয়াকে হারাম বলেছেন তবে সামর্থ্য ও সুযোগ থাকলে ওই সকল কিতাবকে আপন অবস্থায় বহাল না রেখে তার (দোয়াত) কালি মোছা সম্ভব হলে মুছে বিক্রি করে আর্থিক ফায়দা নেওয়া, ছিঁড়ে ফেলা অথবা পুড়িয়ে ফেলাকে উৎসাহিত করেছেন।[২১৮]

وما حرم الانتفاع به ، ككتب الكفر والهجو والفحش المحض ، لم يترك بحاله بل إن كان في رق أو كاغد ثخين وأمكن غسله ، غسل ، ثم

---

২১৬. *আল-ফাতাওয়া*, ১/১৩৭।
২১৭. *শরহুল মুনতাহাল ইরাদাত*, বুহুতি, ৩/১২৯।
২১৮. *রওযাতুত তালেবিন*, নববি, ১০/২৫৯।

هو كسائر الأموال ، فإن لم يمكن ، أبطلت منفعته بتمزيق ، ثم
الممزق كسائر الأموال ، وعن القاضي أبي الطيب أنها تمزق أو تحرق ،
وضعفوا الإحراق لما فيه من التضييع ، لأن للممزق قيمة وإن قلت ،
وكتب التوراة والإنجيل مما يحرم الانتفاع به، لأنهم بدلوا وغيروا »...

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রহ. বলেন, এ বিষয়ে উত্তম হচ্ছে একটি বিভাজন করা।

১) যার ইলম ও ঈমান পোক্ত ও বিচক্ষণ নয় তার জন্য এসব ভ্রান্ত কিতাবাদি পড়া জায়েজ নেই।

২) তবে যাদের ইলম ও ঈমান পোক্ত ও বিচক্ষণ তাদের জন্য জায়েজ। বিশেষ করে বিরোধীদের খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে দলিল-প্রমাণাদি পেশ করার জন্য যদি হয়।[২১৯]

وَالْأَوْلَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ وَيَصِرْ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْإِيمَانِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، بِخِلَافِ الرَّاسِخِ فَيَجُوزُ لَهُ، وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إِلَى الرَّدِّ عَلَى الْمُخَالِفِ , وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ نَقْلُ الْأَئِمَّةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا مِنَ التَّوْرَاةِ وَإِلْزَامُهُمُ الْيَهُود بِالتَّصْدِيقِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَسْتَخْرِجُونَهُ مِنْ كِتَابِهِمْ , وَلَوْلَا اعْتِقَادُهُمْ جَوَازَ النَّظَرِ فِيهِ لَمَا فَعَلُوهُ وَتَوَارَدُوا عَلَيْهِ.

আল্লামা মুস্তফা আস-সুয়ুতি আর-রহিবানি আল-হাম্বলি রহ. লিখেছেন, বাহ্যিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে যে-সকল ভ্রান্ত ফিরকার লোকেরা নিজেদের ভ্রান্তির বিভিন্ন দলিল দিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এমন কাউকে খণ্ডন করার জন্য হকপন্থি কোনো মেধাবান, দ্বীনের ওপর অবিচল, কুরআন ও সুন্নাহর সহিহ দলিল বের করতে পারে, বাতিলপন্থিদের আকলি ও নকলি দলিলে কুপোকাত করতে পারবে, তাদের দলিলের অপব্যবহার খণ্ডন করতে পারবে ও তাদের ভ্রান্ত আকিদার মুখোশ উন্মোচন করতে পারবে এমন কোনো আলেমের জন্য এটি নিষেধ নয়।[২২০]

---

[২১৯]. *ফাতহুল বারি*, ১৩/৫২৫।
[২২০]. *মাতালিবুল উলিন নুহা*, রহিবানি, ১/৬০৭।

ويتجه جواز نظر في كتب أهل البدع لمن كان متضلعاً من الكتاب والسنة مع شدة تثبت، وصلابة دين، وجودة، وفطنة، وقوة ذكاء، واقتدار على استخراج الأدلة، للرد عليهم وكشف أسرارهم، وهتك أستارهم، لئلا يغتر أهل الجهالة بتمويهاتهم الفاسدة، فتختل عقائدهم الجامدة، وقد فعله أئمة من فقهاء المسلمين وألزموا أهلها بما لم يفصحوا عنه جواباً، وكذلك نظروا في التوراة واستخرجوا منها ذكر نبينا في محلات، وهو متجه.

সুতরাং সাহাবিদের শানের বিপরীতে ও সমালোচনায় যে-সকল ভ্রান্ত লোকের অপবিত্র ও অসতর্ক হাত চলেছে তাদের সেসব কিতাবাদি পড়ার ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে।

* * *

পরিশিষ্ট—৩

সাহাবিদের আদালাত ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের অবস্থান[২২১]

আদালতে সাহাবি হচ্ছে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের ন্যায়নিষ্ঠতা ও গ্রহণযোগ্যতা স্বীকার করা।

কুরআন, সুন্নাহ, ইজমায়ে উম্মতের আলোকে সাহাবিদের কারও নিন্দা-সমালোচনা করা, কটূক্তি করা অথবা গালি দেওয়া জায়েজ নেই।

তাদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের আকিদা হচ্ছে, তারা নবিদের মতো মাসুম তথা নিষ্পাপ নন, তবে তারা মাগফুর, মাহফুজ ও মারহুম তথা ক্ষমাপ্রাপ্ত, সুরক্ষিত ও রহমতপ্রাপ্ত।

সাহাবিদের মর্যাদায় কুরআনের বর্ণনা :

১. মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কীসে বাধা দেয়, যখন আল্লাহই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের (জান্নাতের) ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। [সুরা হাদিদ : ১০]

২. সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের গ্রহণযোগ্যতা এবং যারা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে উপহাস করেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

[২২১]. প্রবন্ধটি লিখেছেন শায়খ আবদুল্লাহ আল মামুন হাফিজাহুল্লাহ।

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾

যখন তাদেরকে বলা হয়, মানুষেরা অর্থাৎ সাহাবিরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো। তখন তারা বলে আমরাও কি বোকাদের মতো ঈমান আনব? মনে রেখো প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা; কিন্তু তারা তা বোঝে না। [সুরা বাকারা : ১৩]

৩. আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

আল্লাহ তাদের ওপর রাজি হলেন, তারাও আল্লাহর ওপর রাজি হলেন। [সুরা বাইয়িনা : ৮]

৪. আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন—

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের ওপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে। চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে, যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। [সুরা ফাতহ : ২৯]

৫. সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন—

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾

ওই সকল মুমিনের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছিল তাতে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা নিজ মানত পূর্ণ করেছে (অর্থাৎ শহিদ হয়ে গিয়েছে।) আর কিছু তাদের মধ্য হতে এর জন্য আগ্রহী এবং অপেক্ষায় আছে (এখনো শহিদ হয়নি) এবং নিজেদের ইচ্ছার মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন ও রদবদল ঘটায়নি। [সুরা আহযাব : ২৩]

৬. আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

মুহাজির ও আনসারদের প্রথম অগ্রবর্তী দল এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, এটাই মহা সাফল্য। [সুরা তাওবা : ১০০]

৭. সুরা নিসার ৯৫ ও সুরা হাদিদের ১০ নম্বর আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ﴾

তাদের (মধ্যে পারস্পরিক তারতম্য থাকা সত্ত্বেও) সবাইকে আল্লাহ তাআলা হুসনা তথা উত্তম পরিণতির (জান্নাত ও মাগফিরাতের) ওয়াদা দিয়েছেন।

সুরা আম্বিয়ার ১০১ নম্বর আয়াতে হুসনা লাভকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾

যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই হুসনার ওয়াদা হয়ে গেছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে।

৮. সুরা হুজুরাতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾

কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, শিরক, পাপাচার ও নাফরমানির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই (সাহাবিগণ) সৎপথ অবলম্বনকারী।

[সুরা হুজুরাত : ৮]

সুরা হুজুরাতের ১৫ নম্বর আয়াতে আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে। তারাই (সাহাবিগণ) সত্যনিষ্ঠ (বা সত্যবাদী)। [সুরা হুজুরাত : ১৫]

৯. পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

অতএব তারা যদি ঈমান আনে, তোমাদের ঈমান আনার মতো, তবে তারা সুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারাই হঠকারিতায় রয়েছে। সুতরাং এখন তাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। [সুরা বাকারা : ১৩৭]

১০. অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ○ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

এ সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে সাহায্য করে। তারাই সত্যবাদী। আর এ সম্পদ তাদের জন্যও, যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে। তারা মুহাজিরদেরকে ভালোবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। [সুরা হাশর : ৮-৯]

১১. অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ওই সকল মুসলমানের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন (যারা আপনার সফরসঙ্গী), যখন তারা আপনার সাথে গাছের নিচে অঙ্গীকার করছিল এবং তাদের অন্তরে যা-কিছু (ইখলাস ও মজবুতি) ছিল তাও আল্লাহ তাআলার জানা ছিল, আর আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে একটি নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন। (এর দ্বারা খাইবারের বিজয়কে বোঝানো হয়েছে, যা একেবারে নিকটবর্তী সময়ে হয়েছে) আর প্রচুর গনিমতও দান করলেন। [সুরা ফাতহ : ১৮]

১২. আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন—

﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا أَحَقَّ بِهَا ﴾

(আল্লাহ তাআলা) তাদের (অর্থাৎ সাহাবিদের) জন্য কালিমায়ে তাকওয়া তথা সংযমের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিলেন। বস্তুত তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। [সুরা ফাতহ : ২৬]

১৩. পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ ۚ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ﴾

যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারাই সফলকাম। [সুরা তাওবা : ২০]

১৪. আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ﴾

তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। [সুরা তাওবা : ২১]

১৫. আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন—

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُوْنَ﴾

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে।...[সুরা আলে ইমরান : ১১০]

'তাফসিরে তাবারি'-তে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হজরত উমর রা.-এর একটি উক্তি তুলে ধরা হয়েছে—

قال عمر بن الخطاب :لو شاء الله لقال : أنتم، فكنا كلنا، ولكن قال : كنتم

في خاصة من أصحاب رسول الله ﷺ، ومن صنع مثل صنيعهم، ..

যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করতেন তাহলে 'কুনতুম' না বলে 'আনতুম খাইরা উম্মাতিন' বলতে পারতেন এবং সে ক্ষেত্রে আমরা সকলেই এ আয়াতের আওতায় চলে আসতাম। কিন্তু! আল্লাহ পাক এখানে সাহাবিদের মধ্যে বিশেষ জামাতকে সম্বোধন করেছেন।[২২২]

'তাফসিরে ইবনে কাসির'-এ হজরত ইবনে আব্বাস রা.-এর এই রিওয়ায়াতটি বর্ণিত আছে—

كنتم خير أمة أخرجت للناس قال هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى مدينة

'খায়রে উম্মত' দ্বারা ওই সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম উদ্দেশ্য যারা মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তারা সাহাবায়ে কেরাম।[২২৩]

১৬. আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন—

﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾

এমনইভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থি সম্প্রদায় বানিয়েছি। যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য এবং যাতে রাসুল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য। [সুরা বাকারা : ১৪৩]

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা নসফি রহ. وسطا—'ওসাতান'-এর অর্থ করেছেন خيارا—'পছন্দনীয়' এবং 'উদুল' বা ন্যায়নিষ্ঠ। অর্থাৎ, 'আমি তোমাদেরকে উম্মতের জন্য পছন্দনীয় এবং ন্যায়নিষ্ঠ বানিয়েছি।'[২২৪]

---

[২২২]. *তাফসিরে তাবারি*, ৪/৬৩।

[২২৩]. *তাফসিরে ইবনে কাসির*, ১/৫০৯।

[২২৪]. তাফসিরে মাদারিক, ১/৬৪; তাফসিরে ইবনে কাসির, ১/৫১০, ২৫০, ২৫১।

১৭. পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি রাজি হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি রাজি হয়েছেন। আর আল্লাহ পাক তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হলো মহান সফলতা। [সুরা তাওবা : ১০০]

১৮.আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়েছে এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তারা হলো সত্যিকার মুসলমান। তাদের জন্য রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি। [সুরা আনফাল : ৭৪]

১৯. উক্ত সুরায় আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ﴾

আর যারা (নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের) পরবর্তীকালে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, এবং তোমাদের সাথে একত্রে জিহাদ করেছে, বস্তুত তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। [সুরা আনফাল : ৭৫]

* * *

আসার ও হাদিসের আলোকে সাহাবিদের মর্যাদা ও সমালোচনার নিষেধাজ্ঞা

আরবি অভিধানে ‘سب’ সাব্বুন কেবলই গালিকে বলে না, বরং গালির দিকে ধাবমান নিন্দাবাদকেও বলে।[২২৫]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, যে কথা সমাজে খারাপ ও দোষ এবং ত্রুটি হিসেবে বলা হয় তাই ‘سب’ সাব্বুন।[২২৬]

ইবনু মানযুর বলেন—

السب في اللغة هو الشتم.

আভিধানিক অর্থে ‘আস-সাব্বু’ গালি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২২৭]

এ ছাড়াও এটি অবজ্ঞা, হেয়প্রতিপন্ন করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমনটি ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. উল্লেখ করেছেন।[২২৮]

فالسب إهانةٌ واستخفاف، والانقياد للأمر إكرامٌ وإعزاز، ومحال أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم، أو يستخف به، فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة، امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام، فلا يكون فيه إيمان، وهذا هو بعينه كفر إبليس، فإنه سمع أمر الله له فلم يكذب رسولا، ولكن لم ينقد للأمر، ولم يخضع له، واستكبر عن الطاعة فصار كافرًا.

এই সাব্বুন শব্দটি সাহাবিদের মর্যাদায় বর্ণিত বিভিন্ন হাদিসে এসেছে। অর্থাৎ সাহাবিগণকে গালি দেওয়া তো দূরের কথা মন্দ বলাও জায়েজ নেই।

হাদিসে পরিষ্কার শব্দে সাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলতে, তাদের সমালোচনা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

---

২২৫. মুজামুল ফারকুল লুগাবিয়্যাহ, নম্বর ১১৭৪।
২২৬. আস-সারেমুল মাসলুল, পৃ. ৫৩৪।
২২৭. লিসানুল আরব, ৬/১২৭।
২২৮. আস-সারেমুল মাসলুল, ৩/৯৬৭।

১.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ، ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلاَ نَصِيفَهُ.

হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমার সাহাবিকে সাব্ব তথা মন্দ বলো না। যদি তোমাদের কেউ এক উহুদ পরিমাণ স্বর্ণও দান করে, তবু তাদের এক মুদ বা তার অর্ধেকের সমপরিমাণও হবে না।[২২৯]

২.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» :مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

হজরত আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার সাহাবিকে মন্দ বলবে, তার ওপর আল্লাহর, ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ।[২৩০]

৩.

عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ :مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ.

হজরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে আমার সাহাবিকে মন্দ বলে, তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ।[২৩১]

---

২২৯. *সহিহ বুখারি*, ৩৬৭৩।

২৩০. *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস ১২৭০৯, *ফাযায়েলে সাহাবি*, আহমাদ বিন হাম্বল, হাদিস ৮; *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, ১০/২৪, হাদিসটির সনদ দুর্বল, কেননা এতে আবদুল্লাহ ইবনু খিরাশ দুর্বল। তবে তা জইফ হলেও এর শাহের থাকায় এটি হাসান পর্যায়ের হাদিস বলা যায়। যেমনটি একে জারুল্লাহ আস-সদি তার 'আন নাওয়াফিহুল ইতরাহ', পৃ. ৩৮৩-তে হাসান সাব্যস্ত করেছেন।

২৩১. *মুসনাদুল বাজ্জার*, হাদিস ৫৭৫৩; *আল-মুজামুল আওসাত*, হাদিস ৪৭৭১, সনদ হাসান।

৪.

من سب نبيًّا فاقتلوه ومن سب أصحابي فاضربوه

হজরত আলি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

> যে ব্যক্তি কোনো নবিকে মন্দ বলে, তাকে হত্যা করো। আর যে আমার সাহাবিদের মন্দ বলে তাকে প্রহার করো।[২৩২]

৫.

لا تسبوا أحدًا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه.

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন—

> আমার কোনো সাহাবিকে মন্দ বলো না, তাদের কাউকে গালি দিয়ো না। কেননা তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও দান করে তবুও তাদের এক বা অর্ধ মুদ দান করার যে সওয়াব তার সামনেও পৌঁছাতে পারবে না।[২৩৩]

৬. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم

> যখন তোমরা দেখবে আমার সাহাবিদের কেউ গালি দিচ্ছে তাহলে (তাৎক্ষণিক তাকে) বলো তোমাদের অনিষ্টের ওপর আল্লাহর লানত।[২৩৪]

৭. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

اطَّلع الله على أهل بدر، فقال :اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

---

[২৩২]. *জামেউল আহাদিস*, হাদিস ২২৩৬৬, *জামউল জাওয়ামে*, হাদিস ৫০৯৭; *মুসনাদে দাইলামি*, ৩/৫৪১, হাদিস ৫৬৮৮, *আস-সারেমুল মাসলুল*, পৃ. ৯২, হাদিসটির সনদ দুর্বল। তবে এর হুকুম ও মতন সহিহ।

[২৩৩]. *সহিহ মুসলিম*, ২৫৪১

[২৩৪]. *জামে তিরমিজি*, ৩৮৬৬, হাদিসের সনদ দুর্বল।

আল্লাহ তাআলা বদরের যোদ্ধাদের দিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করে বললেন, তোমরা যা ইচ্ছা করো, তোমাদের সকল গুণাহ ক্ষমা করে দেওয়া হলো।[২৩৫]

৮. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

لاَ تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِي أَوْ رَأَى مَنْ رَآنِي

হজরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, জাহান্নামের আগুন সে মুসলমানকে স্পর্শ করতে পারে না, যে আমাকে দেখেছে (অর্থাৎ আমার সাহাবিরা) কিংবা আমাকে যারা দেখেছে তাদেরকে দেখেছে (অর্থাৎ তাবেয়িরা)।[২৩৬]

৯. হাদিস শরিফে আরও ইরশাদ হয়েছে—

اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي لاَ تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ

আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার সাহাবিদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আমার পরে তাদেরকে তোমরা তোমাদের সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানাবে না। যারা (আমার) সাহাবিকে ভালোবাসল, তারা আমার ভালোবাসায় তাদেরকে ভালোবাসল এবং যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, তারা আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল। যে আমার সাহাবিদেরকে কষ্ট দিলো সে যেন আমাকে কষ্ট দিলো; যে আমাকে কষ্ট দিলো সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দিলো; যে আল্লাহকে কষ্ট দিলো অচিরেই আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন।[২৩৭]

---

[২৩৫]. *সহিহ বুখারি*, ৪৮৯০; *সহিহ মুসলিম*, ২৪৯৪।

[২৩৬]. *জামে তিরমিজি*, ২/২২৫, হাদিস ৩৮০১, সনদ জইফ। তবে ইমাম তিরমিজি রহ. একে হাসান গরিব বলেছেন।

[২৩৭]. *জামে তিরমিজি*, ৩৭৯৭, ৪২৩৬; *মুসনাদে আহমাদ*, ১৯৬৪, ১৯৪১, ১৯৬৬৯; *সহিহ ইবনে হিব্বান*, ২২৮৪, ৭২৫৬; *ফাতহুর রব্বানি*, সাআতি, ২২/১৬৯; *আস-সুন্নাহ*, ইবনু আসেম, হাদিস

১০. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন—

إذا ذُكرَ أصحابِي فأمسِكوا

যখন আমার সাহাবিদের আলোচনা হয় তখন তোমরা তোমাদের জিহ্বার ওপর লাগাম দিয়ো।[২৩৮]

১১. হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম তারা যারা আমার যুগে রয়েছে। অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের উম্মত (তথা তাবেয়িগণের যুগ), অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের উম্মত (অর্থাৎ, তাবে তাবেয়িগণের যুগ)।[২৩৯]

১২. হজরত উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

اكرموا أصحابى فإنهم خياركم

তোমরা আমার সাহাবিগণকে সম্মান করো। কেননা তারা তোমাদের মধ্যকার উত্তম মানব।[২৪০]

১৩. হজরত আবু বুরদাহ রা. হতে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

النجومُ أمنَةٌ للسماءِ، فإذا ذَهَبَتِ النجومُ أَتَى السماءَ ما توعَدُ ، وأنا أمنَةٌ لأصحابِي ، فإذا ذهبْتُ أَتى أصحابِي ما يوعدونَ ، وأصحابي أمنَةٌ لأمَّتِي ، فإذا ذهبَتْ أصحابِي أَتى أمتي ما يوعدونَ

৯৯২; আল-ইসাবাহ, ১/২০, ইমাম তিরমিজি হাদিসটি হাসান বলেছেন, তবে কেউ কেউ এর সনদকে জইফ বলেছেন।

২৩৮. *মুজামুল কাবির*, তাবারানি, ২/৯৬; *জামেউস সগির*, ৬১৩, সনদ হাসান।

২৩৯. *সহিহ বুখারি*, ৬৪২৯; *সহিহ মুসলিম*, ২৫৩৩।

২৪০. *মুসান্নাফে ইবনু আবদির রাযযাক*, ১২/৩৪১, হাদিস ২০৭১০; *মুসনাদে আহমাদ*, ১/১১২; *সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি, হাদিস ৯২২২, হাদিসটির সনদ সহিহ। *তাখরিজু আহাদিসিল মাসাবিহ*, মুনাবি, ৫/২৫৮।

নক্ষত্রসমূহ আসমানের জন্য আমানতস্বরূপ। যখন নক্ষত্রগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তখন আসমানকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেয়ামত চলে আসবে। এবং আমি আমার সাহাবিদের জন্য আমানতস্বরূপ। অতএব যখন আমি ইহকাল ত্যাগ করব তখন তাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের (সাহাবিদের) মধ্যে ইজতিহাদি মতানৈক্য দেখা দেবে। এবং আমার সাহাবিরা উম্মতের জন্য আমানতস্বরূপ। অতএব যখন তাদের যুগের অবসান ঘটবে তখন আমার উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ফিতনা-ফাসাদের সূত্রপাত ঘটবে।[২৪১]

১৪. রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত উম্মতকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলে গিয়েছেন—

ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة كلهم فى النار إلا واحدة : قالوا من هى يا رسول الله !قال :ما أ نا عليه وأصحابى

অতিশীঘ্রই আমার উম্মত তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। তন্মধ্যে মাত্র একটি দলই মুক্তিপ্রাপ্ত এবং জান্নাতি হবে। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, সেই মুক্তিপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান দলটি কারা এবং এত বড় সৌভাগ্য লাভের ভিত্তি কোন নীতি বা আদর্শ? উত্তরে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে নীতি, তরিকা ও আদর্শের ওপর আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম আছে।[২৪২]

১৫. হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

حُبُّ الأنصارِ آيةُ الإيمانِ ، و بُغضُ الأنصارِ آيةُ المنافقِ

ঈমানের নিদর্শন হলো, আনসারি সাহাবিদের মহব্বত। এবং মুনাফেকির নিদর্শন হলো, আনসারিদের প্রতি বিদ্বেষপোষণ।[২৪৩]

---

[২৪১]. সহিহ মুসলিম, ২৫৩১।

[২৪২]. জামে তিরমিজি, ২৬৪০; সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪৭৯; মুসনাদে আহমাদ, ৪/১০২; আল-মুসতাদরাক, হাকেম, ১/১২৮, সনদ সহিহ।

[২৪৩]. সহিহ বুখারি, ৩৭৮৪; সহিহ মুসলিম, ৭৪; সুনানে নাসায়ি, ৫০১৯; সুনানে কুবরা, নাসায়ি, ১১৭৫৯।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের ইমামদের দৃষ্টিতে সাহাবিদের ব্যাপারে আমাদের আকিদা কী হবে এবং তাদের সমালোচকদের বিধান কী, এবার তা দেখা যাক

১) ইমাম নববি রহ. বলেন—

وكلهم عدول رضي الله عنهم، ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحداً منهم عن العدالة.... ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم، وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين

তারা প্রত্যেকেই ন্যায়নিষ্ঠ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম), তাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ, অন্যান্য বিবাদ (আমাদের নিকট) ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। এই কারণে তাদের কেউই আদালাত তথা ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া থেকে বিচ্যুত হননি।... এজন্য আহলুল হক আলেমগণ এবং যাদেরকে ইজমা করার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় তারা সাহাবিদের সকলের সাক্ষ্য, বর্ণনা কবুল হওয়ার ও পূর্ণ আদালাত তথা ন্যায়নিষ্ঠতার ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।[২৪৪]

২) ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. বলেন—

للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه، لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة.

-إلى أن قال – ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إحساناً للظن بهم، نظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر وكأن الله سبحانه أتاح الإجماع على ذلك، لكونهم نقلة الشريعة والله أعلم

---

[২৪৪]. *শারহু সহিহ মুসলিম*, ১৫/১৪৯।

সকল সাহাবির (রিওয়ায়াতের) ব্যাপারে একটা বিশেষত্ব রয়েছে, আর তা হলো, আদালাত ও ন্যায়নিষ্ঠতা যাচাইয়ের জন্য তাদের ব্যাপারে কারও কাছে (অন্যান্য রাবিদের মতো ইলমে জরাহ ওয়া তাদিল শাস্ত্রে পারদর্শী কারও কাছে) জিজ্ঞেস করা যাবে না। কেননা তারা প্রত্যেকেই কুরআন, সুন্নাহর নস ও ইজমার ক্ষেত্রে যাদেরকে বিবেচনা করা যায় তাদের সকলের ঐকমত্যে ন্যায়নিষ্ঠ।[২৪৫]

৩) ইমাম ইবনু কাসির রহ. বলেন—

والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل، والجزاء الجميل

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের মতে সাহাবিরা প্রত্যেকেই ন্যায়নিষ্ঠ তথা হকপন্থি। কেননা আল্লাহ তার সম্মানিত কিতাবে ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ তথা হাদিসে তাদের সকলের চরিত্র ও কাজকর্মের প্রসংশা করেছেন। এবং তারা রাসুলের খাতিরে তাদের যে মাল ও জান ব্যয় করেছেন আল্লাহর নিকট থেকে ভরপুর সওয়াব ও উত্তম পুরস্কার হাসিলের তীব্র ইচ্ছায় তারও প্রশংসা করেছেন।[২৪৬]

৪) ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. সুরা হুজুরাতের ১২ নম্বর আয়াত 'তোমরা একে অন্যের গিবত করো না'-এর ব্যাখ্যায় বলেন—

وأدنى أحوال الساب لهم أن يكون مغتاباً.

তাদের শানে গালি বা সমালোচনার শ্রেণিতে পড়ে এমন সর্বনিম্ন কাজটি ব্যক্তির জন্য গিবতকারী হিসেবে বিবেচিত হবে।[২৪৭]

---

২৪৫. *মুকাদ্দামাতু ইবনিস সলাহ*, পৃ. ৪২৭, ৪২৮।

২৪৬. ইখতিসারু উলুমিল হাদিস (আল্লামা আহমাদ শাকেরের টীকাসমৃদ্ধ 'আল-বায়েসুল হাসিস'), পৃ. ২০৫।

২৪৭. *আস-সারেমুল মাসলুল*, পৃ. ৫৭১।

৫) ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. সুরা আলে ইমরানের ১১৯ নম্বর আয়াত 'তাদের ক্ষমা করো (অর্থাৎ প্রতি সদয় হও) এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন—

ومحبة الشيء كراهته لضده، فيكون الله يكره السب لهم الذي هو ضد الاستغفار، والبغض لهم الذي هو ضد الطهارة

কোনোকিছুর মুহাব্বত থাকার অর্থ হচ্ছে তার বিপরীত বিষয়কে অপছন্দ করা। সুতরাং যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলছেন, তাই তার বিপরীতে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের জন্য দোষারোপ ও সমালোচনা করাকে অপছন্দ করেছেন। আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ হচ্ছে তাদের পবিত্রতা ও নির্মলতার বিপরীত। (যেহেতু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করতে বলেছেন)।[২৪৮]

৬) ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. আরও বলেন—

যে ব্যক্তি এই ভেবে এতটা সীমালঙ্ঘন করে ফেলে যে, সাহাবিদের ১০/১১ জন কতিপয় সাহাবি বাদে সকলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছেন, অথবা তারা সকলে ফাসেক হয়ে গিয়েছেন, তবে এমন ব্যক্তির কুফরের ব্যাপারে কারোই সন্দেহ নেই। কেননা সে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তাদের ব্যাপারে যে সন্তুষ্টি, প্রশংসা এসেছে তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। বরং এই ব্যক্তির কুফরের ব্যাপারে যাদের সন্দেহ থাকবে তার কুফরও সুস্পষ্ট।

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب في كفره؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع :من الرضى والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين.

---

২৪৮. *আস-সারেমুল মাসলুল*, পৃ. ৫৭১।

যে ব্যক্তি সাহাবিদের গালি দেওয়া কিংবা সমালোচনা করাকে জায়েজ মনে করবে তার ঈমান চলে যাবে।[২৪৯]

৭) ইমাম সুবকি রহ. বলেন—

إن سب الجميع لا شك أنه كفر ...وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول الطحاوي :وبغضهم كفر، فإن بغض الصحابة بجملتهم لا شك أنه كفر

নিশ্চয়ই সকল সাহাবির সমালোচনা ও তাদের গালি দেওয়া নিঃসন্দেহে কুফর। এ ক্ষেত্রে ইমাম তহাবি রহ.-এর বক্তব্য সমুচিত। তিনি বলেন, তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা কুফর। নিশ্চয়ই সকল সাহাবির প্রতি বিদ্বেষ রাখা নিঃসন্দেহে কুফর।[২৫০]

৮) ইমাম মালেক রহ. বলেন—

من شتم أحداً من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالاً شديداً

যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো একজন সাহাবির বিরুদ্ধে বলবে হোক আবু বকর, উমর, উসমান, মুয়াবিয়া অথবা আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম), সে যদি তাদের ব্যাপারে বলে, তারা পথভ্রষ্ট ও কাফের ছিল তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। আর যে তাদের এই অপবাদ না দিয়ে কেবল অন্যান্য মানুষের মতো সমালোচনা বা নিন্দা করবে তাকে বন্দী করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হবে।[২৫১]

৯) ইমাম মালেক রহ. আরও বলেন—

الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم اسم أو قال : نصيب في الإسلام.

---

[২৪৯]. *আস-সারেমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসুল*, পৃ. ৫৮৬-৫৮৭, এই কিতাবের সর্বশেষ পরিচ্ছেদ।

[২৫০]. *ফাতাওয়া আস-সুবকি*, ২/৫৭৫।

[২৫১]. *আশ-শিফা*, ২/১১০৭-১১০৮।

যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের গালি দেয় (বা নিন্দা করে) ইসলামের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। অথবা বলেছেন, তাদের নসিবে ইসলাম নেই।[২৫২]

১০) ইমাম কাজি ইয়াজ রহ. বলেন—

وسب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل، وقال بعض المالكية يقتل. انتهى.

কোনো একজন সাহাবির সমালোচনা করা কবিরা গুনাহ। আমাদের (মালেকি) মাজহাবের জমহুর আলেমদের মত হচ্ছে, এই প্রকৃতির মানুষকে শাস্তি দেওয়া হবে তবে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না। তবে কিছু মালেকির মতে তাকে হত্যা করা হবে।[২৫৩]

১১) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন—

إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام

যদি কাউকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো সাহাবির সমালোচনা করতে দেখো, তবে তার ইসলামের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করো।[২৫৪]

১২) ইমাম খল্লাল রহ. ইমাম আবু বকর মারওয়াযির সূত্রে বর্ণনা করেন—

سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة؟

আমি আবু আবদিল্লাহ (তথা ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ)-কে ওই সকল লোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম যারা আবু বকর, উমর ও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমকে গালি দেয়, তাদের কী হুকুম?

উত্তরে ইমাম সাহেব রহ. বললেন—

ما أراه على الإسلام

আমি তাদের মুসলিমই মনে করি না।

---

[২৫২]. *আস-সুন্নাহ*, ২/৫৫৭, আবু বকর আল-খল্লাল নিজ সনদে এটি বর্ণনা করেন।
[২৫৩]. *শরহুল মুসলিম*, নববি, ১৬/৩২৬; *তুহফাতুল আহওয়াযি*, ১০/২৪৯।
[২৫৪]. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/১৪২।

وسئل عمن يشتم عثمان، فقال رحمه الله :هذه زندقة.

এরপর তাকে উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে গালিদাতা ও নিন্দাকারীর কথা জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ তার ওপর রহম করুন। আর ওরা তো যিন্দিক।[২৫৫]

১৩) আবদুল মালেক ইবনু আবদিল হুমাইদ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. থেকে বর্ণনা করেন—

من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض ، ثم قال : من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين.

যারা সাহাবিদের গালি দেয় ও নিন্দা করে তাদের ব্যাপারে আমি রাফেযিদের মতো কুফরির আশঙ্কা করছি। তারপর তিনি বলেন, যারা আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের নিন্দা করে তারা দ্বীনের গণ্ডি থেকে বের হয়ে গিয়েছে।[২৫৬]

১৪) ইমাম ইউসুফ আল-ফিরইয়াবি রহ.-কে হজরত আবু বকরের নিন্দাকারীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সে কাফের। তাকে বলা হলো, তার জানাজা পড়া যাবে? তিনি বললেন, না। লোকটি জিজ্ঞেস করল, ওই ব্যক্তির দাফনকার্য কীভাবে সম্পন্ন করা হবে অথচ সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্বীকার করে? তিনি বললেন, তার লাশ তোমাদের হাত দিয়ে স্পর্শ করো না, একটি কাঠের টুকরো দিয়ে তাকে খোঁচা মারো যাতে সে তার জন্য খোঁড়া গর্তে পড়ে যায়।[২৫৭]

وقال محمد بن يوسف الفريابي وسئل عمن شتم أبا بكر، فقال : كافر، قيل :فيصلى عليه؟ قال :لا، وسأله :كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال :لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته.

---

২৫৫. *আস-সুন্নাহ*, খল্লাল, ৩/৪৯৩; *আল-মাসায়েলুল মারবিয়্যাহ আনিল ইমামি আহমাদ ফিল-আকিদাহ*, আহমাদি, ২/৩৫৮-৩৬৩।

২৫৬. *আস-সুন্নাহ*, খল্লাল, ২/৫৫৮।

২৫৭. *আস-সুন্নাহ*, খল্লাল, ৩/৪৯৯; *আশ-শারহু ওয়াল-ইবানাহ*, ইবনু বাত্তাহ, পৃ. ১৬০।

১৫) হানাফি মাজহাবের প্রখ্যাত ফতোয়ার কিতাব 'ফতোয়ায়ে বাযযাযিয়া'-তে আছে—

ومن أنكر خلافة أبي بكر فهو كافر في الصحيح، ومنكر خلافة عمر رضي الله عنه فهو كافر في الأصح، ويجب إكفار الخوارج بإكفار عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم.

وفي الخلاصة :الرافضي إذا كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو كافر

যে ব্যক্তি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিলাফতকে অস্বীকার করবে, সহিহ কথা হচ্ছে সে কাফের। অনুরূপভাবে যে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিলাফতকে অস্বীকার কবে, সর্বাধিক সহিহ মত হচ্ছে সেও কাফের। এবং ওই সকল খারেজিদের তাকফির করা ওয়াজিব যারা উসমান, আলি, তালহা, যুবাইর ও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমকে কাফের বলে।

খুলাসাতুল ফাতাওয়া কিতাবে আছে, যে শাইখাইনকে (আবু বকর ও উমর রা.) গালি দেয় কিংবা লানত করে সে কাফের।[২৫৮]

১৬) ইমাম খারাশি রহ. বলেন—

إن رمى عائشة بما برأها الله منه بأن قال زنت، أو أنكر صحبة أبي بكر أو إسلام العشرة أو إسلام جميع الصحابة، أو كفر الأربعة، أو واحداً منهم كفر

যদি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে আল্লাহ যে অপবাদ থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছে তার অপবাদ দিয়ে বলা হয় যে, তিনি জিনা করেছেন (নাউজুবিল্লাহ), আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাহাবিয়াতকে অস্বীকার করে, আশারায়ে মুবাশশারার দশ সাহাবির অথবা সকল সাহাবির মুসলমান হওয়াকে অস্বীকার করে, বা চার খলিফাকে কিংবা তাদের কোনো একজনকে তাকফির করে সে কাফের হয়ে যায়।[২৫৯]

---

[২৫৮]. *ফাতাওয়া আল-বাযযাযিয়াহ* ('ফাতাওয়া হিন্দিয়াহ'র হামেশসহ) ৬/৩১৮; *বাহরুর রায়েক*, ৫/১৩১।

[২৫৯]. *শারহুল খিরাশি আলা মুখতাসারি খলিল*, ৭/৭৪; *হাশিয়াতু আলা শারহিল খিরাশি*, আদাউই, ৭/৭৪।

১৭) ইমাম কাজি ইয়াজ রহ. বলেন—

قد اختلف العلماء في هذا، فمشهور مذهب مالك في ذلك الاجتهاد والأدب الموجع، قال مالك رحمه الله - : من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن شتم أصحابه أدب.

وقال ابن حبيب :من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أُدِّبَ أدباً شديداً، ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه، ويطال سجنه حتى يموت، ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال سحنون - :من كفر أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : علياً أو عثمان أو غيرهما، يوجع ضرباً

সাহাবিদের নিন্দাকারীর বিধান কী হবে তা নিয়ে আলেমদের মাঝে ইখতিলাফ আছে। এ ব্যাপারে ইমাম মালেক রহ.-এর মাজহাবের প্রসিদ্ধ বিধান হচ্ছে, তাকে কঠোর পরিশ্রম ও মর্মান্তিক শাস্তি প্রদান করা হবে। ইমাম মালেক রহ. বলেন, যে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেবে বা তাঁর নিন্দা করবে তাকে ইসলামি বিধান মুতাবেক হত্যা করা হবে এবং যে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো এক সাহাবির নিন্দা করে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে।... ইমাম সাহনুন রহ. বলেন, যে ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবি আলি বা উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা অথবা অন্য কোনো সাহাবিকে কাফের বলবে তাকে বেদনাদায়ক প্রহার করতে হবে।[২৬০]

১৮) ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন—

وأما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل، أو الجبن، أو قلة العلم، أو عدم الزهد، ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك

---

[২৬০]. *আশ-শিফা*, ২/১১০৮; *শারহুস সগির*, দারদিরি, ৬/১৬০; *শারহুল খিরাশি*, ৭/৭৪; *ফাতহুল আলিয়িল মালেক ফিল-ফাতওয়া আলা মাজহাবি ইমাম মালিক*, উলাইশ আল-মালেকি, ২/২৮৬; *বুলগাতুস সালেক লি আকরাবিল মাসালেক*, ২/৪২০।

কেউ যদি তাদের নিন্দায় এমন উক্তি ব্যবহার করে যা তাদের আদালাত তথা ন্যায়নিষ্ঠতা ও দ্বীনের ক্ষেত্রে অসমীচীন নয় যেমন, তাদের কাউকে কৃপণতার, কাপুরুষতার, কম জ্ঞানের ও যুহদ তথা দুনিয়াবিমুখতা ও বুজুর্গিহীনতার বিশেষণে বিশেষায়িত করা ইত্যাদি। এই উক্তি বলার কারণে সে শাসককর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি ও সাজা পাওয়ার উপযুক্ত হবে। কেবল এসব বলার কারণে আমরা তার ওপর তাকফিরের হুকুম লাগাব না।[২৬১]

১৯) ইমাম বিশর ইবনুল হারেস রহ. বলেন—

من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين

যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের নিয়ে কটূক্তি করল সে কাফের, যদিও সে সিয়াম রাখে, সালাত আদায় করে ও তাকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়।[২৬২]

২০) ইমাম মালেক রহ. আরও বলেন—

من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل، قيل له :لم؟ قال - :من رماها فقد خالف القرآن

যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে গালি দেবে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে, আর যে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে গালি (তথা অপবাদ) দেবে তাকে হত্যা করা হবে। বলা হলো, এমনটি কেন? তিনি বললেন, তাকে যে জিনার অপবাদ দেয় সে কুরআনের বিরোধিতা করল।[২৬৩]

২১) ইমাম ইবনু হাযাম রহ. ইমাম মালেকের শেষোক্ত বক্তব্যের সমর্থন জানিয়ে বলেন—

قول مالك هاهنا صحيح، وهي ردة تامة، وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها

---

[২৬১]. *আস-সারেমুল মাসলুল*, পৃ. ৫৮৬।
[২৬২]. *আশ-শারহু ওয়াল-ইবানাহ*, পৃ. ১৬২।
[২৬৩]. *আশ-শিফা*, ২/১১০৯।

এখানে মালেকের বক্তব্য সহিহ, আর এটি সার্বিকভাবে রিদ্দাহ (মুরতাদ হয়ে যাওয়া) এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার শানে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই অপবাদমুক্তির অকাট্য দলিলকে অস্বীকার করার নামান্তর।[২৬৪]

২২) ইমাম ইবনু হাযাম রহ. আরও বলেন—

واحتج بعض من يُكفِّر مَن سبَّ الصحابة رضي الله عنهم بقول الله عز و جل :محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله ليغيظ بهم الكفار.

قال فكل من أغاظه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو كافر.

قال أبو محمد ابن حزم :وقد أخطأ من حمل الآية على هذا، لأن الله عز و جل لم يقل قط أن كل من غاظه واحد منهم فهو كافر، وإنما أخبر تعالى أنه يغيظ بهم الكفار فقط، ونعم هذا حق لا ينكره مسلم، وكل مسلم فهو يغيظ الكفار.

وأيضا فإنه لا يشك أحد ذو حس سليم في أن عليا قد غاظ معاوية وأن معاوية وعمرو بن العاص غاظا عليا وأن عمار أغاظ أبا العادية وكلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد غاظ بعضهم بعضا فيلزم على هذا تكفير من ذكرنا وحاشى لله من هذا

অনেকে সুরা ফাতহের ২৯ নম্বর আয়াত (তওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইনজিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের ওপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, তা চাষিকে আনন্দে অভিভূত করে, যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন।) দ্বারা যারা সাহাবিদের গালাগালি করে তাদের তাকফির করেছেন! তারা বলেন,

---

[২৬৪]. *আল-মুহাল্লা*, ১৩/৫০৪।

প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যে সাহাবিদের ব্যাপারে বিদ্বেষ পোষণ করে সে কাফের।[২৬৫]

২৩) ইমাম ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহও সুরা ফাতহের ২৯ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন—

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله عليه- في رواية عنه -بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم

এই আয়াত দ্বারা ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ সাহাবিবিদ্বেষী শিয়া রাফেজিদের কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২৬৬]

২৪) ইমাম কুরতুবি রহ. ইমাম মালেক রহ. থেকে সরাসরি সূত্রে এই বর্ণনাটি বর্ণনা করে বলেন—

روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير :كنا عند مالك بن أنس، فذكروا رجلاً ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ حتى بلغ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، فقال مالك :من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية – ثم قال :-لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين، ثم ذكر طائفة من الآيات القرآنية التي تضمنت الثناء عليهم والشهادة لهم بالصدق والفلاح، ثم قال عقبها" :وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآل أمرهم

...ইমাম মালেক মূলত এই আয়াতের ব্যাখ্যায় যে উক্তি করেছেন তা সঠিক ও যথোপযুক্ত। সুতরাং যেকোনো একজন সাহাবির (দ্বীনের ক্ষেত্রে) ক্রটিবিচ্যুতি ধরবে অথবা তাদের বর্ণিত বর্ণনার (অর্থাৎ হাদিসের) ওপর অভিযোগ করবে সে যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের

---

২৬৫. *আল-ফাসলু ফিল-মিলালি ওয়াল-আহওয়াই ওয়ান-নাহল*, ৩/১৪০।
২৬৬. *তাফসিরে ইবনে কাসির*, ৭/৩৩৮।

আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করল এবং মুসলমানদের শরিয়তকে বাতিল করল।...[২৬৭]

২৫) ইমাম আবুল মাআলি আল-আলুসি রহ. বলেন—

ولما ذكر أبو المعالي الألوسي هذه الآية مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ... قال: قال العلماء هذه الآية ناصة على أن الرافضة كفرة؛ لأنهم يكرهونهم، بل يكفرونهم والعياذ بالله تعالى

আলেমগণ বলেন, এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাফেজিরা কাফের। কেননা তারা সাহাবিদের অপছন্দ ও ঘৃণা করে বরং তারা তাদের তাকফির করে (আল-ইয়াযুবিল্লাহ)![২৬৮]

২৬) ইমাম খতিব আল-বাগদাদি রহ. তার সনদে ইমাম আবু যুরআহ রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে—

إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة.

যখন তুমি কাউকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো এক সাহাবির সমালোচনা করতে দেখবে মনে রাখবে সে একজন 'যিন্দিক'! কেননা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআন আমাদের নিকট সত্য। আর এই কুরআন ও নবিজির বিভিন্ন সুন্নত ও হাদিস আমাদের কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিরাই হক আদায় করে পৌঁছেছেন। ওরা মূলত চায় আমাদের সাক্ষ্যসমূহকে সমালোচিত করতে যাতে করে কুরআন ও

---

[২৬৭]. *তাফসিরে কুরতুবি*, ১৬/২৯৬-২৯৭; *শারহুস সুন্নাহ*, বাগাবি, ১/২২৯।

[২৬৮]. *আস-সুয়ুফুল মুশরিকাহ মুখতাসারু সওয়ায়িকুল মুহরিকাহ*, আলুসি, পৃ. ২৩৮।

সুন্নাহ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে বাতিলকরণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করা যায়। এজন্য তাদের 'যিন্দিক' হওয়ার জরাহটাই সর্বোত্তম।[২৬৯]

২৭) ইমাম লালকায়ি রহ. তার সনদে আহলে বাইতের অন্যতম সদস্য মুহাম্মাদ ইবনু যাইদ থেকে বর্ণনা করেন যে,

عن محمد بن زيد أنه قدم عليه من العراق رجل ينوح بين يديه فذكر عائشة بسوء، فقام إليه بعمود، وضرب به دماغه فقتله، فقيل له :هذا من شيعتنا وممن يتولانا، فقال :هذا سمى جدي قرنان استحق عليه القتل فقتلته

তার কাছে ইরাক থেকে একজন ব্যক্তি এসে চিৎকার-চেঁচামেচি করে আম্মাজান আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সম্পর্কে মন্দ কথা বলতে লাগল। অতঃপর তিনি কিছু লৌহদণ্ডসমেত তার নিকট এসে তার মাথায় প্রহার করে তাকে হত্যা করলেন। তাকে বলা হলো, আপনি এমন কেন করলেন, সে তো আমাদের শিয়া (সহযোগী যোদ্ধা) এবং তাদের মধ্যে অন্যতম যারা আমাদের সাথে (অর্থাৎ তৎকালীন আলি রা.-এর অনুসারী শিয়াদের সাথে) বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন? তিনি বললেন, কেননা সে আমার দাদা (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে 'করনান' (যে মন্দ ব্যক্তি তার স্ত্রীর বেহায়াপনা জানা সত্ত্বেও বে-গাইরত ও নির্লজ্জের মতো তাকে নিয়ে সংসার করে) আখ্যায়িত করেছে। (যেহেতু) সে মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত ছিল, তাই আমি তাকে হত্যা করেছি।[২৭০]

২৮) ইমাম সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা রহ. বলেন—

من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى

আল্লাহর রাসুলের সাহাবিদের বিরুদ্ধে কোনো কটূক্তি দ্বারা যার জবান দারাজি হয় সে প্রবৃত্তির অনুসারী।[২৭১]

---

২৬৯. *আল-কিফায়াহ ফি ইলমির রিওয়ায়াহ*, পৃ. ৬৪-৬৫।

২৭০. *লিসানুল আরাব*, ১৩/৩৩৮; *উসুলু ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ*, লালকায়ি, ৭/১২৭০।

২৭১. *শারহুস সুন্নাহ*, বারবাহারি, পৃ. ৪৪; *গুনিয়াতুত তলেবিন*, শাইখ জিলানি ১/৭৯।

২৯) ইমাম যাহাবি রহ. বলেন—

فمن طعن فيهم أو سبهم، فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين؛ لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم، وإضمار الحقد فيهم، وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم، وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليهم وبيان فضائلهم ومناقبهم وحبهم.

সুতরাং যে সাহাবিদের ওপর অভিযোগ করবে কিংবা গালি দেবে সে দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে এবং মুসলিম মিল্লাত থেকে ছিটকে পড়বে। কেননা তাদের ওপর অভিযোগ আনা তাদের প্রতি মন্দ আকিদা, সংকীর্ণতামূলক বিদ্বেষ পোষণ ও আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রশংসায়, ফজিলতে ও গুণ বর্ণনায় যা-কিছু উল্লেখ করেছেন তা অস্বীকার করার মনোভাব ব্যতীত হতে পারে না।[২৭২]

৩০) ইমাম সামআনি রহ. বলেন—

واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية ، لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم.

উম্মতের আলেমগণ ইমামিয়া (বর্তমানে ইসনা আশারিয়া নামে খ্যাত) শিয়াদের তাকফিরের ব্যাপারে ইজমা করেছেন। কেননা তারা সাহাবিদের (সামষ্টিকভাবে) পথভ্রষ্ট হওয়ার আকিদা রাখে, এবং তাদের ইজমাকে অস্বীকার করে, আর তাদের ব্যাপারে এমন বিষয় সম্পৃক্ত করে যা তাদের শানে শোভা পায় না।[২৭৩]

৩১) ইমাম ইবনে হুমাম রহ. বলেন—

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের আকিদা হলো, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম রা.-কে পূতপবিত্র মনে করা, তাদের ওপর আপত্তি উত্থাপন থেকে বেঁচে থাকা এবং তাদের প্রশংসা করা ওয়াজিব।[২৭৪]

---

২৭২. *কিতাবুল কাবায়ের*, যাহাবি, পৃ. ২৮৫।

২৭৩. *আল-আনসাব*, ৬/৩৪১।

২৭৪. *আল-মাসায়িরা*, পৃ. ১৩২।

সাহাবিদের মাঝে পরস্পরের বিবাদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর আকিদা কী হবে

সাহাবিদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদকে উম্মতের আলেমগণ মুশাজারাত তথা বাতাসের তীব্রতায় পাতায় পাতায় টক্কর লাগা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টিতে ন্যায় ভেবেই প্রত্যেকে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাদের কেউ তা দুনিয়ার উদ্দেশ্যে কিংবা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে করেননি, তবে তাদের সাথে যুদ্ধরত সাহাবি নয় এমন কতিপয় ব্যক্তিদের কথা ভিন্ন। আর তাদের এসব কর্মকাণ্ড নিজেদের ইজতিহাদি সিদ্ধান্ত থেকেই সংঘটিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ ইজহাদ করতে গিয়ে ভুল করেছেন আবার কেউ সঠিক ছিলেন। আর এ ক্ষেত্রে উভয় দলই সওয়াব পাবে বলে হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। সাহাবিগণ নবিদের মতো মাসুম (নিষ্পাপ) নন, তবে সমালোচনার ঊর্ধ্বে।

১) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> إذا حكَم الحاكمُ فاجتَهَد ثمَّ أصاب فله أجرانِ وإذا حكَم فاجتَهَد ثمَّ أخطأ فله أجرٌ.
>
> যখন কোনো বিশেষজ্ঞ হুকুম দেয়, আর তাতে সে ইজতিহাদ করে তারপর সেটা সঠিক হয়, তাহলে তার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব। আর যদি ইজতিহাদ করে ভুল করে তাহলে তার জন্য রয়েছে একটি সওয়াব।[২৭৫]

২) উলামায়ে কেরামের অনেকে আল্লাহ তাআলার এই আয়াতটিকে দলিল দিয়ে সাহাবিদের মাঝে পরস্পরের যে বিষয়গুলো ছিল তার ব্যাপারে চুপ থাকতে বলেন।

> ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
>
> তারা ছিল এমন এক জাতি, যারা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের, তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের। আর তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না। [সুরা বাকারা, ১৩৪]

---

২৭৫. *সহিহ বুখারি*, ৬৯১৯; *সহিহ মুসলিম*, ৪৫৮৪; *সুনানে আবু দাউদ*, ৩৫৭৬।

৩) ইমাম আহমাদ বিন হাজার আল-হাইতামি রহ. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের আকিদা এভাবে তুলে ধরেন—

> والواجب أيضا على كل من سمع شيئا من ذلك أن يثبت فيه ولا ينسبه إلى أحدهم بمجرد رؤيته في كتاب أو سماعه من شخص بل لا بد أن يبحث عنه حتى يصح عنده نسبته إلى أحدهم فحينئذ الواجب أن يلتمس لهم أحسن التأويلات.

(সাহাবিদের কোনো ভুল-ত্রুটি সমন্ধে) কোনো বর্ণনা কর্ণগোচর হলে কর্তব্য হচ্ছে, পূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার স্বরূপ উদঘাটন করা; শুধু কিছু কিতাবের পাতায় দেখে বা অন্য কারও কাছ থেকে শুনে কোনো সাহাবি সম্পর্কে অশোভন উক্তি না করা। এমনকি পূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ করে ঘটনার সত্যতা যদি প্রমাণিতও হয়, সে ক্ষেত্রে অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সেগুলোর সর্বাধিক সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ও তাবিল খুঁজে বের করা।[২৭৬]

৪) সাহাবিদের পরস্পরের এই যুদ্ধকে ইমাম নববি রহ. ওজর, ইজতিহাদি ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদের কেউ কেউ এই ইজতিহাদে সঠিক ছিলেন আবার কেউ ভুল। কিন্তু সকলের ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমনটি ইমাম নববি রহ. উল্লেখ করেছেন—[২৭৭]

> اعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ليست بداخلة في هذا الوعيد ـ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم :إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ـ ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم، والإمساك عما شجر بينهم، وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية، ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق، ومخالفه يأثم، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى الله، وكان بعضهم مصيباً وبعضهم مخطئاً معذوراً في الخطأ، لأنه اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه.

---

২৭৬. *আস-সওয়ায়েকুল মুহরিকাহ আলা আহলির রাফদি ওয়াদ-দলালি ওয়ায-যান্দাকাহ,* হাইতামি, পৃ. ১২৯।

২৭৭. *শারহু সহিহ মুসলিম,* ১১/১৮।

৫) ইমাম ইবনু হাযাম রহ.-ও একই কথা বলেন। এবং এ ক্ষেত্রে তিনি বলেন এই ইজতিহাদে যদিও আলি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সঠিক ছিলেন কিন্তু মুয়াবিয়া ও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ভুল হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদের কারণে একটি সওয়াব পাবেন এবং আলি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুইটি সওয়াব পাবেন। তবে এ ক্ষেত্রে কারোই গুনাহ হয়নি। তিনি বলেন—[২৭৮]

فلم يطلب معاوية من ذلك إلا ما كان له من الحق أن يطلبه، وأصاب في ذلك الأثر الذي ذكرنا، وإنما أخطأ في تقديمه ذلك على البيعة فقط، فله أجر الاجتهاد في ذلك، ولا إثم عليه فيما حرم من الإصابة كسائر المخطئين في اجتهادهم الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم أجرا واحدا، وللمصيب أجرين.

وقد علمنا أن من لزمه حق واجب وامتنع من أدائه وقاتل دونه، فإنه يجب على الإمام أن يقاتله وإن كان منا، وليس ذلك بمؤثر في عدالته وفضله، فبالمقابل هو مأجور لاجتهاده ونيته في طلب الخير، فبهذا قطعنا على صواب علي رضي الله عنه وصحة أمانته، وأنه صاحب الحق، وإن له أجرين :أجر الاجتهاد وأجر الإصابة.

وقطعنا أن معاوية رضي الله عنه ومن معه مخطئون مجتهدون مأجورون أجرا واحدا، وأيضا في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن مارقة تمرق بين طائفتين من أمته يقتلها أولى الطائفتين بالحق، فمرقت تلك المارقة وهم الخوارج من أصحاب علي وأصحاب معاوية، فقتلهم علي وأصحابه، فصح أنهم أولى الطائفتين بالحق، وأيضا الخبر الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية.

قال أبو محمد (المجتهد المخطئ إذا قاتل على ما يرى أنه الحق قاصدا إلى الله تعالى نيته غير عالم بأنه مخطئ فهو باغئه وإن كان مأجورا أو لا حد

২৭৮. *আল-ফাসলু ফিল-মিলালি ওয়ান-নিহাল*, ৪/১৫৯-১৬১; *তাফসিরে ইবনে কাসির*, ৪/৩০৬।

عليه إذا ترك القاتل ولا قود، وأما إذا قاتل وهو يدري أنه مخطئ فهذا المحارب تلزمه المحاربة والقود وهذا يفسق ويخرج لا المجتهد المخطئ، وبيان ذلك قول الله تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله {إلى قوله} إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم {فهذا نص قولنا دون تكلف تأويل ولا زوال عن موجب ظاهر الآية، وقد سماهم الله عز وجل مؤمنين باغين بعضهم أخوة بعض في حين تقاتلهم وأهل العدل المبغي عليهم والمأمورين بالإصلاح بينهم وبينهم ولم يصفهم عز وجل بفسق من أجل ذلك التقاتل ولا ينقص إيمان، وإنما هم مخطئون باغون ولا يريد واحد منهم قتل آخر.

৬) ইমাম মাযিরি আল-মালেকি রহ. মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আদালাত তথা ন্যায়নিষ্ঠতার ও বিশিষ্ট মর্যাদাবান সাহাবি হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এবং তার ও আলি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝে যে ঘটনা ঘটেছে তা তাবিল ও ইজতিহাদ করার অবকাশ দিয়েছেন।[২৭৯]

ومعاوية من عدول الصحابة، وأفاضلهم، وما وقع من الحروب بينه وبين علي، وما جرى بين الصحابة من الدماء، فعلى التأويل والاجتهاد، وكل يعتقد أن ما فعله صواب وسداد.

وقد يختلف مالك، وأبو حنيفة، والشافعي في مسائل من الدماء؛ حتى يوجب بعضهم إراقة دم رجل، ويحرمه الآخر، ولا يستنكر هذا عند المسلمين، ولا يستبشع؛ لما كان أصله الاجتهاد، وبه تعبد الله عز وجل العلماء، وكذلك ما جرى بين الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في هذه الدماء.

৭) একই কথা ইমাম কুরতুবি রহ.-ও উল্লেখ করেন এবং সাহাবিদের এই স্পর্শকাতর বিষয়ে নাড়াচাড়া করা থেকে বিরত থাকার কথা বলেন এবং

---

২৭৯. *ইকমালুল মুলিম বি ফাওয়ায়েদে মুসলিম*, ৭/ ৩৮১।

সাহাবিদের মর্যাদার দিকে লক্ষ রেখে উত্তম আঙ্গিকে তা উপস্থাপন করার কথা বলেন।[২৮০]

لا يجوز أن يُنسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه، وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم، وأخبر بالرضا عنهم .انتهى.

৮) ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ খাল্লাল রহিমাহুল্লাহ এটাও উল্লেখ করেছেন যে, যখন তার কাছে সিফফিন এবং জামালের যুদ্ধের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলো তখন তিনি জবাবে বলেন—

امر أخرج الله يدى منه لا أدخل لسانى فيه.

যেসব বিষয় থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার হাতকে (লেখার জন্য) দূরে রেখেছেন সেখানে ওইসব বিষয়ে আমি নিজের জবানকে (বলার জন্য) অনুপ্রবেশ করাব না।[২৮১]

৯) হজরত উমর ইবনু আবদুল আযিয রহ. হজরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর কথা শোনা পছন্দ করতেন না।

ইবরাহিম ইবনে মিসরাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি কখনো দেখিনি হজরত উমর কাউকে বেত দিয়ে প্রহার করেছেন, কিন্তু হ্যাঁ, এক ব্যক্তি হজরত মুয়াবিয়ার ব্যাপারে মন্দ কথা বললে তিনি তাকে বেত দিয়ে প্রহার করেন।[২৮২]

১০) খলিফায়ে রাশেদ হজরত উমর ইবনে আবদুল আযিয রহিমাহুল্লাহকে সিফফিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সাহাবিদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বলেন—

تلك دماء قد طهر الله منها يدى فلا أخضب بها لسانى.

তা সেই রক্ত যা (স্পর্শ করা) থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার হাতকে পাক রেখেছেন (অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি

---

২৮০. *আল-জামে লি আহকামিল কুরআন*, ১৬/ ৩২১-৩২২।
২৮১. *আস-সুন্নাহ, আবু বকর খাল্লাল*, পৃ. ৪৬২।
২৮২. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/১৩৯; *তবাকাতে ইবনে সাদ*, ৫/৩৮৪।

থেকে হাতকে বিরত রেখেছেন)। সুতরাং (সেই রক্ত দিয়ে) আমি আমার জবানকে রঞ্জিত (কলুষিত) করব না।[২৮৩]

১১) ইমাম কুরতুবি রহ.-ও তাদের মাঝে পরস্পরের যে বিরোধিতা ও যুদ্ধ হয়েছিল তাকে মুজতাহিদদের হাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এবং একে কেন্দ্র করে কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাকে গুনাহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[২৮৪]

وأما من أبغض والعياذ بالله أحداً منهم من غير تلك الجهة لأمر طارئ من حدث وقع لمخالفة غرض، أو لضرر ونحوه، لم يصر بذلك منافقاً ولا كافراً،فقد وقع بينهم حروب ومخالفات، ومع ذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، فإما أن يقال كلهم مصيب، أو المصيب واحد والمخطئ معذور، مع أنه مخاطب بما يراه ويظنه، فمن وقع له في أحد منهم والعياذ بالله لشيء من ذلك، فهو عاص يجب عليه التوبة، ومجاهدة نفسه بذكر سوابقهم، وفضائلهم، وما لهم على كل من بعدهم من الحقوق إذا لم يصل أحد من بعدهم لشيء من الدين والدنيا إلا بهم وبسببهم قال الله تعالى :وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ الآية اه

১২) ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রহ. লিখেছেন—

والظنّ بالصحابة في تلك الحروب أنهم كانوا فيها متأوّلين، وللمجتهد المخطئ أجر، وإذا ثبت هذا في حق آحاد الناس، فثبوته للصحابة بالطريق الأولى.

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক যুদ্ধ বিষয়ে আমাদের ধারণা এই যে, তারা উপরিউক্ত যুদ্ধ বিষয়ে মুজতাহিদ ছিলেন। আর ভুল ইজতিহাদকারী একটি সওয়াব পায়। যখন সাধারণ মুজতাহিদ ভুল করলে একটি

---

[২৮৩]. *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, ৯/১১৪,১২৯; *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ২/৯৩; *আল-আদাবুশ শাফেয়ি*, পৃ. ৩১৪; *মানাকিবুশ শাফেয়ি*, ১/৪৪৯; *তবাকাতু ইবনি সাদ*, ৫/৩৮২; *আওনুল মাবুদ*, ১২/২৭৪।

[২৮৪]. *উমদাতুল কারি*, ১/৪০৬।

সওয়াবের অধিকারী হন, সুতরাং এটি সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে তা আরও অগ্রগণ্যতার সাথে সাব্যস্ত হবে।[২৮৫]

মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ব্যাপারে আনীত কতিপয় অসার অভিযোগের খণ্ডন

হজরত মুয়াবিয়া ও হজরত আলি রা.-এর মাঝে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাতে উভয়েই হকের ওপর ছিলেন। এবং তাদের পারস্পরিক কোনো অসৎ উদ্দেশ্যও ছিল না। যেমনটি ওপরে উল্লেখিত হয়েছে।

১) উপরন্তু যখন হজরত আলি ও হজরত মুয়াবিয়া রা.-এর মধ্যে যুদ্ধের ময়দান গরম ছিল, তখন রোমের খ্রিষ্টান রাজার পক্ষ থেকে হজরত মুয়াবিয়া রা.-কে তাদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য ও তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হলো।

রোমসম্রাট হজরত মুয়াবিয়ার নিকট এ মর্মে চিঠি লিখল—

> আলি আপনাকে কষ্ট দিচ্ছেন, আপনার জন্য সৈন্য পাঠাতে প্রস্তুত আছি।

রোমসম্রাটের চিঠির উত্তরে হজরত মুয়াবিয়া রা. লিখলেন—

> হে খ্রিষ্টান কুকুর! আমার ও আলির মধ্যে মতভেদ দ্বারা ফায়দা লুটতে চাচ্ছ, মনে রেখো, তুমি যদি আলির দিকে বাঁকা নজরে তাকাও, তাহলে আলির বাহিনীর সৈনিক হয়ে, প্রথম আমি মুয়াবিয়া তোমার চোখ ছিদ্র করে দেবো।

একদা রোমসম্রাট মুসলমানদের গৃহযুদ্ধের দ্বারা ফায়দা লুটে হামলা করার সিদ্ধান্ত নিলো। হজরত মুয়াবিয়া রা. তা শুনতে পেয়ে রোমসম্রাটের নামে এ মর্মে চিঠি লিখলেন—

> যদি তোমার ইচ্ছা বাস্তবায়নের চেষ্টা চালাও, তাহলে আমি কসম করে বলছি, আমার সাথি হজরত আলি রা.-এর সাথে মীমাংসা করে নেব এবং তার বাহিনীর প্রথম দলে শরিক হয়ে কুসতুনতুনিয়াকে জ্বালিয়ে কয়লা বানিয়ে দেবো এবং তোমার রাজত্বকে মূলার ন্যায় মূলোৎপাটন করে ছাড়ব।[২৮৬]

---

[২৮৫]. *আল-ইসাবাহ ফি তাময়িযিস সাহাবিহ*, ৭/২৬০, ৪/১৫১।

[২৮৬]. *তাজুল আরুস*, মুরতাজা যাবেদি, ৭/২০৮।

২) এমনইভাবে হজরত মুয়াবিয়া রা. কসম করে বললেন—

হজরত আলি রা. আমার থেকে ভালো ও উত্তম ব্যক্তি। তার সাথে আমার মতভেদ হয়েছে শুধু হজরত উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের বিচারের ব্যাপারে। তিনি যদি হজরত উসমান রা.-এর খুনের বদলা নেন, তাহলে শামবাসীর মধ্য হতে প্রথম আমি তার হাতে বাইআত হব।[২৮৭]

৩) হাফেজ ইবনে কাসির রহ. লিখেছেন—

وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَسْمِيَةِ أَصْحَابِ مُعَاوِيَةَ بُغَاةً تَكْفِيرُهُمْ كَمَا يُحَاوِلُهُ جَهَلَةُ الْفِرْقَةِ الضَّالَّةِ مِنَ الشِّيعَةِ وَغَيْرِهِمْ لِأَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا بُغَاةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا مُجْتَهِدِينَ فِيمَا تَعَاطَوْهُ مِنَ الْقِتَالِ وَلَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا بَلِ الْمُصِيبُ لَهُ أَجْرَانِ وَالْمُخْطِئُ لَهُ أَجْرٌ.

হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর জামাত বিষয়ে বাগি তথা বিদ্রোহী মন্তব্য করার দ্বারা তাদেরকে কাফের বলা প্রমাণ করে না। যেমনটি অজ্ঞ দল, পথভ্রষ্ট শিয়া ও অন্যান্যরা বলে থাকে। যদিও তারা মৌলিকভাবে বিদ্রোহী হন না কেন, কিন্তু তারা এ যুদ্ধ বিষয়ে মুজতাহিদ ছিলেন। আর সব মুজতাহিদই সর্বদা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। বরং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারলে দুটি সওয়াব পান, আর ভুল করলে একটি সওয়াব পান।[২৮৮]

৪) সাদুদ্দিন তাফতাজানি রহ. তার 'শারহুল মাকাসিদ' গ্রন্থে জংগে সিফফিন ও জামালে অংশ নেওয়া সাহাবিগণকে ফাসেক, কাফের, জালেম বলা জায়েজ নয় হওয়ার কথা স্পষ্ট করেছেন। সেইসাথে হজরত আলি রা. ও শামবাসীকে অভিসম্পাতকারীদের নিষেধ করে জানিয়েছেন যে, তাদের ওপর অভিসম্পাত করো না, কারণ তারা আমাদেরই ভাই। তবে তারা ইজতিহাদি কারণে আমাদের বিরোধিতা করেছেন।[২৮৯]

وليسوا كفارا ولا فسقة ولا ظلمة لما لهم من التاويل وان كان باطلا فغاية الامر انهم اخطأوا فى الاجتهاد وذلك لا يوجب التفسيق فضلا عن

---

২৮৭. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭/২৫৯।

২৮৮. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩/২৬৫, ৩/২১৮, ৪/৫৩৮।

২৮৯. *শারহুল মাকাসিদ*, তাফতাযানি, ৫/৩০৮।

التكفير، ولهذا منع علي رضى الله عنه اصحابه من لعن اهل الشام وقال اخواننا بغوا علينا.

৫) ইমাম মোল্লা আলি কারি রহ. লিখেছেন—

ثم كان معاوية مخطيا الا انه فعل ما فعل عن تأويل فلم يصر به فاسقا.

হজরত মুয়াবিয়া রা. ভুলের ওপর ছিলেন। কিন্তু তার কাজটি ছিল ইজতিহাদের ভিত্তিতে। তাই এই কারণে তিনি ফাসেক হয়ে যাবেন না।[২৯০]

৬) ইমাম গাজালি রহ.-ও মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই কাজকে তাবিলযোগ্য বলেছেন।[২৮৪]

والظن بمعاوية أنه كان على تأويل وظن فيما كان يتعاطاه وما يحكى سوى هذا من روايات الآحاد فالصحيح منه مختلط بالباطل والاختلاف أكثره اختراعات الروافض والخوارج وأرباب الفضول الخائضون في هذه الفنون . فينبغي أن تلازم الإنكار في كل ما لم يثبت، وما ثبت فيستنبط له تأويلاً .فما تعذر عليك فقل :لعل له تأويلاً وعذراً لم أطلع عليه.

৭) ইমাম ইবনুল আসির জাযারি রহ. লেখেন—

وذهب جمهور المعتزلة إلى أن عائشة وطلحة والزبير ومعاوية .وجميع أهل العراق والشام فُسَّاق بقتالهم الإمام الحق.

জমহুর মুতাজিলারা হজরত আয়েশা রা., হজরত তালহা রা., হজরত যুবায়ের রা., হযরত মুয়াবিয়া রা. এবং ইরাক ও শামবাসীকে হজরত আলি রা.-এর সাথে যুদ্ধ করার কারণে ফাসেক হিসেবে আখ্যায়িত করে।[২৯১]

তারপর তিনি এর খণ্ডনে লেখেন—

---

২৯০. *শারহু ফিকহিল আকবার*, মোল্লা আলি কারিকৃত, পৃ. ৮২।

২৯১. *জামেউল উসুল ফি আহাদিসির রাসুল*, ১/১৩৩, ১/৭৩।

وكل هذا جُرأة على السلف تخالف السنة، فإن ما جرى بينهم كان مبنيًا على الاجتهاد، وكل مجتهد مصيب، والمصيب واحد مثاب، والمخطئ معذور، لا تردُّ شهادته.

এসব পুরোটাই সালাফের বিপরীত স্পর্ধা প্রদর্শন এবং সুন্নাহবিরোধী কাজ। কেননা, তাদের মাঝে যা-কিছু সংঘটিত হয়েছে তা ছিল ইজতিহাদনির্ভর। আর প্রতিটি মুজতাহিদই সওয়াব পায়। যিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন, তিনি সওয়াব পান, আর যিনি ভুল করেন, তিনি এতে মাজুর। তাদের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হয় না।[২৯২]

৮) হজরত ইবনে কাসির রহ. লিখেছেন—

وقول المعتزلة :الصحابة عدول إلا من قاتل علياً :- قول باطل مرذول ومردود.

আর মুতাজিলাদের বক্তব্য হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামগণ ন্যায়নিষ্ঠ তবে যারা হজরত আলি রা.-এর সাথে যুদ্ধ করেছেন তারা ন্যায়নিষ্ঠ নন, তাদের এ দাবিটি বাতিল, ঘৃণিত এবং অগ্রহণযোগ্য।[২৯৩]

৯) হযরত উমর রা.-এর উপস্থিতিতে একবার হজরত মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা শুরু হলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, যে কুরাইশি যুবক চরম ক্রোধের মুহূর্তেও হাসতে পারে, যার হাত থেকে স্বেচ্ছায় না দিলে কিছু ছিনিয়ে আনা সম্ভব নয় এবং যার শিরস্ত্রাণ পেতে হলে পায়ে লুটিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই, তোমরা তারই সমালোচনা করছ?[২৯৪]

১০) ইমাম ইবনে কাসির বর্ণনা করেছেন, সিফফিন যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আপন অনুগামীদের লক্ষ করে হজরত আলি রা. বলেছিলেন, হে লোকসকল! মুয়াবিয়ার শাসনকে তোমরা অপছন্দ করো না। কেননা তাকে যেদিন হারাবে সেদিন দেখবে, ধড় থেকে মুণ্ডগুলো হানযাল ফলের মতো কেটে কেটে পড়ে যাচ্ছে।[২৯৫]

---

[২৯২]. *জামেউল উসুল ফি আহাদিসির রাসুল*, ১/১৩৩, ১/৭৪।
[২৯৩]. *আল-বায়িসুল হাসিস ফি ইখতিসারি উলুমিল হাদিস*, পৃ. ১৮২, ১৮১।
[২৯৪]. *আল-ইসতিআব*, ৩/৩৭৭।
[২৯৫]. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/১৩১।

জান্নাতি সাহাবি আমিরে মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু

বিদ্বেষবশত কিছু জাহেল হজরত মুয়াবিয়াকে নানা ধরনের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে। এমন কি সরাসরি মুয়াবিয়া রা.-কে কিছু শিয়া আলেমের রেফারেন্স দিয়ে জালেম শাসক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। আবার কেউ কেউ আমিরুল মুমিনিন মুয়াবিয়াকে কুফরির তুহমত লাগিয়েছে (নাউজুবিল্লাহি মিন যালিকা)।

এবং এ ক্ষেত্রে আমিরে মুয়াবিয়াকে কাফের বানাতে গিয়ে কিছু জইফুন জিদ্দান ও মাওজু তথা জাল হাদিসের সাহায্য নিয়ে থাকে তারা। তাদের রেফারেন্স মূলত শিয়া আলেমদের আর কতিপয় বিদআতি সুন্নিদের পেজ, ওয়েবসাইট ও ইউটিউব লিংক হয়ে থাকে।

তার ওপর আরোপিত কতিপয় অভিযোগ খণ্ডন করার আগে হজরত মুয়াবিয়া রা.-এর ব্যাপারে সহিহ হাদিসে কী এসেছে জেনে নিই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا.

আমার উম্মতের মধ্যে যে বাহিনী প্রথম সমুদ্র অভিযানে অংশ নেবে তারা নিজেদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নেবে।[২৯৬]

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় সকল ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস একমত যে, হজরত মুয়াবিয়া রা.-ই কেবল প্রথম সমুদ্র অভিযানে অংশ নিয়েছেন। এ অভিযানকে ইতিহাসের ভাষায় সাইপ্রাস অভিযান বলে।

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রহ.-ও এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন এটা কেবল মুয়াবিয়ার ফজিলতেই, কেননা তিনিই প্রথম সমুদ্র অভিযান করেন। তিনি বলেন[২৯৭]—

قال المهلّب : في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر

ইমাম আবু জাফর আত-তাবারি রহ. খালেদ ইবনু মাদান থেকে বর্ণনা করে এ কথাই বলেন তার রচিত ‘তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক’ গ্রন্থের ২৬ হিজরির ঘটনা পরিচ্ছেদে। তিনি বলেন—

---

[২৯৬]. *সহিহ বুখারি*, ১/৪১০, হাদিস ২৯২৪।

[২৯৭]. *ফাতহুল বারি*, ৬/১২৭।

عن خالد بن معدان قال : أول من غزا البحر معاوية؛ في زمن عثمان، وكان استأذن عمر فلم يأذن له، فلم يزل بعثمان حتى أذن له، وقال : لا تنتخب أحداً، بل من اختار الغزو فيه طائعاً فأعِنه، ففعل.

বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনু খালদুন রহ. বলেন, হজরত মুয়াবিয়াই হলেন প্রথম খলিফা যিনি ইসলামি বাহিনীর জন্য জাহাজ তৈরি করে মুসলমানদের জন্য নৌযুদ্ধের গোড়াপত্তন শুরু করেন।[২৯৮]

২৭ হিজরিতে মুয়াবিয়া সমুদ্র অভিযানে শরিক হয়ে এক বছরের কম সময়ে যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন।[২৯৯]

আবদুর রহমান ইবনু আবি উমাইরা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

اللّٰهُمَّ اجعله هادياً مهديًّا، واهدِ به.

হে আল্লাহ, তুমি মুয়াবিয়াকে হিদায়াতের রাহবার বানাও, পথ প্রদর্শন করো, মানুষকে তার দ্বারা হিদায়াত দাও।[৩০০]

সুতরাং রাসুলের দোয়ায় যিনি হিদায়াতপ্রাপ্ত, মানুষের হিদায়াতের মাধ্যম, তাকে জালেম আর কাফের যারা বলে, তারা না জানি কত বড় জালেম!

ইরবায ইবনু সারিয়া রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি. তিনি মুয়াবিয়ার জন্য বলেন—

اللّٰهُمَّ علّم معاوية الكتاب والحسا ، وقِهِ العذاب.

হে আল্লাহ, আপনি মুয়াবিয়াকে কিতাব ও হিসেবের জ্ঞান প্রদান করুন। এবং তাকে জাহান্নামের আজাব হতে হিফাজত করুন।[৩০১]

হজরত ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, একদিন জিবরাইল আ. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

---

[২৯৮]. *মুকাদ্দামা ইবনু খালদুন*, পৃ. ৪৫৩। একই কথা আছে 'তারিখে ইবনু খালদুন', ৪/৪১০-এ।

[২৯৯]. *আন-নুজুমুয যাহিরা*, ১/৮৫।

[৩০০]. *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস ৩৮৪২; *জাওয়ামিউস সহিহ*, ২/২৪৭, সনদ সহিহ।

[৩০১]. *মুসনাদে আহমাদ*, ১৭২০২; *উসদুল গাবাহ*, ৪/৩৮৬। এ হাদিসের বিভিন্ন শাহেদ আছে যার কারণে হাদিসটির সনদ সহিহের দরজায় চলে গিয়েছে।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুয়াবিয়াকে সদুপদেশ দিন, কেননা সে আল্লাহর কিতাবের আমানতদার ও উত্তম আমানতদার।[৩০২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এ দ্বীনের নবুয়তের যুগটি হবে রহমতের, এরপর খিলাফত আসবে সেটিও রহমত, এরপর রাজত্বের (মুয়াবিয়ার) যুগ আসবে সেটিও হবে রহমতের (এরপর ফিতনার কথা উল্লেখ আছে)।[৩০৩]

মুয়াবিয়া রা.-এর বিরুদ্ধে 'সহিহ মুসলিম'-এর হাদিস নিয়ে ভ্রান্তির নিরসন, ফজিলতের হাদিসকে বদদোয়ার হাদিস বানানোর অপচেষ্টা

মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ব্যাপারে 'সহিহ মুসলিম'-এর একটি হাদিস (২৬০৩ নম্বর) হচ্ছে, একদিন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহি লেখার প্রয়োজন বোধ করলে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর বাল্যবয়সে যখন তিনি বাচ্চাদের সাথে খেলছিলেন তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে তাকে বললেন—

وقال اذهب وادع لي معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل قال ثم قال لي اذهب فادع لي معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل فقال لا أشبع الله بطنه.

যাও, আমার জন্য মুয়াবিয়াকে (ওহি লেখার জন্য, কেননা মুয়াবিয়া ওহি লেখকদের একজন) ডেকে নিয়ে এসো। ইবনু আব্বাস রা. বলেন, আমি তার নিকট গেলাম। আমি নবির কাছে ফিরে বললাম, তিনি খাচ্ছেন। অতঃপর নবিজি বললেন, যাও, আমার জন্য মুয়াবিয়াকে ডেকে নিয়ে এসো। আমি নবির কাছে ফিরে এসে বললাম, তিনি তো খাচ্ছেন। তারপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তার পেটকে পরিতৃপ্ত করবেন না।

---

৩০২. *আল-মুজামুল আওসাত*, ৩৯০২।

৩০৩. *মুসতাদরাকে হাকেম*, ৪/৫২০, হাদিস ৮৪৫৯; *কিতাবুল ফিতান*, আবু নুয়াইম ইবনু হাম্মাদ, পৃ. ২৩৬; *জামেউল মাসায়েল*, ইমাম ইবনু তাইমিয়া, ৫/১৫৪। হাদিসটির সনদ সহিহ। ইমাম হাইসামি তার 'মাজমাউয যাওয়ায়েদ'-এ বলেন এ হাদিসটি তাবারানি বর্ণনা করেছেন, এর সকল রাবি সিকাহ।

এ হাদিস দ্বারা কিছু অসাধু লোক দুটি আপত্তি তোলে। আপত্তিগুলো হচ্ছে—

১। এখানে মুয়াবিয়া রা. নবির ডাকে সাড়া না দিয়ে বেয়াদবি করেছেন (নাউজুবিল্লাহ)।

২। নবিজি মুয়াবিয়ার জন্য বদদোয়া করেছেন (মিথ্যুকদের ওপর আল্লাহর লানাত)।

১ম আপত্তির খণ্ডন

এ হাদিস থেকে তারা হজরত মুয়াবিয়া রা.-কে বেয়াদব ও অবাধ্য প্রমাণ করতে চায়, অথচ বালক সাহাবি ইবনু আব্বাস রা. মুয়াবিয়া রা.-কে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তলব করেছেন এ বিষয়ে জানিয়েছেন বলে কোনো কথাই এ হাদিসে নেই। যদি মুয়াবিয়া রা. জানতেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তলব করেছেন, তিনি তো অবশ্যই তার খাবার রেখে নবির কাছে ছুটে যেতেন।

ইবনু আব্বাস রা. তার খাওয়ার অসমাপ্তি দেখে তাকে জানাননি যে, রাসুলে আরাবি তাকে তলব করেছেন, এখান থেকে মুয়াবিয়ার নির্দোষ হওয়া প্রমাণিত হয়।

২য় আপত্তির জবাব

নবিজি মুয়াবিয়াকে বদদোয়া করেছেন এটা গায়ের জোরের কথা, যে ব্যক্তির কোনো দোষই নেই, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কী করে বদদোয়া দিতে পারেন! যারা এ বদদোয়ার পক্ষপাতী তারা নবিরও দুশমন। কেননা এখানে তারা বোঝাতে চাচ্ছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেইনসাফ করেছেন (নাউজুবিল্লাহ) একজন নিরপরাধ লোককে বদদোয়া করে (নাউজুবিল্লাহ)।

মূলত এ হাদিসের ব্যাখ্যায় সকল মুহাদ্দিস বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমিরে মুয়াবিয়ার জন্য বদদোয়া নয় বরং দোয়া করেছেন (কেননা পরিতৃপ্ত হয়ে খাওয়া মুমিনের সিফাত না, নিচে এ বিষয়ে হাদিস দেওয়া হবে)। এ ছাড়াও জানা থাকার কথা যে আরবদের কথার আন্দাজই এমন। তারা লানতের (বদদোয়ার) ক্ষেত্রে এভাবে বলেন না, যেমন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে মাঝে কোনো কোনো সাহাবিকে বলতেন, রগিমা আনফুক (আল্লাহ তোমার নাক ধূলিমলিন করুক);

সাকালাতকা উম্মুক (তোমার মা তোমাকে হারাক); তারিবাত ইয়ামিনাক (তোমার ডান হাত ময়লা/মাটিযুক্ত হোক)। এগুলো আদর করে বলা হয়, মুখে একটা থাকে অন্তরে অন্যটা। আমরা আমাদের খুব কাছের মানুষকে অনেক সময় গালিগালাজ করে সম্বোধন করি (এটার উদাহরণ দেওয়া জরুরি মনে করছি না)।

ইমাম নববি এ হাদিসের ব্যাখ্যায় দুইটি জবাব দিয়েছেন[৩০৪] (যার একটি ওপরে উল্লেখ করেছি, পুরো ইবারাত দিয়ে দিচ্ছি)—

وأما دعاؤه على معاوية أن لا يُشبع بطنه حين تأخر ففيه جوابان : أحدهما :أن المراء ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وفي باطن الأمر، ولكنه في الظاهر مستوجبٌ له، فيظهر له استحقاقه لذلك بأمارة شرعية ويكون في باطن الأمر ليس أهلاً لذلك .وهو مأمورٌ بالحكم بالظاهر، والله يتولّى السرائر .الثاني :أن هذا ليس بمقصود وإنما هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نيّة، كقوله تَرِبَتْ يمينك و] ثكلتك أمك [وفي حديث معاوية » :لا أشبع الله بطنه « ونحو ذلك لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء، فخاف أن يصادف شيء من ذلك إجابة، فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورًا وأجرًا، وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من الأزمان، ولم يكن فاحشًا ولا متفحشًا ولا لعّانًا ولا منتقمًا لنفسه، وقد قالوا له :ادعُ على دَوس فقال :اللّٰهُمَّ اهد دوسًا وقال :اللّٰهُمَّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون

ইমাম ইবনু হাজার আল-মক্কি আল-হাইতামি রহ. একই ব্যাখ্যা করেন।[৩০৫]

তাদের অনেকের আবার দাবি ইমাম নাসায়ি রহ. নাকি আমিরে মুয়াবিয়ার বিরোধী ছিলেন (যদিও এটা মিথ্যা)।

---

৩০৪. *শরহুন নাবাবি আলা মুসলিম*, ৮/৩৮৭-৩৯০।
৩০৫. দেখুন তার রচিত কিতাব, *তাতহিরুল জিনান*, পৃ. ১২, ৩৭।

অথচ এ হাদিসটিকে ইমাম নাসায়ি রহ. মুয়াবিয়া রা.-এর ফজিলত-সংক্রান্ত হাদিস হিসেবে গণ্য করেছেন।

শাইখ আবদুল হাই ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি তার গ্রন্থে ইমাম নাসায়ি রহ. যে এ হাদিসকে মুয়াবিয়ার ফজিলত মানতেন তা প্রমাণে আল্লামা ইবনু খাল্লিকান রহ.-এর সনদে বলেন—[৩০৬]

قال ابن خلكان : قال محمد بن إسحاق الأصبهاني : سمعت مشايخنا بمصر يقولون : إنّ أبا عبد الرحمن فارق مصر في آخر عمره وخرج إلى دمشق، فسئل عن معاوية وما روى من فضائله فقال : أما يرضى معاوية أن يخرج رأسًا برأس حتى يفضّل، وفي رواية : ما أعرف له فضيلة إلا : "لا أشبع الله بطنه".

অন্য বর্ণনায় এসেছে—[৩০৭]

قال الوزير ابن حنزابة : سمعت محمد بن موسى المأموني صاحب النسائي قال : سمعت قوما ينكرون على أبي عبد الرحمن النسائي كتاب "الخصائص" لعلي رضي الله عنه وتركه تصنيف فضائل الشيخين، فذكرت له ذلك، فقال : دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير، فصنفت كتاب "الخصائص" رجوت ان يهديهم الله تعالى. ثم إنه صنف بعد فضائل الصحابة، فقيل له : وأنا أسمع ألا تخرج فضائل معاوية رضى الله عنه؟ فقال : أي شيء أخرج؟ حديث : "اللَّهُمَّ لا تشبع بطنه" فسكت السائل.

এ ইবারাত উল্লেখ করে ইমাম মিযযি রহ. হাফেজ আবুল কাসেম ইবনু আসাকির থেকে এভাবে বর্ণনা করেন[৩০৮]—

وهذه الحكاية لا تدل على سوء اعتقاد أبي عبد الرحمن في معاية بن أبي سفيان وإنما تدل على الكف في ذكره بكل حال. ثم روى بإسناده عن أبي الحسن علي بن محمد القابسي قال : "سمعت أبا علي الحسن بن أبي هلال

---

৩০৬. *ওফায়াতুল আয়ান*, ১/৭৭।

৩০৭. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, যাহাবি, ১৩/১৩০; *তাহযিবুল কামাল*, ইমাম মিযযি, ১/৩৩৮।

৩০৮. *তাহযিবুল কামাল*, ১/৩৩৯।

يقول : سئل أبو عبد الرحمن النسائي عن معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار، قال : فمن أراد معاية فإنما أراد الصحابة.

অন্যান্য হাদিস থেকেও বোঝা যায় এটি ছিল মুয়াবিয়া রা.-এর জন্য দোয়া, বদদোয়া না। কেননা বিভিন্ন সহিহ হাদিসে পরিতৃপ্ত হয়ে খাওয়াকে নিষেধ করা হয়েছে। আরেক সহিহ হাদিসে এসেছে, যারা দুনিয়ায় তৃপ্ত হয়ে খায় তারা কিয়ামতের দিন অধিকতর ক্ষুধার্ত হবে। (সংক্ষিপ্ততার জন্য অনুবাদ না করে নিচে আহলে ইলমদের জন্য কেবল এ বিষয়ক মূল হাদিসের ইবারাতগুলো দেওয়া হলো)—

ইবনু উমার রা. বলেন[৩০৯]—

تجشأ رجل عند النبي فقال كف عنا جشاء كفإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة.

অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে—

فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا .وفي لفظ آخر :فما شبعت منذ ثلاثين سنة.

মুল্লা আলি কারি রহ. ইমাম তিবি রহ.-এর কওল নকল করে বলেন[৩১০]—

والنهي عن الجشاءِ هو النهي عن الشبع لأنه السبب الجالب له.

মিকদাম ইবনু মাদি রা. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন[৩১১]—

ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.

---

৩০৯. *সুনানুত তিরমিজি*, ২/৭৮; *সুনানু ইবনু মাজাহ*, হাদিস ৩৩৫০, হাদিসটির সনদ সহিহ।
৩১০. *মিরকাতুল মাফাতিহ*, ৯/৩৮৯।
৩১১. *সুনানুত তিরমিজি*, ২/৬০; *সহিহ ইবনু হিব্বান*, হাদিস ১৩৪৯; *মুসতাদরাকে হাকেম*, ৪/১২১; *মুসনাদে আহমাদ*, ৪/১৩২, সনদ সহিহ।

এরপর যদি এ হাদিস প্রশ্নের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় বদদোয়া, তবুও এটি বদদোয়া হবে না, এটি হবে ব্যক্তির জন্য দোয়া, রহমত, পুরস্কার। কারণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

اللَّهُمَّ إنما أنا بشر، فأي المسلمين لَعنتُه أو سببتُهُ فاجعله له زكاة وأجرًا.

হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ। সুতরাং আমি কোনো মুসলিমকে লানত করলে বা মন্দ বললে তাকে (এর জন্য) পবিত্র করুন ও পুরস্কার প্রদান করুন।[৩১২]

এ মর্মে বিভিন্ন শব্দে একই মতনে অনেক সহিহ হাদিস আছে, আলোচনা লম্বা হওয়ার ভয়ে লিখলাম না। অন্যান্য রিওয়ায়াতে তার গুনাহের কাফফারা ও দরজা বুলুন্দির কথা আছে। তবে অমুসলিমদের কিংবা রাসুল কর্তৃক বড় গুনাহের কারণে বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের জন্য লানতের বিষয়টি এ হাদিসের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আচ্ছা, এত আলোচনা বাদ, এ হাদিস যে সাহাবি (আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস) বর্ণনা করেছেন, তার নিকট এ হাদিসের মর্ম কী আসুন জেনে নিই।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. মুয়াবিয়া রা.-কে একজন ফকিহ বলে সম্বোধন করেছেন[৩১৩]—

إنه فقيه.

অন্য বর্ণনায় ইবনু আব্বাস রা. মুয়াবিয়াকে রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আখলাকওয়ালা বলেছেন[৩১৪]—

ما رأيت رجلاً كان أخلق بالملك من معاوية.

উল্লিখিত হাদিসটির মর্ম যদি আলোচিত আপত্তিগুলো হতো তাহলে ইবনু আব্বাস নিজেই মুয়াবিয়া রা.-এর এত প্রশংসা করতেন না, অথচ উল্লিখিত হাদিসটি তার থেকেই বর্ণিত।

আল্লাহ আমাদের বোঝার তাওফিক দান করুন। আমিন।

---

৩১২. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস ২৬০০।
৩১৩. *সহিহ বুখারি*, হাদিস ৩৫৫৩।
৩১৪. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/১৩৫।

জাল ও বাতিল হাদিস দিয়ে আমিরে মুয়াবিয়া রা.-কে জাহান্নামি বানানোর অপচেষ্টা

তাদের ঘৃণ্য চক্রান্তের মাঝে অন্যতম হচ্ছে, তারা ভিত্তিহীন, জাল ও জইফুন জিদ্দান হাদিস দিয়ে মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কাফের বলার পায়তারা করেছে, আরও আফসোসের বিষয় হচ্ছে তারা ওইসব হাদিসকে আবার সহিহ দাবিও করে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ আসুন জেনে নিই তাদের দাবিকৃত সনদসহ সহিহ হাদিসের নজির কেমন হয়।

حدثني إسحاق ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت يوم يموت على غير ملتي . قال : وتركت أبي يلبس ثيابه فخشيت أن يطلع فطلع معاوية .

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসে ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি বললেন, এ সংকীর্ণ উপত্যকা (বা রাস্তা) থেকে এমন একজন ব্যক্তি তোমাদের নিকট আসবে যে আমার মিল্লাত (ধর্ম)-এর ওপর মৃত্যুবরণ করবে না... (আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস বলেন,) অতঃপর সেখান থেকে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এলেন। (তার মানে সে মুরতাদ আর কেউই না, মুয়াবিয়া। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।)[৩১৫]

---

[৩১৫]. এ হাদিসটি আছে বালাযুরির 'জুমালুম মিন আনসাবিল আশরাফ' (৫/১৯৭৮) কিতাবে। ইমাম বুখারি তার 'তারিখুল আওসাত'-এও এ হাদিস এনেছেন।
তাদের মতে হাদিসটির সনদ-মতন দুটিই সহিহ। আর এ হাদিস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তার মতে শাইখ আহমাদ ইবনু সিদ্দিক আল-গুমারি 'সহিহ মুসলিম'-এর শর্তে সহিহ বলেছেন তার কিতাব العطار جؤنة, ২/১৫৪-এ।

তাহকিক

মূলত এ হাদিসটি ও এ প্রসঙ্গে সকল হাদিস এবং তার সনদগুলো বাতিল ও জাল, দুটি ছাড়া, তবে সেখানে মুয়াবিয়া রা.-এর নাম নেই। (এ বিষয়ে নিচে আলোচনা হবে)। তারা এ হাদিসটি 'সহিহ মুসলিম'-এর শর্তে সহিহ দাবি করে শাইখ আহমাদের হাওয়ালায়।

আসলে তারা হয়তো শাইখের কিতাব পড়েনি, মূলত তিনি শিয়াপন্থি শাইখ হাসান ফারহান আল-মালেকির (যাকে সে সুন্নি বলে কথিত দাবি করে) রেফারেন্সের ওপর অন্ধবিশ্বাস করে একে 'সহিহ মুসলিম'-এর শর্তে সহিহ বলেছে। 'সহিহ মুসলিম'-এর শর্তে সহিহ হাদিসটি এটি না বরং সেই হাদিস যেখানে মুয়াবিয়ার নাম উল্লেখ নেই, সেটি 'সহিহ মুসলিম'-এর শর্তে সহিহ (নিচে আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ)।

এ হাদিসের সনদ কেউ বলেছেন মাওজু কেউ-বা জইফুন জিদ্দান।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন—

> هَذَا الْحَدِيثُ مِنَ الْكَذِبِ الْمَوْضُوعِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ، وَلَا يُوجَدُ فِي شَيْءٍ مِنْ دَوَاوِينِ الْحَدِيثِ الَّتِي يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ، وَلَا لَهُ إِسْنَادٌ مَعْرُوفٌ.
>
> হাদিসশাস্ত্রের পণ্ডিতদের ঐকমত্যে এ হাদিসটি মিথ্যাচারমূলক জাল হাদিস।...আর এ হাদিসের সমর্থনে কোনো মারুফ বা প্রসিদ্ধ হাদিসও নেই।[৩১৬]

ইমাম বুখারি রহ. বলেন—

> ويروى عن معمر عن بن طاوس عن أبيه عن رجل عن عبدالله بن عمرو رفعه في قصته وهذا منقطع لا يعتمد عليه.

এর সনদ মুনকাতি, এর ওপর আস্থা রাখা যাবে না।[৩১৭]

ইমাম ইবনু জাওযি রহ. হজরত মুয়াবিয়া রা. জাহান্নামি এ বিষয়ক সকল হাদিসকে অত্যন্ত জইফ বলেছেন।[৩১৮]

---

৩১৬. *মিনহাজুস সুন্নাহ*, ৪/৪৪৪।
৩১৭. *তারিখুল আওসাত*, ৭১।
৩১৮. *আল-ইলালুল মুতানাহিয়া ফিল-আহাদিসিল ওয়াহিয়া*, ১/২৮০।

ইবনু আদি রহ. এ হাদিসের সনদের রাবির ব্যাপারে মুনকার হাদিস বর্ণনার অভিযোগ করে বলেন[৩১৯]—

قال إسحاق بن إبراهيم بن عباد أبو يعقوب الدبري الصنعاني استصغرني عبدالرزاق ، أحضره أبوه عنده وهو صغير جداً فكان يقول : قرأنا على عبدالرزاق أي قرأ غيره وحضر صغيراً وحدث عنه بحديث منكر.

এ বাতিল হাদিস কখনোই আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা.-এর হতে পারে না। কেননা তিনি হজরত মুয়াবিয়ার অনেক প্রশংসা করেছেন। তার ইতায়াত (আনুগত্য) করতে বলেছেন।[৩২০]

সুতরাং তিনি কী করে মুয়াবিয়া জাহান্নামি এর পক্ষে হাদিস বর্ণনা করতে পারেন?

এ ছাড়াও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়াবিয়াকে জাহান্নামি বা মুরতাদ বলতে পারেন না, কারণ তার পাক জবান থেকে মুয়াবিয়াকে তিনি হিদায়াতপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শক ও জান্নাতি ঘোষণা করেছেন। ইতিপূর্বে আমরা তা উল্লেখ করেছি।

'সহিহ বুখারি'র হাদিস ৬৬৯২-সহ এক ডজন হাদিসগ্রন্থে সহিহ সনদে বর্ণিত হাদিসে হজরত আলি ও মুয়াবিয়ার রাযিয়াল্লাহু আনহুমার যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করে রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান রা.-কে দেখিয়ে বলেছেন—

إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.

আমার এ নাতি (হাসান) সাইয়েদ। তার দ্বারা আল্লাহ তাআলা অচিরেই মুসলিমদের মাঝে বিরাট দুটি দলের সুলাহ (মীমাংসা) করিয়ে দেবেন (অর্থাৎ আলি ও মুয়াবিয়ার দলের মাঝে)।

এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় বলছেন যে, দুটি দলই মুসলিম হবে, মানে আলি রা.-এর দলও মুসলিম ও মুয়াবিয়া রা.-এর দলও মুসলিম।

---

[৩১৯]. *আল-কামিল*, ১/৩৪৪।

[৩২০]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস ৫৬৮২; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস ৪২৪৮; *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, হাদিস ১৫৯২৪, সনদ হাসান।

সুতরাং মুয়াবিয়া রা. যদি কাফের হন তাহলে ‘বুখারি’-সহ সকল হাদিসগ্রন্থের হাদিসগুলো অস্বীকার করা হবে।

এ ছাড়াও মুয়াবিয়া রা.-কে মুরতাদ বলার হাদিসটির সনদ ও মতনগুলোতে ইজতিরাব (পারস্পরিক অসামঞ্জস্যতা) রয়েছে।

এর একটি সনদ হচ্ছে—

إنما رواه ابن طاوس ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو أو غيره.

(ক) এখানে উপরে উল্লেখিত হাদিসটির মতোই হুবহু সনদ, তবে সনদের শেষে তাওস বলছেন আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস ‘অথবা’ অন্য কারও কাছ থেকে বর্ণিত। এখানে ‘আও গাইরুহু (অথবা তিনি ছাড়া অন্য কেউ)’ শব্দ ও বাক্য দ্বারা এ হাদিসের রাবির সনদে সন্দেহ তৈরি হচ্ছে যার কারণে সনদেও ইজতিরাবের পাশাপাশি সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। সুতরাং এ হাদিস কী করে সহিহ হতে পারে।

(খ) আর ইবনু তাওস কখনোই তার বাবা তাওস থেকে হাদিস সরাসরি শোনেননি, তাহলে কীভাবে এ হাদিস ও তার সনদকে সহিহ বলা যায়?

(গ) তা ছাড়াও এ সনদে একজন রাবি সাকেত হয়েছে (বাদ পড়েছে)। অন্য একটি বর্ণনায় ইবনু তাওস ‘ফুরখাশ’ নামক মাজহুল (অজ্ঞাত) রাবি থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা খাল্লাল এ সনদটি এভাবে বর্ণনা করেন[৩২১]—

رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس قال : سمعت فُرخاش

يحدث هذا الحديث عن أبي عن عبد الله بن عمرو.

সুতরাং এখান থেকেও হাদিসটির বর্ণনা সহিহ প্রমাণ হচ্ছে না। স্ববিরোধী ও ইজতিরাবপূর্ণ সনদ কী করে গ্রহণযোগ্য হবে?

তাহলে হাদিসগুলো সব দিক থেকেই ভুলে ভরা দেখা যাচ্ছে। এটাকে সহিহ বলার কোনো প্রশ্নই আসে না।

যেমন ‘মাজমাউয যাওয়ায়েদ’-এর এক সহিহ রিওয়ায়াতে আছে—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :يطلع عليكم رجل من هذا الفج

من أهل النار وكنت تركت أبي يتوضأ فخشيت أن يكون هو فأطلع

غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :هو هذا

---

৩২১. *আল-মুনতাখাব মিন ইলালিল খাল্লাল*, ১/১২৮, তরজমা, ১৩৬।

এ হাদিসটিও আবদুল্লাহ ইবনু আমর থেকেই বর্ণিত, এর রাবিগণ সহিহ। তবে এ হাদিসে পূর্বের হাদিসের মতো মুয়াবিয়া রা.-এর নাম উল্লেখ নেই বরং উক্ত সাহাবির বাবা আমর ইবনুল আসের বিষয়ে তার যে সন্দেহ ছিল তা নিরসনে তিনি 'গাইরুহু (আমার বাবা ব্যতীত অন্য কেউ)' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করলেন। এ হাদিসটিতে হজরত মুয়াবিয়ার বিন্দুমাত্র নাম ও নিশানা উল্লেখ নেই।

অন্য একটি সহিহ হাদিস যা ইমাম তাবারানি রহ. তার 'মুজামুল আওসাত'-এ বর্ণনা করেন—

ليطلعن عليكم رجل يبعث يوم القيامة على غير سنتي ، أو على غير ملتي

তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তি আসবে যে কিয়ামতের দিন আমার সুন্নতের ওপর পুনরুত্থিত হবে না।[৩২২]

এখানেও নির্দিষ্ট কোন লোকের ব্যাপারে বলা হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না।

সুতরাং সহিহ হাদিসের বিপরীতে হাদিস জাল করতে গিয়ে জালিয়াতকারীরা সব দিক থেকেই ধরা খাবে।

'মুসনাদে আহমাদ', ১১/৭১-এ; ইমাম তাবারানি তার 'আওসাত'-এ, ইমাম বাযযার তার 'মুসনাদ'-এ এ হাদিসের ব্যক্তির নাম 'হাকাম' বলে উল্লেখ করেছেন। সেখানেও মুয়াবিয়ার নাম ও নিশানা নেই। হাদিসটি হচ্ছে—

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو قال : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب عمرو بن العاصي يلبس ثيابه ليلحقني، فقال ونحن عنده :ليدخلن عليكم رجل لعين، فوالله ما زلت وجلا أتشوف داخلا وخارجا حتى دخل فلان يعني الحكم.

আর এটিই হচ্ছে সহিহ মুসলিমের শর্তে সহিহ।

হজরত মুয়াবিয়া রা. মুরতাদ হয়ে মারা যাবেন এ বিষয়ক হাদিসটির আরেকটি সমস্যা হচ্ছে সে সনদে ইমাম আবদুর রাযযাক আস-সানআনি রহ. রয়েছেন।

---

[৩২২]. *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, ১/১৪৭।

প্রথম কথা হচ্ছে তিনি কিন্তু এ হাদিস তার কিতাবে বর্ণনা করেননি।

দ্বিতীয়ত তিনি একদল বড় বড় মুহাদ্দিসের নিকট সমালোচিত আরেক দল মুহাদ্দিসের নিকট সমালোচনার সাথে প্রশংসিত (তার তাওসিক বা জরাহ বর্ণনা এখানে উদ্দেশ্য না)। তার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ রায় হচ্ছে তিনি শেষ বয়সে ভুলে যেতেন, গুলিয়ে ফেলতেন, তার অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে তার থেকে তার লিখিত কোনো কিতাব ব্যতীত কোনো হাদিস বর্ণিত হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না বলে মুহাদ্দিসরা রায় দিয়েছেন।[৩২৩]

যেহেতু এ হাদিসটি ইমাম আবদুর রাযযাক রহ. তার কোনো কিতাবে বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না, আর ইমাম আবদুর রাযযাক থেকে বকর ইবনু হুশাইম আর ইসহাক নামক রাবি বর্ণনা করেছেন, যারা গ্রহণযোগ্য না। তাই এ হাদিস গ্রহণ করা যাবে না।

আসুন জেনে নিই রাবিদ্বয়ের ব্যাপারে।

(ক) বকর ইবনু হুশাইম মাজহুল রাবি। তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

(খ) এ হাদিসের সনদে ইসহাক ইবনু ইবরাহিম আদ-দুবুরি রয়েছে।

আর এই ইসহাক ইবনু ইবরাহিম আদ-দুবুরী সমালোচিত রাবি।[৩২৪]

সে ইমাম আবদুর রাযযাক থেকে অনেক মুনকার হাদিস বর্ণনা করত।

ইমাম ইবনু আদি ও ইমাম যাহাবি বলেন[৩২৫]—

«قال إسحاق بن إبراهيم بن عباد أبو يعقوب الدبري الصنعاني استصغرني عبدالرزاق، أحضره أبوه عنده وهو صغير جداً فكان يقول :قرأنا على عبدالرزاق أي قرأ غيره وحضر صغيراً وحدث عنه بحديث منكر»

তা ছাড়া ইবরাহিম আল-হাররানি বলেন, ইসহাকের যখন ৬-৭ বছর বয়স তখন ইমাম আবদুর রাযযাক মারা গেছেন।[৩২৬]

---

৩২৩. বিস্তারিত জানতে দেখুন, *আল-কামিল ফি যুয়াফায়ির রিজাল*, ইবনু আদি, ৬/৫৪৫; *সুয়ালাতু আবি আবদিল্লাহ ইবনু বুকাইর ওয়া গাইরুহু*, দারা-কুতনি, পৃ. ৩৫; *আস-সিকাত*, ইবনু হিব্বান, ৮/৪১২; *শারহু ইলালুত তিরমিজি*, ইবনু রজব আল-হাম্বলি, ২/৫৭৭-৫৭৮, ৫৮০; *মিযানুল ইতিদাল*, যাহাবি, ২/৬০৯, ৫০৪৪; *তারিখুল কাবির*, বুখারি, ৬/১৩০, ১৯৩৩; *তাহযিবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল* কিতাবে আবদুর রাযযাক সানানি রহ.-এর তরজমা।

৩২৪. *মুকাদ্দামা ইবনুস সালাহ*, পৃ. ৩৫৫।

৩২৫. *আল-কামিল*, ১/৩৪৪; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৩/৪১৭।

৩২৬. *শারহু ইলালিত তিরমিজি*, ২/৫৮১।

যদি সে তার থেকে শুনেও থাকে তাহলে এ উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হলো, সে ইমাম আবদুর রাযযাকের অন্ধ হওয়ার পরে হাদিস শুনেছে। সুতরাং ওপরে উল্লেখিত নীতির ভিত্তিতেও তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়।

তাদের কাছে কিছু প্রশ্ন যারা একে সহিহ মনে করে—

১। এ হাদিস বলার পরও কী করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত মুয়াবিয়াকে ওহি লেখক হিসেবে নিযুক্ত রাখলেন?

২। রাসুলের সাহাবিরা কেন ব্যাপকভাবে মুয়াবিয়ার জাহান্নামি ও মুরতাদ হওয়ার প্রসঙ্গে তার বিরুদ্ধে অবস্থান করলেন না। বরং তার আমিরত্ব গ্রহণ করলেন?

৩। তাদের অনেকের নিকট তো আশা করি উমর রা. কাফের বা জালেম না, যদি তাই হয় তাহলে ১০ম হিজরিতে এ হাদিস জানা সত্ত্বেও কী করে তিনি সাহাবিদের পরামর্শে মুয়াবিয়াকে শামের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করলেন? যদি বলেন তিনি জানতেন না, তাহলে বলব একজন সাহাবি মুরতাদ হবে এ কথার তো ব্যাপক প্রচলন থাকার কথা আর হজরত উমরের মতো এত বড় সাহাবি ও অন্য সাহাবিরা এটা জানবেন না তা কেমন করে হয়?

এভাবেই যুগে যুগে বাতিলপন্থিরা সাহাবিদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে থাকে। আল্লাহ তাআলার কাছে এসব খিয়ানত থেকে পানাহ চাই। আমিন।

* * *

পরিশিষ্ট—৪

ইতিহাস পড়তে চান অনেকেই। প্রায়ই সাক্ষাতে বা মেসেজে তারা জানান তাদের ইচ্ছা ও আগ্রহের কথা। কেউ পড়তে চান বিশেষ কোনো সময়কাল কিংবা নির্দিষ্ট কোনো রাজবংশ বা অঞ্চলের ইতিহাস। আবার কেউ সরাসরি বলে বসেন, ইতিহাস পড়তে চাই। যারা মাদরাসার ছাত্র তাদের জন্য বিষয়টি সহজ। নিজের শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে বই নির্বাচন করবেন এবং ধারাবাহিকভাবে পড়তে থাকবেন। যারা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের জন্য ছোট একটি তালিকা দিচ্ছি যা থেকে আশা করি উপকৃত হবেন। যেহেতু সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য তালিকাটি করছি তাই এখানে শুধু বাংলায় রচিত বা অনূদিত বইয়ের নাম দিচ্ছি। অন্য কোনো ভাষার বইয়ের নাম দিচ্ছি না।

ইসলামের সামগ্রিক ইতিহাস

ইসলামের সামগ্রিক ইতিহাস পড়তে চাইলে নিচের বইগুলো পড়তে পারেন।

১। ইসলামের ইতিহাস (নববি যুগ থেকে বর্তমান)—মাকতাবাতুল আসলাফ।

২। মুসলিম জাতির ইতিহাস—চেতনা।

৩। ইসলামি ইতিহাস—মাকতাবাতুল হাসান।

৪। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস বিশ্বকোষ—ইত্তিহাদ

৫। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস বিশ্বকোষ —মাকতাবাতুল আযহার

সতর্কতা—আকবর শাহ নজিবাবাদি রচিত 'তারিখুল ইসলাম' বা 'ইসলামের ইতিহাস' বইটি পড়তে বলেন কেউ কেউ। তবে আমাদের অনুসন্ধানে দেখেছি বইটি সাধারণ পাঠকের জন্য উপযোগী নয়। এই বইতে বেশ কিছু বর্ণনা আছে যা চরম বানোয়াট। যেমন আম্মাজান আয়েশা রা.-এর ইনতিকাল সম্পর্কে যে বর্ণনা আনা হয়েছে তা চরম পর্যায়ের বানোয়াট ও অস্বস্তিকর। মুশাজারাতে সাহাবা ইস্যুতেও লেখক কোনো ইলমি মানদণ্ড দাঁড় করাতে পারেননি। আব্বাসিদের ক্ষমতাদখল পর্বে তিনি চরম মিথ্যুক শিয়া রাবিদের বর্ণনা এনে খুনোখুনির ইতিহাস লিখেছেন। একজন সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই জায়গাগুলো স্পষ্ট করা কঠিন। ফলে এই বইটি পাঠ না করাই উত্তম।

সিরাতে নববি সা.

সিরাত পাঠ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের অন্যান্য দিক পড়াশোনা হোক বা না হোক, সিরাত অবশ্যই পাঠ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিচের বইগুলো পড়া যেতে পারে।

১। সীরাতে মোস্তফা—মদিনা পাবলিকেশন্স।

২। সীরাতুন নবি—মাকতাবাতুল বায়ান।

৩। সীরাহ—রেইনড্রপস।

৪। উসওয়াতুন হাসানাহ—রুহামা।

৫। সিরাতুন নবি—কালান্তর।

৬। নবীয়ে রহমত—মুহাম্মদ ব্রাদার্স।

৭। সিরাতে রাসুল—সৌন্দর্য ও শিক্ষা—নাশাত।

৮। সীরাত বিশ্বকোষ—মাকতাবাতুল আজহার।

৯। মুহাম্মদ (সা) ব্যক্তি ও নবি—আকিক পাবলিকেশন।

১০। মহানবী—রাহবার।

১১। আরবের চাঁদ—মাকতাবাতুল হাসান

খেলাফতে রাশেদা ও সাহাবিদের জীবনীর জন্য

১। খেলাফতে রাশেদা ও অন্য সাহাবিদের নিয়ে লেখা ডক্টর আলি সাল্লাবি ও আবদুস সাত্তার শাইখ রচিত বইগুলো ইতিমধ্যে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। বেশ কয়েকটি প্রকাশনী বইগুলো ছেপেছে। আমরা এগুলো পড়তে পারি।

২। মাকতাবাতুল হাসান ও মাকতাবাতুল আসলাফ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে আবদুস সাত্তার শাইখ রচিত 'চার খলিফার জীবনী'। এই বইগুলোও খুব তথ্যসমৃদ্ধ। এগুলোও সংগ্রহ করে পড়া যায়।

৩। ইউসুফ কান্ধলবি রহিমাহুল্লাহ রচিত 'হায়াতুস সাহাবা'-এর একাধিক অনুবাদ হয়েছে। এটিও সংগ্রহ করা যায়।

৪। সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন—রাহনুমা।

৫। নারী সাহাবিদের ঈমানদীপ্ত জীবন—রাহনুমা।

বিভিন্ন অঞ্চল ও রাজবংশের ইতিহাসের জন্য

১। আব্বাসি খিলাফাহ—ইত্তিহাদ।

২। খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস—নাশাত।

৩। আন্দালুসের ইতিহাস—মাকতাবাতুল হাসান।

৪। তাতারীদের ইতিহাস—মাকতাবাতুল হাসান।

৫। ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস—মাকতাবাতুল হাসান।

৬। সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস—কালান্তর ও মুহাম্মদ পাবলিকেশন।

৭। মঙ্গোল ও তাতার সাম্রাজ্যের ইতিহাস—মাকতাবাতুত তাকওয়া।

৮। উসমানি সাম্রাজ্যের অজানা অধ্যায়—মুহাম্মদ পাবলিকেশন।

৯। উসমানি খিলাফতের ইতিহাস—কালান্তর।

১০। উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাস—মাকতাবাতুল হাসান

১১। হাজার বছরের ইতিহাস—মাকতাবাতুল ইসলাম।

১২। মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে—মাকতাবাতুল হাসান।

১৩। ইসলামের ইতিহাসে যুদ্ধ—মাকতাবাতুল আসলাফ।

১৪। লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি—প্রচ্ছদ প্রকাশন।

১৫। ফাতেমি সাম্রাজ্যের ইতিহাস—মাকতাবাতুন নুর।

১৬। শাজারাতুদ দুর—চেতনা

জীবনীকেন্দ্রিক বইগুলো

১। সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহ—কালান্তর।

২। সুলতান আলপ আরসালান—দারুল ওয়াফা।

৩। আতশকাচে দেখা বাদশা হারুনুর রশিদ—মাকতাবাতু ইবরাহিম।

৪। দ্য প্যান্থার—কালান্তর।

৫। সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ দ্য ব্যাটালিয়ন—কালান্তর।

৬। আবদুল কাদির জিলানি রাহ.—কালান্তর।

৭। সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ (কনস্টান্টিনোপল বিজেতা মহাবীর সুলতানের জীবনী)—মাকতাবাতুল হাসান।

৮। দ্য ডায়নামিক সুলতান আবদুল হামিদ খান—কালান্তর।

৯। ইমাম গাজালি রাহ. জীবন ও কর্ম—কালান্তর।

১০। আওরঙ্গজেব আলমগির—কালান্তর।

১১। ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালাম রাহ. জীবন ও কর্ম—কালান্তর।

১২। মসনদ-ই-আলা ঈশা খান—দিব্যপ্রকাশ।

১৩। ইখতিয়ারউদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি—দিব্যপ্রকাশ।

১৪। তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত—দিব্যপ্রকাশ।

১৫। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা—প্রথমা প্রকাশন।

বাংলার ইতিহাসের জন্য

১। বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস—এম এ রহিম।

২। History of the Muslims of Bengal—Mohammad Mohar Ali

৩। আবদুল করিম বাংলার ইতিহাস নিয়ে অনেকগুলো বই লিখেছেন। বইগুলো তথ্যে ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ। কিন্তু কিছু জায়গায় তিনি নিজের প্রাভবিত চিন্তা উপস্থাপন করেছেন, তা থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

বি. দ্র. এই তালিকা পূর্ণাঙ্গ নয়। এর বাইরেও অনেক সমৃদ্ধ বইপত্র আছে। এখানে আমরা প্রাথমিক একটা তালিকা দিলাম মাত্র।

।। সমাপ্ত ।।

এই বই নিয়ে কিছু কথা

বাংলাদেশে ইতিহাস পাঠের পাশাপাশি ইতিহাস চর্চাতেও আগ্রহ বেড়েছে। তরুণদের মধ্যে যারা ইতিহাস বিষয়ক গবেষণা, সংকলন ও তৎপরতায় আগ্রহ দেখাচ্ছেন, তাদের মধ্যে ইমরান রাইহান অন্যতম। শুধু তিনি একা নন, বন্ধুবান্ধব-সহযোগী অনেকের মধ্যেই তিনি ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

এই বইটিকে বলা যায় নোটবুকের মতো। এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাই এসেছে। লেখক প্রথমদিকে ইতিহাসের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরে প্রচলিত কিছু সূত্রগ্রন্থের মান ও অবস্থান নিয়ে পর্যালোচনা পেশ করেছেন। শেষের দিকে কিছু প্রাসঙ্গিক নির্দেশিকা তুলে ধরেছেন।

এই বইটি যদিও কোনো গবেষণাগ্রন্থ নয়। আধুনিক গবেষণায় নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। এই বইটিকে বলা যায় লেখকের দীর্ঘদিনের চর্চার সারনির্যাস। তিনি কীভাবে ইতিহাস পাঠ করেন, কীভাবে নির্বাচন করেন নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ও মতামত, সে বিষয়ে এই বইয়ে বিশদ বয়ান পাওয়া যাবে। ইমরান রাইহান ইতিহাস বিষয়ক বেশ কিছু বই লিখেছেন, আরও লিখবেন। এই বইটি ধরা যায় তার ইতিহাস চর্চার জবানবন্দী, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-অবস্থান। এভাবে ভাবলে দেখা যাবে, এই সংকলনের গুরুত্ব কোনো অংশেই একাডেমিক গবেষণা থেকে কম নয়।

ইফতেখার জামিল
সম্পাদক ফাতেহ ২৪.কম

ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা

ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে আমরা মানবসমাজের শুরু থেকে তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড, চিন্তা-চেতনা ও জীবনযাত্রার অগ্রগতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি। কেননা ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য বিষয় হলো মানবসমাজের অগ্রগতির ধারা বর্ণনা। সভ্যতার প্রধান প্রধান স্তর, সভ্যতার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কথা সম্পর্কে ইতিহাস থেকে জানা যায়।

ইতিহাস আমাদের অতীত সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। ইতিহাসের আলোকে আমরা বর্তমানকে বিচার করতে পারি। ইতিহাস পাঠ জাতীয় চেতনা উন্মেষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। একটি জাতির ঐতিহ্য ও অতীতের গৌরবান্বিত ইতিহাস ওই জাতিকে বর্তমানের মর্যাদাপূর্ণ কর্মতৎপরতায় উদ্দীপিত করতে পারে।

ইতিহাস রচনা ও ইতিহাস চর্চা সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই। শাস্ত্রীয় আলেম-উলামা, রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সামরিক ব্যক্তিবর্গ ও প্রশাসকসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিকট ইতিহাস খুবই মূল্যবান বিষয়।